ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

৫৯ বর্ষ,৩য় সংখ্যা * জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

ইফা/গবেষণা পত্রিকা/২০২০/রাজস্ব/৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা/১৭০০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

রেজিঃ নং - ডিএ ২০/৭৬

৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০
জমাদিউল আউয়াল-রজব ১৪৪১
মাঘ-চৈত্র ১৪২৬

সম্পাদক

আনিস মাহমুদ

প্রকাশক

নূর মুহাম্মদ আলম

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আবুল কালাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

যোগাযোগ
সম্পাদক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫২১

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA
[A Quarterly Research Journal of Islamic Foundation]

Regd. No. DA 20/76
Year 59, Issue-3
January-March 2020

Editor
Anis Mahmud

Published by Nur Muhammad Alam
Department of Research
and
Printed by Md. Abul Kalam the Islamic Foundation Press
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
plot : e-4/A, Block : Civic Sector
E-mail : dir.research@islamicfoundation.gov.bd
ifapatrika@gmail.com
Website : www.Islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 50.00
U. S. Dollar : 1

সূচিপত্র

- ▶ পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রা ও ইসলামি নির্দেশনা/অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন/মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন/৫
- ▶ ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ: একটি পর্যালোচনা/মোহাঃ রিদওয়ান উল্লাহ/২৭
- ▶ কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ/মোহাম্মদ এনামুল হক+মোহাম্মদ জামাল হোসেন/৫১
- ▶ মাযহাব : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ/মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম/৮১
- ▶ মাদকাসক্তি নির্মূলে ইসলামী অনুশাসন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ/সাইফুল্লাহ+ মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহ/৯৯
- ▶ হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর কাব্যে রাসূল (সা)-এর প্রশংসা/ড. কামরুজ্জামান শামীম/১৩০
- ▶ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানবতাবাদ : একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা/ড. মোহাম্মাদ আজিবার রহমান/১৪২
- ▶ খলিফাতাবাদে খান জাহানের সমাধি ও শিলালিপি (তারিখ ৮৬৩ হিজরী/১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)/অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক/১৬৫
- ▶ নামাজে আমীন নীরবে পড়া সুন্নাত/হুমায়ুন কবির/১৮৮
- ▶ ধর্ম ও পুনরুত্থান ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ/ড. মুহাম্মাদ ঈসা কাদেরী/২০৭

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় লেখার নিয়মাবলী

* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কম্পিউটার কম্পোজ করা দুই কপি সিডিসহ গবেষকের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি ও ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সম্পাদক বরাবর আবেদনপত্রসহ পাঠাতে হবে। প্রতিটি প্রবন্ধ কম্পোজকৃত অবস্থায় ১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। প্রবন্ধ জমা দেয়ার সময় আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, এটি প্রবন্ধ/বই আকারে অন্য কোন প্রকাশনা সংস্থা বা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি বা প্রকাশিত হয়নি।
* বিষয় হিসেবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক সমস্যা, উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ লেখাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যৌথ লেখাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।
* তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে— ইমাম গাযালী, সৌভাগ্যের পরশমণি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ২০-২২। পত্রিকা থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে— মোহাম্মদ আজরফ, আবুল হাশিম : জীবন ও চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, ঢাকা, পৃ. ৮-১৩।
* কুরআনুল করীমের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম'-এর অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে পুস্তকের নাম, কিতাব (অধ্যায়) ও বাব (অনুচ্ছেদ) উল্লেখ করতে হবে। সম্ভব হলে হাদীস নম্বরও যোগ করতে হবে। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।
* লক্ষ করা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধসমূহ কম্পোজ করার পর কপি মিলিয়ে জমা দেওয়া হয় না। ফলে সম্পাদনা এবং প্রুফ পর্যায়ে রেফারেন্স গ্রন্থের সাথে কপি মিলাতে গিয়ে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়। এতে সন-তারিখ এবং কুরআনুল করীম থেকে উদ্ধৃত সূরা ও আয়াত নম্বরে ভুল পাওয়া যায়। এ বিষয়গুলো আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল প্রবন্ধ জমা দিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
* রচনা মনোনীত হলেও তা প্রকাশের অগ্রিম প্রতিশ্রুতিপত্র দেয়া হয় না এবং অমনোনীত লেখা ফেরতও দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।
* পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত ও তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকের।
* প্রকাশিত রচনার ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।
* উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের নিচে অথবা শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।
* মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।
* বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (Italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই: কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম-শতবর্ষ); পত্রিকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা)। মূল পাঠে বিদেশী শব্দ হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।
* প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক। গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে গ্রন্থপঞ্জিতে সকলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।
* প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিত হবে।
* জুলাই থেকে শুরু করে প্রতি তিন মাস অন্তর **'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'** প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখাসহ (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকাসহ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য গ্রন্থ কিনতে পাওয়া যায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রা ও ইসলামি নির্দেশনা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন*
মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন**

প্রস্তাবনা

মানব সভ্যতায় নগরায়ণের গুরুত্ব অপরিসীম। শহরকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সভ্যতার অগ্রগতিতে নগরায়ণ একটি রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও উন্নতির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। উন্নতির ছোঁয়ায় জীবনকে উদ্ভাসিত করতে এবং উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় নগরায়ণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে টেকসই নগরায়ণ না হলে নগরায়ণ পরিবেশের উপর নানাভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অধীন টেকসই নগরায়ণ একটি অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে চিহ্নিত। পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের গুরুত্ব অত্যধিক। ইসলামি দৃষ্টিকোণে পরিবেশ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক অসীম রহমত। পরিবেশে অবস্থিত সকল কিছুই মানুষের উপকারার্থে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম নগরায়ণের সমর্থনে পরিবেশ সুরক্ষায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিষয়ে ইসলামি নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে চিহ্নিত নির্দেশনার আলোকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হলে পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ করে টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রবন্ধে উদ্ধৃত সংশ্লিষ্ট পরিভাষা বিশ্লেষণ : 'পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রা ও ইসলামি নির্দেশনা' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে উদ্ধৃত কয়েকটি পরিভাষা বিশ্লেষণ করা হলো :

ক. পরিবেশ : পরিবেশ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ঠিকানা, অবস্থা, প্রকৃতি, পারিপার্শিক অবস্থা, প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদিকে বুঝায়।[১] পরিবেশের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'বীআ' (اَلْبِيْئَةُ)। এর শাব্দিক অর্থ স্থান বা বাসস্থান। 'বীআ' (اَلْبِيْئَةُ), 'বাআ' (اَلْبَاءَةُ) ও 'মাবাআ' (اَلْمَبَاءَةُ)

● অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

● সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

১ জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৬), পৃ. ৭৯৩।

শব্দগুলো কোনো জাতির বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপত্যকা বা পর্বতচূড়া, যেখানে তারা সংঘবদ্ধভাবে আশ্রয় নেয়। এ থেকেই যে স্থানে পানি পান করানোর জন্য উটকে বসানো হয় বা যেখানে সে রাত কাটায় তাকে 'মাবাআ' (اَلْمَبَاءَةُ) বলা হয়।[২] পরিবেশ সংজ্ঞায়নে ড. এফ. এম. মনিরুজ্জামান বলেন, "আমাদের চারপাশে যা দেখি বা যে সমস্ত জটিল উপাদানসমূহ বা বস্তুসম্ভার আমাদের স্বাস্থ্য, ভাল-মন্দ ও সুখ-দুখের উপর কর্তৃত্ব করে তা দিয়েই গড়ে উঠে আমাদের পরিবেশ। এক কথায় প্রকৃতির সঙ্গে জীবজগতের যে সম্পর্ক ও সহাবস্থান, মূলত তাকেই পরিবেশ বলা হয়।"[৩] পরিবেশ বিজ্ঞানী মেলজার (Malezer) বলেন, "Environment should be defined as the total of everything that directly influences the animals change to survive and reproduce."[৪] "যেসব শর্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশগতিবিস্তারের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে সেসব শর্তসমূহের সম্মিলিত যোগফলই হলো পরিবেশ।" বস্তুত মানুষের চারপাশের জীবজগৎ (পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, গুল্ম-লতা-পাতা জাতীয় উদ্ভিদ ও জড়জগত (সমতল ভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আগুন, পানি, বায়ু) সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

খ. পরিবেশ বিপর্যয় : বিপর্যয় শব্দটির আরবী পরিভাষা হলো ফাসাদুন (فَسَادٌ)। এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো– অপবিত্র, অনাচার, ক্রুটি, বিচ্যুতি, খারাপ, নিকৃষ্ট, নোংরা, কলুষিত, দূষণ ইত্যাদি। ফাসাদুন-এর ইংরেজি পরিভাষা হলো– rottenness, spoiledness, decay, iniquity ইত্যাদি।[৫] পরিবেশ বিপর্যয় বলতে পরিবেশের সাথে যথাযথ আচরণ না করে অনাচার করা, তথা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবেশের যে সব উপাদান থাকে তাদের যে কোন একটির পরিমাণ বা ঘনত্ব গ্রহণযোগ্য মাত্রার তুলনায় বেড়ে গেলে বা কমে গেলে সে অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ বিজ্ঞানী ওডাম (E.P. Odum) বলেন, Polution is an undesirable change in the physical, chemical or biological charcteristics of our air, land and water that may or will harmfully affect human life or that of desirable species, our industrial processes, living conditions and cultural assets or that may or will waste or deteriorate our raw material resources.[৬] ("পরিবেশ দূষণ হলো আমাদের বায়ু, মাটি ও পানির অবাঞ্ছিত ভৌত,

---

২ আবুল ফযল মুহাম্মদ বিন মুকাররম বিন আলী জামালুদ্দীন ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত : দারুছ ছাদের, ১৪১৪ হিজরী), খ. ১, পৃ. ৩৯।

৩ ড. এফ. এম মনিরুজ্জামান, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭), পৃ. ১৯।

৪ Shailendra K. Singh, Subhash C. kundu & Shoba Singh, *Ecosystem Management* (New Delhi : Mittal Publications, 1998), p. 40

৫ J Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York : Spoken Language Service, 1976), p. 712।

৬ S. Samuel Ravi, *A Comprehensive Study of Education* (New Delhi : PHI Learning Private Limited, 2011), p. 876

রাসায়নিক অথবা জৈবিক পরিবর্তন যা মানুষের জীবন অথবা কাঙ্ক্ষিক প্রজাতিসমূহ, আমাদের শিল্পধারা, জীবন যাত্রার পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক সম্পদের ক্ষতি করতে পারে বা ক্ষতি করবে অথবা এসব সম্পদের গুণগত মান কমিয়ে দেবে।") বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) অনুসারে পরিবেশ দূষণ হলো- "বায়ু, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলীসমূহের পরিবর্তন, অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখী, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য।"[৭]

গ. টেকসই নগরায়ণ : নগরায়ণ বর্তমান সময়ের একটি অতি পরিচিত বিষয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষ দিন দিন শহরমুখী হয়ে পড়ছে, যার ফলশ্রুতিতে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলা বিশ্বকোষ অনুসারে, "সুষ্ঠুভাবে বসবাসের পরিবেশ, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করে শহর এলাকাকে গড়ে তোলার বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাকে বলা হয় নগর পরিকল্পনা বা নগরায়ণ।"[৮] হযরত যায়দ ইবন আসলাম (রহ.) বলেন, বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ, ফল-ফসল উৎপাদন ও আহরণসহ মানুষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাই নগরায়ণ।[৯] টেকসই নগরায়ণ টেকসই উন্নয়ন কৌশলের একটি বিশেষ ধাপ। টেকসই নগরায়ণ বলতে নগর উন্নয়নের সাথে মানবসমাজ ও পরিবেশের সুসম্পর্ক তৈরিপূর্বক উন্নয়নের সুফল দীর্ঘমেয়াদি করা বুঝায়। অর্থাৎ টেকসই নগরায়ণ হচ্ছে এমন একটা উন্নয়ন ধারণা যা জনসংখ্যা ও পরিবেশের বর্তমান সার্বিক প্রয়োজন মেটানোর সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতেও সমর্থ হবে।

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা : আলোচ্য প্রবন্ধে লক্ষ্যমাত্রা বলতে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার অধীন ১১তম লক্ষ্যমাত্রা "টেকসই নগর ও জনপদ (Sustainable Cities and Communities)" শিরোনামে চিহ্নিত ১০টি বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা বুঝানো হয়েছে।

ঙ. ইসলামি নির্দেশনা : ইসলামি নির্দেশনা বলতে ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহের আলোকে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিতকরণে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদিকে বুঝানো হয়েছে।

পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে টেকসই নগরায়ণ লক্ষ্যমাত্রা ও ইসলাম

নগরায়ণ বিশ্বের সর্বত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি কার্যকরী বাহন হিসেবে প্রমাণিত এবং অর্থনীতির ভাষায় জাতীয় অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে

---

৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন* (১৯৯৫), ১৯৯৫ সালের ১ নং আইন, ধারা- ২(খ)

৮ সম্পাদান পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীণবুক হাউস লিমিটেড, ১৯৭৩), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫।

৯ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লিআহকামিল কুরআন* (মিসর : কায়রো, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৭), ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

তবুও পরিবেশের উপর নানাভাবে নগরায়ণ নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে পরিবেশ বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। দ্রুত নগরায়ণের ফলে নাগরিক ভৌত অবকাঠামোর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে এবং কৃষি ও বন খাতের আওতাধীন অঞ্চলসমূহ নির্মাণ কাঠামোয় ঢাকা পড়ে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, স্যানিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য অপসারণ, পরিবহন, টেলিযোগাযোগ, কেবল সংযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো নাগরিক সেবা ও উপযোগের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটির উদ্ভব ও নব্বইয়ের দশকে বিকাশ ঘটলেও জাতিসংঘ ২০১৫ সালের ২৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ১৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) নির্ধারণ করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি প্রধানতম লক্ষ্যমাত্রার ১১তম লক্ষ্যমাত্রা হলো- টেকসই নগর ও জনপদ (Sustainable Cities and Communities). অর্থাৎ, টেকসই নগরায়ণ। এ চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রার অধীন ১০টি বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারিত। নিম্নে এ লক্ষ্যগুলো অর্জনে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় জনসচেতনতা তৈরি ও আমাদের করণীয় নির্ধারণ করা হলো।

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১

“২০৩০ সালের মধ্যে, সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক পরিসেবাগুলির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং বস্তি উন্নয়ন সাধন করা।”[১০] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা : বাসস্থানের অধিকার একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার বাস্তবায়নের সবচেয়ে কার্যকর গ্রহণযোগ্য দিক হলো পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যই জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম দিক। এটি একটি উত্তম নগর ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণেও এর গুরুত্ব অত্যধিক। পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের নিশ্চয়তা ছাড়া নাগরিক জীবনের প্রশান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের বসবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সবার জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। বাসস্থানের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভবন ধস ও অগ্নিকাণ্ড মারাত্মক হুমকি। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ভবন ধস ও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রস্তুতি, প্রতিরোধ সক্ষমতা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে উঁচু প্রাসাদ ও বিশাল বিশাল অট্টালিকার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে, যা টেকসই উন্নয়ন ভাবনাকে প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ করে। সুতরাং সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি আবাসনের নিরাপত্তাকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামও আবাসনের ক্ষেত্রে এ নীতিমালাকে সমর্থন করে এবং এরই বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করে। মহান আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। এখানে বসবাসের উপযোগী বলতে শান্তি ও প্রশান্তির আবাস বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বাণী–

---

১০ By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums. [Editorial Board, *TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT* , ibid, P. 18]

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا۔

"আল্লাহ তোমাদের বাসস্থানকে করেন তোমাদের আশ্রয়স্থল।"[১১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস থেকে নিরাপদ আবাসস্থলের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী−

اَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ۔

"চারটি জিনিস সৌভাগ্যের প্রতীক : সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং ধৈর্যশীল বাহন।"[১২]

২. মৌলিক পরিসেবাগুলোর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা : টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ আবাসনের পাশাপাশি মৌলিক পরিসেবাগুলোর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি। মৌলিক পরিষেবা বলতে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিস্কাশন ইত্যাদি। ইসলাম আদর্শ ও স্বাস্থ্যসম্মত নাগরিক জীবন-যাপনের জন্য অত্যাবশ্যক সেবাসমূহের সহজপ্রাপ্যতার নির্দেশনা দিয়েছে। সুশৃঙ্খল ও আরামপ্রদ নগরায়ণের জন্য অবকাঠামো তৈরির সরঞ্জাম, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবার সহজলভ্যতা অতীব জরুরি। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীকে সকল প্রকার সেবার সহজপ্রাপ্যতার উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন। ভূপৃষ্ঠকে লৌহ বা প্রস্তরের ন্যায় শক্ত করা হয়নি; এরূপ হলে তাতে শস্য উৎপাদন ও বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব হতো না, কূপ ও খাল খনন করা যেতো না এবং মাটি খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেতো না। এর সাথে সাথে আল্লাহ ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন যাতে এর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।[১৩] জীবনকে গতিশীল রাখতে পানির বিকল্প নেই। নিরাপদ ও সুপেয় পানি মানব জীবনের অন্যতম চাহিদা। উন্নত ও সমৃদ্ধ নগরায়ণের জন্য পানির পর্যাপ্ততা ও বিশুদ্ধ পানির সহজপ্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানি ব্যবস্থাপনার সকল নির্দেশনাই ইসলামে বিদ্যমান। পানি দূষণরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন−

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ ۔

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন নিজ গোসলখানায় পেশাব না করে।"[১৪]

---

১১ আল কুরআন, সূরা নাহল, ১৬ : ৮০।

১২ ইব্‌ন আহমদ আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান* (বৈরূত, মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩), হাদীস নং : ৪০৩২।

১৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত, *তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন* (মদীনা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হি.), পৃ. ৫২৬।

১৪ আবু আব্দুর রাহমান আহমদ বিন শুআইব আন নাসায়ী, *আস-সুনান* (হালব : মাকতাবাতু মাতবাআতু আল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরী), হাদীস নং : ৩৬।

রাসূলুল্লাহ (সা) স্থির পানিকে দূষণমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাতে মূত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।"[১৫]

মৌলিক পরিসেবাসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা অন্যতম। সুষ্ঠু স্যানিটেশনের অভাবে মল-মূত্র যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, এর প্রভাবেই সমাজের অধিকাংশ রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। পরিবেশ সুন্দর ও নির্মল রাখতে সুষ্ঠু স্যানিটেশনের গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (সা.) উন্নত স্যানিটেশন প্রসঙ্গে বলেন :

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ

"তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ পরিহার করো– মানুষের ছায়া গ্রহণের স্থানে, যাতায়াতের পথে এবং পানির ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করা।"[১৬]

মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। নাগরিকদের শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইসলাম শিক্ষাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষার্থী বা সন্তানদেরকে আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলেছেন :

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ

"পিতা তার সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের চেয়ে অধিক উত্তম কিছু উপহার দিতে পারে না।"[১৭]

সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন উন্নত নগরের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় অবস্থানকালে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মদীনায় গিয়ে শিক্ষালয় স্থাপন করেছিলেন। ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী আধুনিক শিক্ষা উন্নত, দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক তৈরি করতে পারে।

মৌলিক পরিষেবাসমূহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। সুস্থতা মহান আল্লাহ্র একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ইসলামে এ বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম ব্যবস্থা। রোগাক্রান্ত

---

১৫ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী আল কুসাইরী, *আস-সহীহ* (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), হাদিস নং ৬৫৪/৯৪।

১৬ আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), হাদিস নং : ২৬।

১৭ আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আস-সুনান*, (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), হাদিস নং ১৯৫২।

হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। হাদিসে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ.

"তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগনিরাময় রয়েছে : মধুপানে, রক্তমোক্ষণে এবং আগুন দিয়ে দাগ লাগানোতে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি।"[১৮]

সুতরাং সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই নগর ব্যবস্থাপনায় এই বিষয়টির নিশ্চয়তা প্রয়োজন।

৩. বস্তি উন্নয়ন : বস্তি সমস্যা প্রতিটি দেশেরই সাধারণ সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। বিশেষত জনবহুল দেশসমূহে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। টেকসই উন্নয়নে বস্তি সমস্যার সমাধান তথা বস্তি উন্নয়নের বিকল্প নেই। রাজধানী শহরসহ বড় বড় শহরসমূহে বস্তি সমস্যা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেকারত্ব, অতি দারিদ্র ইত্যাদি নানাবিদ কারণে ঘর-বাড়ি হারিয়ে প্রতিনিয়তই মানুষ বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এসকল বস্তিবাসী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানাবিদ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকার বঞ্চিত এসকল মানুষকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণে সমাজের যেকোনো বঞ্চিত দরিদ্রের বিপদে সহায়তা করা ধনীদের উপর কর্তব্য। কুরআনের বাণী,

وَفِيْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"তোমাদের ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক রয়েছে।"[১৯]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-২

"২০৩০ সাল নাগাদ সর্বোপরি নিরাপদ, সাশ্রয়ী মূল্যের, সহজলভ্য এবং টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে সরকারী পরিবহনের বিস্তৃতি দ্বারা অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকা মহিলা, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া।"[২০] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. সড়ক নিরাপত্তা : উন্নয়নের একটি অন্যতম দিক হলো সড়ক তথা যোগাযোগব্যবস্থার নিরাপত্তা। সড়ক নিরাপত্তা বিধানে নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য পরিবহনের নিশ্চয়তা বিধান করা অত্যাবশ্যক। যাতায়াত ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নগর

১৮ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *আস-সহীহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং ৫৬৮০।

১৯ আল কুরআন, সূরা যারিআত, ৫১ : ১৯।

২০ By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

পরিকল্পনায় যাতায়াত ব্যবস্থার প্রতি নজর দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘর-বাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণ, বিন্যাস ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি এমনভাবে এসবের বিন্যাস ও পরিকল্পনা করতেন যাতে চলাচলের পথ ও চলাচলকারী উভয়ের অধিকার রক্ষা হয় এবং মসজিদের হক রক্ষা হয়।[২১] যাতায়াতের পথ নিষ্কণ্টক করা শুধু মু'মিনের কর্তব্যই নয়, এটি ঈমানের অন্যতম শাখাও বটে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً، فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ.

"ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতর হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই বলা এবং নিম্নতর হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।"[২২]

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা নাগরিকদের জীবনমানের অগ্রগতি হয়। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে বাজারজাত করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের জীবন পরিচালনা সাবলীল হয়। সড়ক নিরাপত্তা বিধানে যথাযথ স্থানে পর্যাপ্ত প্রশস্ত সড়কের ব্যবস্থা করা জরুরি। আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনায় সড়ক নিরাপত্তায় পরিকল্পিত উপায়ে ফ্লাই ওভার, আন্ডার পাস, মেট্রোরেল ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামেও প্রশস্ত সড়ক নির্মাণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুফা শহর প্রতিষ্ঠার সময় হযরত উমর (রা.) শহরের রূপরেখা বিষয়ক যে স্মারকপত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন তা মুসলমানদের জন্য একটি স্মরণীয় বিষয়। সেখানে এ মর্মে নির্দেশ ছিল যে, মহাসড়কগুলো যেন চল্লিশ হাত প্রশস্ত রাখা হয় আর নিম্নের পরিমাপ যেন যথাক্রমে ত্রিশ হাত এবং বিশ হাতের চেয়ে কম না হয়।[২৩] নিরাপদ সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যাতে করে সড়ক অযত্নে-অবহেলায় ব্যবহার অনুপযোগী না হয়ে পড়ে। এজন্য নিয়মিত সড়ক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। যাতায়াতের রাস্তাঘাট যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্যও রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশনা দিয়েছেন :

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قَالُوْا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ، اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ۔

"তোমরা দু'টি অভিশাপযুক্ত কাজ পরিহার করো। তারা জিজ্ঞেস করলেন, উক্ত অভিশাপযুক্ত কাজ দুটি কি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে অথবা মানুষের ছায়া গ্রহণের স্থানে পায়খানা-পেশাব করে।"[২৪]

---

২১ মুহাম্মদ আল-আলাবী আল-মালিকী আল-হুসায়নী, *মুহাম্মদ আল-ইনসানুল কামিল* (সৌদি আরব : ১৯৮৪), পৃ. ৬১।

২২ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৫২/৫৭।

২৩ আল্লামা মুশাহিদ (রহ.), *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা* (সিলেট : আহমদিয়া লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ২০০৪), পৃ. ১৭৬।

২৪ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৬১৮/৬৮।

২. মহিলা, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সড়ক ব্যবহারে সহায়তা : দেশের জনগোষ্ঠীর কোনো অংশকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় দেশের মহিলা, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদেরও যথাযথ উন্নয়নে অংশীদার করতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সড়ক তথা যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাদের বিশেষ অসুবিধা বিবেচনায় তাদের জন্য স্বতন্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত প্রতিটি পরিবহণে সিট বরাদ্ধ এবং তাদের জন্য পৃথক বাস স্টপিজের ব্যবস্থা অন্যতম। ইসলাম সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা দেয়। ইসলাম এ ধরনের কাজকে ইহসান হিসেবে বিবেচনা করে। ইহসান সম্পর্কে কুরআনের বাণী–

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"তোমরা তেমনিভাবে ইহসান করো যেমনিভাবে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর ইহসান করেছেন।"[২৫]

মহিলা, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদেরকে সম্মানের সাথে পরিবহনে বসার ব্যবস্থা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا۔

"যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া-মমতা প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।"[২৬]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৩

"২০৩০ সালের মধ্যে, সকল দেশে অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত এবং টেকসই মানব বসতি পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য সমন্বিত এবং টেকসই নগরায়ণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।"[২৭] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. টেকসই মানব বসতি পরিকল্পনা : মানব বসতি পরিকল্পনা বলতে মোট বসবাসযোগ্য ভূমিতে মোট জনসংখ্যার পূর্ণবিভাজনের ভিত্তিতে মানব বসতি গড়ে তোলা। মানব বসতি পরিকল্পনার সাথে ভূমির যথাযথ ব্যবহার, ভূমির উপর অত্যধিক চাপ হ্রাস, চাষযোগ্য ভূমিতে আবাস নির্মাণ হার হ্রাস, পতিত জমির সদ্ব্যহার ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব বসতি পরিকল্পনা বুঝতে হলে মানব বসতির যথাযথ সংজ্ঞায়ন জানতে হবে। মানব বসতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Akinrogunde তার "A Handbook on Introduction to Human

২৫ আল কুরআন, সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৭।

২৬ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৯১৯।

২৭ By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

Settlement and Housing" গ্রন্থে বলেন, "A Human Settlement is defined as a place inhabited more or less permanently. It includes building in which they live or use and the paths and streets over which they travel. It also includes the temporary campus of the hunters and herders."[২৮] (মানব বসতি বলতে এমন স্থানকে বুঝায় যেখানে মানুষ স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। যেখানে মানুষের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি থাকে, চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট থাকে। এমনকি এখানে মানুষের শিকারের স্থান ও পশুচারণভূমি তথা জীবন-জীবিকা নির্বাহের উপকরণাদি থাকবে।) টেকসই উন্নয়নের সাথে টেকসই মানব বসতি পরিকল্পনার বিকল্প নেই। বিশেষত অধিক জনসংখ্যার দেশসমূহে মানব বসতি পরিকল্পনা অত্যধিক কার্যকর। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুসারে এদেশের ১৬১.৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা ১৪৭৫৭০ বর্গ. কি.মি. আয়তনের মধ্যে বসবাস করে।[২৯] অধিক জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। ফলে নগরের পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ বিশাল জনসংখ্যা অপর্যাপ্ত নগণ্য স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষার অভাব, অপর্যাপ্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, উচ্চ বেকারত্বের হার, প্রশাসনিক দুর্বলতা, সম্পদের ভারসাম্যহীনতা বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে যেমন– ভূমি, ভূগর্ভস্থ পানি, বন ধ্বংস, মৎস খামার নিধন, ভূমি ও পানি দূষণ ইত্যাদি সমস্যার মুখোমুখি হয়। সর্বোপরি জনসংখ্যার চাপে বহুল জনসংখ্যার দেশসমূহে অতিদ্রুত নগরায়ণের ফলে পরিবেশের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে মানব বসতি পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

২. টেকসই নগরায়ণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা : বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর নগরের জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন- ১৯৭৪ সালে নগরের জনসংখ্যা ৮.২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩.৩% অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের জনসংখ্যার হার ২০২১ সালের মধ্যে ৩১.৪% এ বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রায় সব জায়গায় নগরের কেন্দ্রবিন্দুতে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন– মেট্রোপলিটন অঞ্চল, জেলা শহর, উপজেলা কেন্দ্রবিন্দু, বর্ধিত জায়গায় এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্রবিন্দুর মত স্থানে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা মেট্রোপলিটন অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা বাস করে। ২০১১ সালে শুধু ঢাকাতেই ৬৯৭০ জন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের মধ্যে এটিই সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর।[৩০] অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে দেশ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নগর অঞ্চল বিশেষ করে, ঢাকা শহরে ব্যাপক দূষণ সমস্যা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুরবস্থা, বিশুদ্ধ পানির সমস্যা, বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, পয়ঃনিষ্কাশন অসুবিধা, অপর্যাপ্ত জলনির্গমন পদ্ধতি, শিল্প কারকাখানার অপরিকল্পিত বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব

২৮ Akinrogunde, *A Handbook on Introduction to Human Settlement and Housing* (New York : 2016), p.2.

২৯ Labour Force Survey Bangladesh (2016-2017), (Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, January 2018), p. xv.

৩০ Ministry of Planning, Government of The Peoples Republic of Bangladesh, National Sustainable Development Stategty, May-2013, p. 33.

কারণে নগরের দরিদ্র জনগণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষত, নারী এবং শিশুরা ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। সুতরাং শহরকে উন্নয়ন ও অগ্রসর করার সাথে সাথে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলা দরকার, এ লক্ষ্যেই টেকসই নগরায়ণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষত নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় দিকসমূহের সুব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামও মানুষের বসবাসের স্থানকে নিরাপদ ও যথোপযুক্ত করতে নির্দেশনা দেয়। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। যা থেকে টেকসই মানব বসতি পরিকল্পনা ও টেকসই নগরায়ণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔

"আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।"[৩১]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৪

"বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং সুরক্ষার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টাকরণ।"[৩২]
এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একটি জাতির উন্নতির পরিচায়ক। শহর-নগর প্রতিষ্ঠার পর তা বিভিন্ন মসজিদ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত শিক্ষালয়ের মাধ্যমে শোভামণ্ডিত রাখা ধর্মীয় উৎকর্ষের লক্ষণ এবং শিল্পকারখানা ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত রাখা পার্থিব সাফল্যের লক্ষণ। নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শরীয়াতসম্মত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলার মাঠ, জলাশয় ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। ইসলামের কোনো নির্দেশ বা অনুশাসনের ব্যাঘাত না ঘটলে যে কোনো খেলাধুলাই হতে পারে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সহায়ক। ইসলাম সুস্থ বিনোদনকে সমর্থন করে এবং মানবিকতা বিকাশে সুস্থ বিনোদন চর্চায় অনুপ্রেরণা দেয়। মহান আল্লাহ সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"মহান আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[৩৩]

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রী আয়িশা (রা.)-এর সাথে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং সাহাবীগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। এ হাদিস থেকে

---

৩১ আল কুরআন, সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৩।

৩২ Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

৩৩ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ৯১/১৪৭।

প্রমাণিত যে, দৌড় প্রতিযোগিতার ন্যায় শরিআহসম্মত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে।

হযরত আয়িশা (রা.) নিজেই বলেছেন,

سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ.

"রাসূলুল্লাহ (সা.) দৌড়ে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করলেন। তখন আমি দৌড়ে আগে পৌঁছে গেলাম।"[৩৪]

২. প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা : মানুষের অসাবধানতা ও খামখেয়ালীর দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। আর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক শোভাবর্ধন, পরিবেশকে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত রাখতে মানব শক্তির সঠিক প্রয়োগ ইসলামের দাবি। নগরকে পরিবেশগত অকল্যাণ তথা রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করার জন্য নগরের পরিবেশ, বিশেষত বায়ুর দিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। কারণ বায়ু যদি স্থির ও দূষিত হয় এবং দূষিত জলাশয়, দুর্গন্ধযুক্ত পয়ঃপ্রণালী অথবা স্যাঁতসেঁতে স্থানের নিকটবর্তী হয়, তাহলে এর ফলে বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে এবং পরিবেশকে রোগজীবাণু বৃদ্ধির সহায়ক করে তোলে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের সংরক্ষণ, উন্নয়ন করা এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা মানব জাতির জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"ভূপৃষ্ঠে শান্তি স্থাপনের পর তাতে তোমরা বিপর্যয় ঘটাবে না। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"[৩৫]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৫

"২০৩০ সাল নাগাদ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষের মৃত্যুহার ও আহতের হার গুরুত্বের সাথে কমানো। জলবায়ু সম্পর্কিত দুর্যোগ, বিশেষত বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির ফলে বিশ্বব্যাপী বার্ষিক গড় আয়ু হ্রাসের পরিমাণ কমানো। বিশেষত বিপজ্জনক অবস্থানে থাকা দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।"[৩৬] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

---

৩৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), হদীস নং-১৯৭৯।

৩৫ আল কুরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৮৫

৩৬ By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমানো : পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা যায় না ; বরং যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষরা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, দাবানল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের অত্যধিক অত্যাচার তথা বিপর্যয় সৃষ্টি করার ফলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও এর সত্যতা এভাবে ফুটে উঠেছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায় (বিপর্যয় সৃষ্টি হয়)। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৩৭]

কুরআনী নির্দেশনা থেকেও প্রতিয়মান যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা যাবে না। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনের লক্ষ্যে আমাদেরকে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পূর্বপ্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য তথা পরিবেশ দূষণকারীদের জন্য তাযীরী শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছে।

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান : প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে সাধারণত খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প ইত্যাদিকেই বুঝায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। সুতরাং টেকসই নগরায়ণের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত, তাদের নিরাপত্তায় শক্ত কাঠামোর আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত, দুর্যোগকালীন উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ, দুর্যোগকালীন খাবার ও পানিয়ের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ পরবর্তী চিকিৎসা সেবা এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করা জরুরি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ অনেকাংশে নির্ভরশীল। কেননা যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে, এসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী অপরিকল্পিত আবাসন তৈরি, বর্জ অব্যবস্থাপনা, খোলা পায়খানা, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ইসলাম পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধানে নির্দেশনা দেয়। ইসলাম সর্বাবস্থায় সকলের নিরাপত্তায় বদ্ধপরিকর। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ۔

৩৭ আল কুরআন, সূরা রূম, ৩০ : ৪১

"আল্লাহ তার প্রতি দয়া করে না, যে অন্য মানুষের প্রতি দয়া না করে।"[৩৮]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৬

"২০৩০ সাল নাগাদ শহরগুলির উপর মাথাপিছু পরিবেশগত প্রভাব কমানো এবং পৌর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বায়ুর মান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা।"[৩৯] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. শহরের উপর মাথাপিছু পরিবেশগত প্রভাব কমানো : নগরায়ণ পরিবেশের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মানব বসতির পরিমাণ বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের লক্ষ্যে কলকারখানা বৃদ্ধি পরিবেশের উপর মূল প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। এ প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত করতে হলে শহরের উপর পরিবেশ বিপর্যয়কারী প্রভাব কমানোর বিকল্প নেই। বিশেষত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, বস্তি উন্নয়ন, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা, স্যানিটেশন সুবিধা, ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা, কারখানায় বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নির্গমণ হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমেই পরিবেশগত প্রভাব কমানো সম্ভব। ইসলাম মানুষকে সুষ্ঠু সুন্দর ব্যবস্থাপনায় বসবাসের লক্ষ্যে পরিবেশ বিপর্যয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔

"তোমরা জমীনে ফাসাদ (দূষণ) সৃষ্টি করো না। এটাই হবে তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"[৪০]

২. পরিবেশের উপর নগরায়ণের প্রভাব হ্রাসের লক্ষ্যে বর্জ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়ুর মান নিয়ন্ত্রণ : নগরায়ণের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বর্জ ব্যবস্থাপনা। নিম্নভূমি, খাল এবং পুকুর ভরাট করে আবাসন নির্মাণ, যথাযথ স্থানসংকুলান না থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, খাল দখল ইত্যাদি কারণে নগরের বর্জ ব্যবস্থাপনা বাধাগ্রস্থ হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত ময়দানে বর্জ রাখা, নগরের চারপাশের খাল, নর্দমায় বর্জ ফেলা, বর্জ দিয়ে খাল-পুকুর ভরাট ইত্যাদির ফলে বায়ুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আদর্শ নগরের বৈশিষ্ট্য হলো দূষণমুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বর্জ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে কঠিন বর্জ রিসাইক্লিং বা পুন:ব্যবহারযোগ্য করে তোলা কার্যকর সমাধান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া স্বল্প ব্যায়েই বর্জ থেকে সার তৈরি করা সম্ভব।[৪১] সুতরাং টেকসই নগরায়ণে পরিবেশের উপর নগরায়ণের প্রভাব হ্রাসের লক্ষ্যে বর্জ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়ুর মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ

---

৩৮ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ৭৩৭৬।

৩৯ By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

৪০ আল কুরআন, সূরা আরাফ, ৭ : ৮৫।

৪১ হাসান হাফিজ ও অন্যান্য, দক্ষ বর্জ ব্যবস্থাপনা, কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলাদেশ পরিবেশচিত্র ১৪০৬* (ঢাকা : বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম, এপ্রিল ২০০০), পৃ. ১৪৯-১৫০

(সা.)-এর যুগে ইহুদীদের অভ্যাস ছিলো ঘর-বাড়ির পাশেই ময়লা-আবর্জনা ফেলা, জমা করে রাখা। ফলে তাদের বাড়ি-ঘরের পুরো পরিবেশটি দুর্গন্ধময় হয়ে যেতো, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের বিপরীত ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জোর তাকিদ দিয়ে বলেন :

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُوْدَ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি নির্মল-পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি সুমহান, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, বদান্যতা ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের আঙ্গিনাসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং তোমরা সেগুলোকে ইয়াহূদীদের মত (অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় করে) রেখো না।"[৪২]

এছাড়াও ইসলামে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ.

"আবু মালিক আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ।"[৪৩]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৭

"২০৩০ সাল নাগাদ নারী ও শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরাপদ, সমন্বিত এবং নির্ভরযোগ্য, সবুজ বনায়নে এবং গণস্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।"[৪৪] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো–

সবুজ বনায়ন এবং গণস্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার

নগরের জীবন অনেকাংশে হয়ে উঠে যান্ত্রিক সভ্যতার ছত্রছায়ায় ইট-পাথরের দেয়ালে আবদ্ধ। এ পরিবেশে একটুখানি সবুজের ছোয়া প্রতিটি নাগরিকের একান্ত কাম্য। সবুজ বনায়ন আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে যেমন রাখে সতেজ তেমনি আমাদের চিত্তে দেয় আনন্দের দোলা। প্রকৃতিকে মনোরম, সুশীতল ও সুন্দর করতে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ইসলাম বৃক্ষরোপণে গুরুত্বারোপ করে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী,

---

৪২ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৭৯।

৪৩ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ৫৩৪/১।

৪৪ By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

عَنْ اَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، اَوْ اِنْسَانٌ، اَوْ بَهِيمَةٌ، اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ۔

"আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কোন মুসলমান যখন কোন কিছু রোপণ করে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ অথবা কোন চতুষ্পদ জন্তু কোন কিছু ভক্ষণ করে তা রোপনকারীর জন্য সদকার সমতুল্য সাওয়াব হয়।"[৪৫]

নাগরিক জীবনের মানসিক প্রশান্তির জন্য সবুজ বনায়ন, পার্ক, খেলার মাঠ, মনোরম জলাধার, ঝর্ণা, যাদুঘর ইত্যাদি তৈরি করা হয়। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ভুলে মানুষ ছুটির দিনে এসকল স্থানে ভীড় জমায়। টেকসই নগরায়ণের অন্যতম উপাদান হলো এসকল স্থানে নারী ও শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীসহ সকলের নিরাপদ ও অবাদ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। ইসলামি দৃষ্টিকোণে এগুলো হলো প্রাকৃতিক সম্পদ, আর প্রাকৃতিক সম্পদে সমাজের সকলের সমানাধিকার। কেননা মহান আল্লাহ মানুষের উপকারার্থেই বৃক্ষ উৎপন্ন করেন, এতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষাধিকার নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ۔

"অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।"[৪৬]

এসকল সবুজ বনায়ন এবং গণস্থানে সকলেরই সমানধিকার আছে। সুতরাং কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মহান আল্লাহ কারো অধিকার বিনষ্ট না করার আদেশ দিয়ে বলেন–

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ۔

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের আদল (ন্যায়পরায়ণতা) ও ইহসান করার আদেশ দিয়েছেন।"[৪৭]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৮

"জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করে নগর, পৌর, শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ইতিবাচক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত কার্যকলাপকে সমর্থন করা।"[৪৮]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো–

---

৪৫ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৫৫৩/১২।

৪৬ আল কুরআন, সূরা মুমিনুন, ২৩ : ১৯।

৪৭ আল কুরআন, সূরা নিসা, ৪ : ৫৮।

৪৮ Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে ষাটের দশক পর্যন্ত একই সমার্থক মনে করা হতো, কেননা ঐ সময়ে উন্নয়নের সাথে সমাজের মানুষের কতটুকু উন্নয়ন তার বিবেচনা করা হতো না।[৪৯] পরবর্তীতে সত্তরের দশকের পরে উন্নয়ন ভাবনায় মানব উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি ভাবনা যুক্ত হয়। এভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সমউন্নয়ন তথা সমাজকল্যাণ ভাবনা থেকেই টেকসই উন্নয়ন ভাবনার আবির্ভাব। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম উপাদান টেকসই নগরায়ণের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়ন একীভূত। টেকসই নগরায়ণে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর খুবেই প্রয়োজন। জনসংখ্যা একটি দেশের মূল সম্পদ, যদি জনসংখ্যাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে মানব সম্পদে রূপদান করা যায়। সুতরাং টেকসই নগরায়ণের লক্ষ্যে নগর ব্যবস্থাপনায় জনসংখ্যাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। জনসংখ্যাকে সুশিক্ষিত করে, বিশেষত কারিগরি শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত করতে হবে। নাগরিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জীবিকার জন্য সকল নাগরিকের পেশা গ্রহণ ও কাজ করার সুবিধা থাকতে হবে। ইসলাম কর্মের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো উত্তম গুণাবলীর একটি। মহান আল্লাহ বলেন,

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

"কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৫০]

হালাল পন্থায় রিযিক গ্রহণ, স্বনির্ভর ও কর্মক্ষম হওয়া মুসলমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

"অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৫১]

একইসাথে উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নগরে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি নগরের আর্থিক প্রবৃদ্ধি এবং সমাজ উন্নয়নে অর্থনৈতিক অবদান রাখা সম্ভব হবে। ইসলাম হালাল উপায়ে যেকোনো ধরনের শিল্পায়নকে উৎসাহিত করে। শিল্পায়ন সম্পর্কে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বরোপ করেছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ শুধু উৎসাহের বাণী প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি; বরং শিল্প ও ব্যবসার ময়দানে তাদের বিশাল অবদান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

---

৪৯ রিজওয়ান ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৪), পৃ. ৭-৮।

৫০ আল কুরআন, সূরা আনকাবুত, ২৯ : ১৭।

৫১ আল কুরআন, সূরা জুমআ, ৬২ : ১০।

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ۔

''আমি তাঁকে (দাউদ আলাইহিস সালাম) বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে।''[৫২]

শিল্প মহান আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে অভিহিত। আল্লাহ্র নবীগণ কোনো না কোনো শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। নূহ আলাইহিস সালাম জাহাজ নির্মাণ করেছেন।[৫৩] কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নগর পরিকল্পনায় অবহেলিত জনগোষ্ঠী, বিধবা, ইয়াতিম, ছিন্নমূল ভাসমান মানুষ, প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির থাকা-খাওয়া ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওয়াত এসকল লোকদের ভরণ-পোষণ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, ইয়াতিম পুনর্বাসন কর্মসূচি, অক্ষম-দরিদ্রের পুনর্বাসন, সক্ষম দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। বিশেষত যাকাত, ফিতরা, সাদাকাত ইত্যাদি ফান্ডের অর্থ দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়।

তাদের প্রতি আমাদের করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা–

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وجارهُ جَائِعٌ۔

"যে ব্যক্তি নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী তারই পাশে অভুক্ত থাকে সে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন নয়।"[৫৪]

এসকল শ্রেণির লোকদের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হিসেবে সমাজের নিঃস্ব ও অক্ষম মানুষদের অর্থনৈতিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে তাদের জন্য ব্যয় করা ফরজ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ۔

"যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে।"[৫৫]

২. পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা : পরিবেশ উন্নয়ন ব্যতীত টেকসই নগরায়ণ কল্পনা করা যায় না। পরিবশ উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনার বিকল্প নেই। পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় বায়ু, মাটি, পানি ও শব্দ দূষণ প্রতিরোধে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যা অন্য কোনো উপায়ে পরিবেশের ক্ষতির কারণ না হয়। যেমন- পানি দূষণ প্রতিরোধে

৫২ আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮০

৫৩ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৪৩

৫৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, তা.বি), হাদীস নং : ১১২।

৫৫ আল কুরআন, সূরা তাওবাহ, ৯ : ৬০।

ময়লা পানিতে না ফেলে উন্মুক্ত স্থানে রেখে দিলে পানি দূষণ বন্ধ হলেও তা বায়ু দূষণ করে, সুতরাং এক্ষেত্রে পরিকল্পনা হবে পানিতে ময়লা না ফেলে গর্তে ফেলা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "টেকসই উন্নয়নকে এমনভাবে সীমিত করতে হবে, যাতে এই পৃথিবী নামের গ্রহটির প্রাণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যেমন- আবহাওয়া, পানি, মাটি এবং জীবিত প্রাণী এগুলোকে (উন্নয়ন কৌশলকে) সহায়তা প্রদান করে।"[৫৬] ইসলাম এমন সকল কাজকেই নিষিদ্ধ করে, যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ۔

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।"[৫৭]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৯

"২০২০ সালের মধ্যে, দুর্যোগের জন্য Sendai ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুর্যোগ প্রশমন ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সমন্বিত নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে শহর এবং মানব বসতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা। বিশেষত সকল পর্যায়ে ২০১৫-২০৩০ সালের মধ্যে হোলিস্টিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা।"[৫৮]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো–

১. দুর্যোগ প্রশমন ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করে শহর এবং মানব বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তন টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা। পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাবে জলবায়ু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে পরিবেশের উপর নেমে আসে নানা দুর্যোগ। দুর্যোগ প্রশমন ও দুর্যোগ মোকাবিলা করে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই নগরায়ণ গড়ে তোলা সম্ভব। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কমিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিক দশক ঘোষণার অংশ হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনের আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে ১৩ অক্টোবর মনোনীত করে। ২০০৯ সালে, জাতিসংঘের

---

৫৬ ড. মাহফুজুল হক, পরিবেশের টেকসই ব্যবস্থাপনা, কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলাদেশ পরিবেশচিত্র ১৪০৬ (ঢাকা : বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম, এপ্রিল ২০০০), পৃ. ১৩৩।

৫৭ ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৩৪১।

৫৮ By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

সাধারণ পরিষদ ১৩ অক্টোবরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটি পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫৯] জলবায়ু পরিবর্তন এ পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমাদেরকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনে ইসলামের 'মুআমালাত'-এর নীতি অনুসরণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ সৃষ্টির মানবসৃষ্ট কারণসমূহ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি, নৈতিক উন্নয়ন, মহান আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। কেননা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে দুর্যোগকে আমাদের হাতের অর্জন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের বাণী,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায় (বিপর্যয় সৃষ্টি হয়)। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৬০]

সুতরাং দুর্যোগকালীন ভয় ও ক্ষতির আশংকায় নগর ত্যাগ না করে দুর্যোগ প্রশমন ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শহর ও মানব বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই টেকসই নগরায়ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামও আমাদেরকে বিপদে হতাশ না হয়ে পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময় থেকে উত্তরণের উপায় হলো- পাপ থেকে বিরত থাকা ও তাওবা করা, ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহ্র শোকর করা, সৎকাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজে বাধা দেয়া, আল্লাহ্র বিধান মোতাবিক জীবন যাপন করা, ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি।[৬১]

সকল বিপদ আপদে ধৈর্যের আদেশ দিয়ে কুরআনের বাণী–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো ও ধৈর্যে অটল থাকো এবং পাহারায় নিয়োজিত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হও।"[৬২]

২. হোলিস্টিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় একটি তত্ত্ব হলো হোলিস্টিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। হোলিস্টিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগের সামাজিক,

---

৫৯ Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2009, 66th plenary meeting, 21 December 2009.

৬০ আল কুরআন, সূরা রূম, ৩০ : ৪১।

৬১ ড. মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম, *সমকালীন খুতবা* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, জুন ২০১৭), পৃ. ৫০০-৫০১।

৬২ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০০।

অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত, পরিবেশগত, বাস্তুসংস্থানগত ইত্যাদি সকল বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান পূর্বক এবং সকল বিষয়ের যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে ঝুঁকি মোকাবিলার চেষ্টা করা। এ পদ্ধতিতে ঝুঁকি মোকাবিলার ফলে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কোনো অংশ বাদ দিয়ে কোনো অংশকে বিশেষ বিবেচনা না করে সমগ্র ব্যবস্থাকে সম্ভাব্য ঝুঁকিমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। টেকসই নগরায়ণে স্বাভাবিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিপরীতে হোলিস্টিক ঝুঁকি মোকাবিলাই অধিক কার্যকর। ইসলামও আমাদেরকে দুর্যোগকালীন মুহূর্তে দুর্যোগ প্রশমন ও সম্পদ ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনে একে অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নির্দেশনা দেয়।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দিবেন।"[৬৩]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১০

"স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই এবং স্থিতিশীল ভবন নির্মাণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলোকে সহায়তা করা।"[৬৪]

পরিপূর্ণ পরিকল্পনার অভাবে এবং পরিমিত আর্থিক সংস্থানের অভাবে শহরের ভবন অনেক ক্ষেত্রে বসবাসের অনুপেযোগী হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও যথাযথ পরীক্ষা-নীরিক্ষা ব্যতীত বহুতল ভবন নির্মাণের কারণে বাংলাদেশের শহরগুলো হুমকির সম্মুখীন হয়। টেকসই ভবন নির্মাণ না হলে ভূমিকম্প, ভবন ধস ইত্যাদির মাধ্যমে জনজীবন হুমকীর মুখে পড়ে; টেকসই উন্নয়নের পথে যা মারাত্মক প্রতিবন্ধক। তাই টেকসই নগরায়ণের লক্ষ্যে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই এবং স্থিতিশীল ভবন নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা জরুরি। ইসলাম যেকোনো কাজে আর্থিক বিপদগ্রস্তকে সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে গরীব-অসহায়, দুস্থদের মাঝে যাকাত, ফিতরা, সাদকার অংশ থেকে সহায়তা করার নির্দেশ রয়েছে–

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَ

السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ

"আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে।"[৬৫]

---

৬৩ ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৫৮০/৫৮।

৬৪ Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials. [TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ibid]

একইসাথে ধনীদের আর্থিক সংকটাপন্ন অবস্থায় তাদেরকেও করযে হাসানা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কুরআনের বাণী–

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ـ

“যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।”[৬৬]

উপসংহার : বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের জন্য আধুনিকাতার সাথে তাল মিলিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে কল-কারখানা নির্মাণ প্রতিনিয়তই বাড়ছে। নগরায়ণ পরিবেশের উপর নানাভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং টেকসই নগরায়ণ ব্যতীত পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলা সম্ভব নয়। তাই পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণের বিকল্প নেই। ইসলাম টেকসই নগরায়ণ ও পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপস্থাপিত কর্মকৌশলকে যথাযথ বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- অবকাঠামো নির্মাণে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।
- নিরাপদ ও সুপেয় পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।
- বস্তি উন্নয়নে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং যাকাত তহবিল গঠন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বস্তি সমস্যার সমাধান।
- নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে উড়াল সেতু, আন্ডার পাস, পাতাল সড়ক, পাতাল রেল এবং সিগনাল ক্রসিং ব্যবস্থাপনায় অত্যাধুনিক ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণে সড়ক ও জনপদ বিভাগের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর মাধ্যমে দুর্যোগ কবলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান।
- সুষ্ঠু বর্জ ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক ও কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- টেকসই নগরায়ণ ও পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।

সুতরাং পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিতকরণে ইসলামি নির্দেশনা বাস্তবায়ন অনস্বীকার্য। টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত হলে নগরে বসবাসরত নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, ধনী-গরিবসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ একটি দূষণমুক্ত, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং স্বচ্ছ সবুজ-শ্যামল সমাজে বসবাসের সুযোগ পাবে।

---

৬৫ আল কুরআন, সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭।
৬৬ আল কুরআন, সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপঃ একটি পর্যালোচনা

মোহাঃ রিদওয়ান উল্লাহ*

গঠনমূলক সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি জাতির মন-মনন, জীবনাচার ও ঐতিহ্যের দর্পণ স্বরূপ। মানবতাবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি মৃতপ্রায় জাতিকে পত্রপল্লবে সুশোভিত করে তোলে, পদানত জাতিকে স্বাধীনতার অমিয় সুধা পানে উদ্বুদ্ধ করে, মাজলুম জনতাকে সিংহের মতো গর্জে উঠে জালিমের মসনদ ভেঙ্গে চুরমার করতে শেখায়। রাজনীতির কবি, মাজলুমের আশ্রয়স্থল, নির্যাতিত মানবতার পরম বন্ধু, বাঙ্গালীর মুক্তির কাণ্ডারী, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একটি নাম, একটি প্রতিষ্ঠান, একটি স্বপ্ন, একটি ইতিহাস। বিদেশী লেখক রঞ্জন বলেন, 'দেশে দেশে তো অনেকেই জন্মান। কেউ ইতিহাসের একটি পঙক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস। শেখ মুজিব এই সমগ্র ইতিহাস'[১]। এই মানবতাবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় বেড়ে উঠা মুজিবই বাঙালীর মুখে হাসি ফুটিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে অতুলনীয় ও অনস্বীকার্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্যারিশমাটিক নেতৃত্বে আবির্ভূত হন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Stanley Wolpert বঙ্গবন্ধুকে বলেছেন- the nation-savior hero of Bangladesh- বাংলাদেশের জাতি রক্ষা বীর[২]। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সেরা যুগে আগমন ঘটেছিল বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা) এর। বলা হয়, সেই সময়ের আরবী কাসীদাগুলো হোমারের 'ইলিয়াড', 'ওডেসী'কেও হার মানায়। সেই সেরা যুগকে চ্যালেঞ্জকারী ঐশী বাণী নাযিল হয়েছে তাঁর উপর। যা সাহিত্য মানে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসূল (সা) সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় শুধু উৎসাহই দেননি, তিনি পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। গভীর আগ্রহের সাথে আবৃত্তি শুনেছেন। প্রখ্যাত মহিলা কবি খানসা (রা)-এর কবিতা তিনি খুব পছন্দ করতেন। বিভিন্ন কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর প্রাজ্ঞচিত বিশ্লেষণী মন্তব্য সাহিত্য সমালোচনায় আদর্শ মাপকাঠি। কবি হাসসান বিন সাবিতকে শায়িরুর রাসূল (شاعر الرسول) খেতাব প্রদান ও মসজিদে নববীতে তাঁর জন্য উঁচু মিম্বর তৈরীর মাধ্যমে বিশ্বাসী ও মানবতাবাদী কবি-সাহিত্যিকদের সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। হাস্‌সান বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কা'ব বিন মালেক, ইসলাম গ্রহণের পর কা'ব বিন যুহাইর, কুররা বিন হাবীবাহ ছিলেন একেকজন তেজোময় সিংহশাবক। সুতরাং রাসূলুল্লাহ'র যুগ ছিলো সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি। সমাজের অন্যায় অসঙ্গতিগুলো দূর করে সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিলো যার লক্ষ্য। মানবপ্রেমী শেখ মুজিবেরও

---

* এম. ফিল গবেষক, শিক্ষাবর্ষ:২০১৪-২০১৫, রেজিঃ নং: ৯০, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১ মিজান রহমান (সম্পাদনা), *বঙ্গবন্ধু* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৩৬৫

২ Stanley A Wolpert, *Jinnah of Pakistan*, London: Oxford University Press, 2005, p. 442

প্রতিটি কর্মের ভিত্তি ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। বিখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমান যথার্থই বলতেন, 'বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসে দু'জন মাত্র প্রতিভাবান বাঙালী জন্ম গ্রহণ করেছেন। একজন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, অপর জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবিুর রহমান'[৩]। দু'জনের একটি দিক যথার্থই মিল রয়েছে। দু'জনই দেশপ্রেমের মানদণ্ডে বিদ্রোহী ভূমিকায় সর্বদা অবতীর্ণ ছিলেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বিদ্রোহী হয়ে 'বিদ্রোহী কবি'র খেতাব পান। আর বঙ্গবন্ধুর অন্যায়ের বিরোধিতাও একটি শিল্পে পরিণত হয়। তিনি এই অসাধারণ শিল্পের প্রবর্তনের জন্য 'নিউজ উইক' কর্তৃক উপাধি পান 'রাজনীতির কবি'। 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' এমন রাজনীতি ছিলোনা বঙ্গবন্ধুর। জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনে খাঁটি হয়ে তিনি মঞ্জিলে পৌঁছেন। তাঁর কর্মে কোনো ফাঁক ছিলোনা। ছিলোনা কোনো শর্টকাট সিস্টেম। শতভাগ একনিষ্ঠতাই তাঁর সফলতার মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন- 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা/ গৌরী মেঘনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবুর রহমান। দিকে দিকে আজ রক্ত গঙ্গা/ অশ্রু গঙ্গা বহমান, তবু নাহি ভয় হবে হবে জয়/ জয় মুজিবুর রহমান।'

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবির্ভাব : ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনি সুদূর ইরাক থেকে ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে[৪] বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত প্রখ্যাত দরবেশ হযরত বায়েজিদ বুস্তামীর অন্যতম সহযাত্রী শেখ আউয়ালের বংশধর। শেখ আউয়ালের উত্তরসূরী ৭ম পুরুষ[৫] শেখ লুৎফুর রহমান ও মোসাম্মৎ সায়রা বেগমের কোল আলোকিত করে ২০শে চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ মুতাবিক ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই মার্চ রোজ মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায়[৬] ধূলির ধরায় তাঁর আগমন। এই ছোট্ট 'খোকা'ই কালের আবর্তনে গ্রামের জনসাধারণের 'মিয়াভাই', সহপাঠী ও কর্মীদের 'মুজিব ভাই', বাঙ্গালীর 'বঙ্গবন্ধু', বাংলাদেশের 'জাতির পিতা'[৭] এবং বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের 'মুক্তির দিশারী' হয়ে আবির্ভূত হন। বাবা শেখ লুৎফুর রহমান ছিলেন গোপালগঞ্জ সিভিল কোর্টের সেরেস্তাদার। পিতা-মাতার ৪ কন্যা ও ২ ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন ৩য় সন্তান। গোপালগঞ্জেই তাঁর শৈশব-কৈশোর কাটে।

শিক্ষা জীবন : পরিবারেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন[৮]। ১৯৪৪ সালে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই. এ এবং ৪৭ সালে বি. এ পাশ

---

৩ ড. মোঃ রহিম উল্যাহ, শহীদ বঙ্গবন্ধু ও মুসলিম বিশ্ব, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন ত্রৈমাসিক পত্রিকা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৩৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ-১৯৯৯, পৃ.৯৫

৪ ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ. ১১৩

৫ অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মমদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১৩), পৃ. ৪

৬ শেখ হাসিনা, (সম্পা. পার্থ ঘোষ), *শেখ মুজিব আমার পিতা* (কলকাতা: ১৯৯৯), পৃ. ২৮

৭ বদিউজ্জামান চৌধুরী, *খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু* (ঢাকা: কথামালা প্রকাশন, ২য় মুদ্রণ ২০১৬), পৃ. ৩৫

৮ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৩য় মুদ্রণ, ২০১৭), পৃ. ৮-১০

করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিকে সমর্থন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔদাসিন্যের বিরোধিতা করার কারণে তাঁকে ৪৯ সালের শুরুর দিকে বরখাস্ত করা হয়[৯]।

বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন : ১০ বছর বয়সী শেখ মুজিবের সাথে ৩ বছর বয়সী বেগম ফজিলাতুন্নেছার বিবাহ হলেও ১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়[১০]। তিনি ৩ ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এবং ২ মেয়ে ৪ বারের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার গর্বিত পিতা। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, গৃহবধু সুলতানা কামাল, রোজী জামাল এবং ছোট্ট ছেলে শেখ রাসেল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডে শহীদ হন[১১]।

রাজনৈতিক জীবন

কৈশোর থেকেই তিনি সমাজ সচেতন হয়ে উঠেন। কৈশোরে গোপালগঞ্জের অবহেলিত মিশন স্কুলের দূরাবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গোপালগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শনে আসা তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পেয়ে প্রতিবাদ করার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু[১২]।

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর রাজনীতিতে আরো সক্রিয় হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে তিনি মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

আসলে ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বাঙালীর অধিকার রক্ষার প্রতিটি আন্দোলনে তিনি মুক্তির দিশারী হয়ে কাজ করেছেন। অবশেষে তাঁর সফল নেতৃত্বে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাঙালী পেল স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দেশের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট দূর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের একদল বিপদগামী সামরিক ও বেসামরিক নরপিশাচের হাতে এই দিক বিজয়ী মহান নেতা শাহাদাত বরণ করেন। তিনি মাত্র ৫৫ বছর জীবনের ৩৭ বছরই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তন্মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব ৩৩ বছরের ৪০% কাটিয়েছেন জেলে আর ৪৮% গণমানুষের সাথে[১৩]। পাকিস্তানের ২৪ বছরে ২ বার মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া, ১৮ দফায় মোট ১২ বছরই[১৪] জালিমশাহীর কারান্তরালে অবরুদ্ধ থাকা বঙ্গবন্ধুর অপ্রতিরোধ্য, অন্যায় বিধ্বংসী, তেজোদীপ্ত, অনুকরণীয় ও সফল নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।

---

৯ হারুন অর রশীদ, *বাংলাপিডিয়া* (সম্পাঃ সিরাজুল ইসলাম) (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২য় সংস্করণ ২০১১), খণ্ড ১২, পৃ. ২২

১০ মোঃ আশিকুর রহমান, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান* (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫), পৃ. ১৮

১১ শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (ঢাকাঃ ভূমিকা, ২০১০), পৃ. ১৪-১৬

১২ র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও কর্ম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০১৪), পৃ. ৭

১৩ আবুল বারাকাত, *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ* (ঢাকাঃ মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫), পৃ. ১৫৩

১৪ র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বঙ্গবন্ধু

বক্তৃতা, ভাষণ, কবিতার ছন্দ কিংবা গদ্যের আকৃতি ধারণ করে হৃদয় মনের ভাষাগত রূপায়ণকেই বলে সাহিত্য। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেন, হৃদয়-মনের ভাষাগত রূপায়ণকেই বলা হয় সাহিত্য। আবেগ ও চেতনাকে সুন্দর চিত্তাকর্ষক শব্দের বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত কথাই সাহিত্য[১৫]। অন্যভাষায়, হৃদয় মনের অনুভূতিগুলো শব্দের চাকচিক্যময় পোশাক পরে ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে আমাদের সামনে যে শরীরী রূপ ধারণ করে তাই সাহিত্য। সেই শরীরী রূপ হতে পারে বক্তৃতা, ভাষণ, কবিতা কিংবা গদ্য রচনা[১৬]। আব্দুল মান্নান তালিব বলেন, হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য। আমাদের হৃদস্পন্দনের যে প্রতিধ্বনি শব্দের মনোরম পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয় তাই সাহিত্য। ইসলাম যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যে সাহিত্য সেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো পত্র-পল্লবে-শাখা-প্রশাখায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটিই ইসলামী সাহিত্য[১৭]। এক কথায়, একত্ববাদের রঙে সজ্জিত, মানবতাবাদী, বৈরাগ্য বিবর্জিত, ইহ-পরকালীন কল্যাণ সমন্বিত রচিত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য।

সংস্কৃত শব্দ 'সংস্কৃতি' ইংরেজী Culture শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ১৯২২ সাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে[১৮]। আরবীতে বলে, সাক্বাফাহ। অক্সফোর্ড ডিকশনারির ভাষ্য মতে, ১৮০৫ সাল পর্যন্ত Culture শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না[১৯]। বিশেষজ্ঞরা এর অনেকগুলো অর্থ উল্লেখ করেছেন[২০]। মোট কথা, সংশোধন করণ, পরিশুদ্ধিকরণ, সুসভ্য করা কিংবা উন্নত বা উত্তম মানের চরিত্র।

অধ্যাপক Murray এর মতে, সভ্যতা বলতে একটি জাতির উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বুঝায়, যাতে রাষ্ট্র-সরকার, নাগরিক অধিকার, ধর্মমত, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন বিধান এবং সুসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে। আর সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতারই মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার[২১]। বদরুদ্দিন উমর বলেন, কোনো স্থানের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি[২২]। রাগেব আলী বৈরুতী বলেন, 'সাক্বাফাহ মানে মানসিকতার সঠিক ও পূর্ণ সংশোধন এমনভাবে যে,

---

১৫ মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ১৬৪

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

১৭ আব্দুল মান্নান তালিব, *ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান* (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ১৪-২০

১৮ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *একুশে ফেব্রুয়ারী সকল ভাষার কথা কয়* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৭), পৃ. ২৬

১৯ মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

২০ যেমন; সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, মার্জিত রুচি, Culture যা ল্যাটিন Calture থেকে উদ্ভূত তথা কৃষিকার্য, চাষাবাদ, সংশোধন, সোজা করা, সুসভ্য করা ইত্যাদি।

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

২২ বদরুদ্দিন উমর, *সংস্কৃতির সংকট* (ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৮৪), পৃ. ২৭

সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা ও অধিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে'[২৩]। টি. এস. ইলিয়ট বলেন, 'এক বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবনধারা ও পদ্ধতি'[২৪]। মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন, 'আমরা যা ভাবি, চিন্তা করি, বিশ্বাস করি তা-ই সংস্কৃতি[২৫]। তিনি টি. এস. ইলিয়ট ও এ. জেড. সিদ্দীকির প্রদত্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে বলেন, প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে, 'চিন্তা ও মতাদর্শের পরিশুদ্ধি, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক সংযোজন, যার কারণে মানুষের বাস্তব জীবন সর্বোত্তম ভিত্তিতে গড়ে উঠতে ও পরিচালিত হতে পারে'[২৬]।

সুতরাং তাওহীদ ভিত্তিক জীবন উপভোগ ও পরিচালনার পরিমার্জিত সার্বজনীন রীতিই হচ্ছে সংস্কৃতি এবং উহাই ইসলামী সংস্কৃতি। একত্ববাদ, মানবকল্যাণ, রুচি ও বিবেক বিবর্জিত রীতিই অপসংস্কৃতি কিংবা অনৈসলামিক সংস্কৃতি।

সাহিত্য একটি জাতির জন্য দর্পণস্বরূপ। সাহিত্যই সেই জাতির রুচিবোধ, জীবনাচার, বিবেকের উৎকর্ষতা, সভ্যতা-সংস্কৃতির মান নির্ণায়ক। এ সাহিত্যের গুরুত্বই হচ্ছে 'ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় বর্জন'। আদর্শহীন জনগণকে আদর্শবাদী বানানো, অজ্ঞ-মূর্খ লোকদেরকে প্রয়োজনীয় নির্ভুল জ্ঞান পরিবেশন এবং সাহস ও হিম্মতহীন মানুষকে সাহসী ও নির্ভীক করে গড়ে তোলা সাহিত্যেরই কাজ। আদর্শ ও লক্ষ্যাভিসারী সাহিত্যিক ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্দান্ত শিকারী বাজপাখীর মত। হতাশা ও নৈরাশ্যকে গলা টিপে হত্যা করার এবং দুঃখ-শোক, অন্যায়-অকল্যাণ, ফিতনা-ফাসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর হয়ে প্রতিকূল পরিবেশের প্রাচীর ভেঙ্গে নতুন দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য সে মানুষকে আহবান জানাতে থাকে[২৭]। বিশ্বাস, সৎকর্ম ও একস্রষ্টার আনুগত্যের পাশাপাশি সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার অবস্থান ইসলামী সাহিত্যের মূলনীতি।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

والشعراء يتبعهم الغاون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا الخ

'আর (ভোগবাদী) কবিরা! গোমরাহ ব্যক্তিরাই তাদের অনুসরণ করে; তুমি কি দেখতে পাও না, ওরা প্রতিটি ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়, এরা এমন কথা বলে যা তারা নিজেরাও করে না, তবে যারা (আল্লাহ্‌র উপর) ঈমান আনে, নেক কাজ করে এবং বেশী করে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করে, তাদের কথা আলাদা। তাদের উপর যুলুম করার পরই কেবল তারা (আত্মরক্ষামূলক) প্রতিশোধ গ্রহণ করে'[২৮]। বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণগুলিতে উক্ত প্রতিটি উপাদান নিখুঁতভাবে পরিলক্ষিত হয়।

---

২৩ মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

২৪ T. S. Eliot, *Notes towards the definition of culture* (London: Faber & faber limited, 1948), p. 13

২৫ মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৮ সূরা আশ শোয়ারা: ২২৪-২২৭

সে সাহিত্যই স্বার্থক, যা পাঠক ও শ্রোতাকে চমৎকারভাবে কল্যাণের দিকে আলোড়িত ও আকৃষ্ট করতে পারে। এদিক থেকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন সফল ও স্বার্থক সাহিত্যিক। তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ চয়ন এতো শ্রুতিমধুর, আবেদনময়ী এবং প্রভাব বিস্তারকারী যে,

- আন্দোলন সংগ্রামে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের একেকটি শব্দ শত্রুর জন্য একেকটি আতঙ্ক।

- শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ যেমন কর্মীদের নিকট শ্রুতিমধুর ও হৃদয় জুড়ানো ছিলো তেমনি শত্রুর বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার সুতীব্র সাহস জাগানিয়া যাদুর মন্ত্র ছিলো। বক্তৃতার শব্দে যেনো নজরুলের বিদ্রোহী শব্দের উত্তাল ঢেউয়ের বিধ্বংসী স্রোত।

- সেক্টর ভিত্তিক প্রদত্ত ভাষণ ছিলো সেই সেক্টরের জন্য পথপ্রদর্শক, সেই সেক্টরের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশক।

এ মহান নেতার সাহিত্যিক মর্যাদা বাঙালীজাতি অত্যন্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো বলেই তারা নির্দ্বিধায় শুধু তার বক্তব্যের কয়েকটি শব্দের উচ্চারণেই জালিমের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ৭১ সনে। UNESCO সেটা অনেক পরেই উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হয়। অবশেষে UNESCO তাঁর বক্তব্যের বৈপ্লবিক প্রভাব ও গুরুত্ব উপলবদ্ধি করে ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রা'রে অন্তর্ভুক্ত করে 'ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারী হেরিটেইজ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সাহিত্যিক হচ্ছে সমাজের চিন্তা ও মননের প্রতিনিধিত্বকারী। বঙ্গবন্ধুর ভাষণসমূহ সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম মননের স্বার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছে। যা যে কোনো সচেতন নাগরিকের দৃষ্টিগোচর হয়। একজন সফল সাহিত্যিক কাল-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন না। বরং তিনি স্রোতের গতি পরিবর্তন করে সত্য প্রতিষ্ঠায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ

ইসলামী সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা

বঙ্গবন্ধুর সাহিত্য প্রেম ছিলো আকাশচুম্বি। 'কারাগারের রোজনামচা', 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'নয়াচীন', ভাষণ-বক্তৃতা আর লিখিত চিঠিপত্রে তাঁর সাহিত্যিক সত্তা নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নিয়মিত খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাতসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজই তিনি পড়তেন[২৯]। কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায়ও তিনি পত্রিকা পড়তেন। বইই ছিলো তার কারান্তরীণ সময় কাটানোর প্রিয় বন্ধু। কারাগারে তিনি আল কোরআনের তরজমা ও ইংরেজী অনুবাদ পড়তেন[৩০]। তিনি কিছু সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত এত্তেহাদ পত্রিকার পূর্ব পাকিস্তানের

---

২৯ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

প্রতিনিধির দায়িত্বও পালন করেছেন[৩১]। নতুন দিন, ইত্তেহাদ, ইত্তেফাক, মিল্লাতসহ কয়েকটি পত্রিকার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৯৪৭ সাল থেকেই মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন চলছিল। মাত্র ২৭ বছরের যুবক শেখ মুজিব নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বহু ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও প্রাচ্যের অন্যতম সেরা ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, শামসুল আলম, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, শাহেদ আলী, কবি ম. আ. ন. শহীদুল্লাহ সাহিত্যরত্ন ও শওকত আলীর মত ভাষা সৈনিকদের সাথে এক সাথে কাজ করেন।

১৯৫৪ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ফ্ল্যাটফর্মের অন্যতম সাহসী নেতৃত্বের নাম বঙ্গবন্ধু। সেই যুক্তফ্রন্টেরই ২১ দফার অন্যতম ছিলো 'বর্ধমান হাউজে' 'বাংলা একাডেমি' স্থাপন।

১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার একটি অনুষ্ঠানে বলেন, 'শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে-কোনো অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবে'[৩২]। ৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমী আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন, 'এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য রচনা করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।'[৩৩]

সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো অনন্য। তাঁর বিয়োগের পরও কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁকে নিয়ে রেকর্ড সংখ্যক সাহিত্য রচনা করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে ৫টির বেশি উপন্যাস, ৫০টির বেশী গল্প, ১৩ শতাধিক বই দেশী-বিদেশী কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা, ইংরেজি, চীনা, জাপানিজ, ইতালি জার্মানি, সুইডিশ ও আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় রচনা করেছেন[৩৪]।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব কবিই তাঁকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন- কবীর চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর, শামসুর রহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান, আবুল হোসেন, রোকনুজ্জামান খান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, কায়সুল হক, বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আসাদ চৌধুরী, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, রুবী রহমান, মাহবুব সাদিক প্রমুখ। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, পৃথিবীর আর কোনো নেতার উপর এতো বই প্রকাশ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই[৩৫]। বিশ্ববিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আল্লামা ইকবালকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন[৩৬]। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রণী বাঙ্গালী কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও

---

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৩২ আতিউর রহমান, *বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বঙ্গবন্ধু*, শোকাশ্রু (বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদ, ২০১৫), পৃ.৩০

৩৩ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬.০২.৭১

৩৪ ড. মিল্টন বিশ্বাস, সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু, *বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র*, ঢাকা, ২১.০৮.২০১৪ ইং

৩৫ পার্থ সারথি দাস, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত বই, *কালের কণ্ঠ*, ১০.০২.২০১৮ ইং

৩৬ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

দার্শনিক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ২৪ মে, ১৯৭২ খ্রিঃ কোলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন[৩৭]।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয় এবং জাতীয় কবির আখ্যা দেয়া হয়। সরকারি কোয়াটার দেয়া হয়। ভরণপোষণের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। নজরুলের অনেক কবিতা বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ও হৃদয়ে গাঁথা ছিলো। একবার সোহরাওয়ার্দীসহ কয়েকজন এডভোকেটের সঙ্গে একই গাড়িতে করাচি ভ্রমণ কালে তিনি তাদের নজরুলের 'কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু', 'নারী', 'সাম্য', আরও কয়েকটি কবিতার কিছু অংশ শুনান[৩৮]। কারাগারে বসে শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাস সম্পর্কে লিখেন-'বন্ধু শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' বইটি পড়তে শুরু করেছি। লাগছে ভালই...'।

১৯৬৯ সালে ইতালী প্রবাসী কন্যা শেখ হাসিনাকে লিখিত চিঠিতে বাংলাদেশের প্রখ্যাত দু'জন মুসলিম সাহিত্যিক দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক, লেখক-সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও ভাষা বিজ্ঞানী সাহিত্যিক প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল হাই'র বিয়োগে তাঁর হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কথা প্রকাশ করে লিখেন, 'বাংলাদেশের দুইজন কৃতি সন্তান আমরা হারালাম'।

পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে থাকায় তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর লেখায় এসেছে শাহেদ শোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মুজিবুর রহমান খাঁ, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রীস, মাহমুদ নূরুল হুদা, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কামরুদ্দিন আহমদ, মুনীর চৌধুরী ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, হুমায়ূন কাদির, আবুল হাসান প্রমুখের কথা[৩৯]।

১৯৭৫ সালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ছোটগল্প লেখক, শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক কবি আল মাহমুদকে তিনি শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহকারি পরিচালক পদে নিয়োগ দেন। পরে তিনি পরিচালক হন। চিনে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান কালে রুশ লেখক অ্যাসিমভ ও তুরস্কের বিখ্যাত কবি নাজিম হিকমতের সাথে একান্ত আলাপে মিলিত হন[৪০]।

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকদের সাথে গভীর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যানুরাগের বহিঃপ্রকাশ। মুসলিম গায়কদের পথিকৃত শিল্পী আব্বাস উদ্দিন, সোহরাব হোসেন ও বেদার উদ্দিনের গান তিনি খুবই পছন্দ করতেন। আব্বাস উদ্দিনের গান ছিলো বাংলার জনগণের প্রাণের গান। বাংলার মাটির সাথে ছিলো তাঁর নাড়ির বন্ধন[৪১]।

শামছুজ্জামান খান বলেন, 'মুজিবের লোকশিল্পীদের সাথে হৃদ্যতা-পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্কটি ছিলো পরিমাণে ও গভীরতায় বিশাল। সিলেটের করিমশাহ, কুষ্টিয়ার মহিনশাহ, বরিশাল ও

---

৩৭ বদিউজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৩৮ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
৩৯ অন্য আলো, *প্রথমআলো*, বঙ্গবন্ধুর বয়ানে সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ১০.০৮.২০১৮ ইং
৪০ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯
৪১ প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

ঢাকার আব্দুল লতিফ, কুড়িগ্রামের কচিম উদ্দিন, চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের রকিবুদ্দিন কুতুবুল আলমসহ কত লোকশিল্পীর সঙ্গে ছিলো তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক[৪২]।

বীর মুক্তিযুদ্ধা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি সৈয়দ আলী আহসানকে বঙ্গবন্ধু খুব ভালোবাসতেন[৪৩]।

পল্লী কবি জসিম উদ্দিন ৬৯-এ টিভি সংবাদে বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রচার না করায় বাংলা একাডেমির এক সভায় বলেন, 'আজগুবি পুথি পাঠের মতো মিথ্যা সংবাদ আর অপসংস্কৃতি প্রচার করে টেলিভিশন বাক্স। আমাদের কথা বলেনা। প্রচার নিষিদ্ধ করে রেখেছে বাংলার নয়নের মনি মুজিবের বাণী। মনচায় লাথ্থি মাইরা ভাইংগা ফালাই শয়তানের ঐ বাক্স'[৪৪]। পাকিস্তানের পাঞ্জাবী কবি আহমদ সালিম তাঁর 'বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক' এবং সোনার বাংলা শিরোনামের কবিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করায় জেলে যান। জেলে বসেই 'সিরাজউদ্দৌলাহ' শিরোনামে কবিতা লিখে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করেন। ভারতের উর্দু কবি কাইফি আজমি 'বাংলাদেশ' শিরোনামের কবিতায় বঙ্গবন্ধুর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন। ইউরোপের এক কবি তাঁর কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে 'টাইগার অব বেঙ্গল' আখ্যায়িত করেন[৪৫]। সাহিত্যিক শওকত ওসমান তাঁর বক্তব্যে বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র দু'জন তথা কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রতিভাবান বাঙালী হিসেবে চিহ্নিতকরণ, বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ বহন করে।

কবি শামসুর রাহমান বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের মতো জনপ্রিয় নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই অসামান্য জনপ্রিয়তা এমনিতেই আমলকির মতো এসে যায়নি তাঁর হাতের তালুতে। যদি আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো কী করে তিনি নিজেকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে গেছেন। এসব কিছুর পেছনেই ছিলো ঐকান্তিক দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা।[৪৬]

ইসলামী সাহিত্যের মূলনীতি সংরক্ষণ

কুরআন এবং হাদিস হচ্ছে ইসলামী সাহিত্যের মূল ভিত্তি। এই মূলনীতির মৌলিক উপাদানে ভরপুর বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য-বিবৃতি। ঘুণে ধরা সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই ছিলো এই মহান নেতার মূল ব্রত। ১৯৭৩ সালের ৩০ মার্চ ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি একজন মুসলমান। আমার রক্তে ইসলামের তরঙ্গ, আমি ইসলামী উম্মাহ্র কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব দেব'[৪৭]। ১৯৭৪ সালে

---

৪২ শামছুজ্জামান খান, (সম্পাঃ ডাঃ শাহাদাত হোসেন), *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ২৯৩

৪৩ সৈয়দ আলী আহসান, (সম্পাঃ আনু মাহমুদ), *বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় জাতির কলঙ্ক মোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬

৪৪ শামছুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

৪৫ খোরশেদ মুকুল, বিদেশী সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু, *দৈনিক অধিকার*, ১৫.০৮.২০১৮ ইং

৪৬ মিজান রহমান (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

৪৭ এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০), পৃ.১৬৭

বায়তুল মোকাররাম মসজিদে মুসুল্লিদের উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি বলেন, 'আপনাদের আমি কথা দিচ্ছি আগামি দুই বছরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমি শিক্ষার সর্বস্তরে কুরআর-হাদিসের আলোকে প্রকৃত ইসলামকে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবো'[৪৮]। একজন কবি রাসূল (সা) কে নিয়ে কটূক্তি করলে তিনি তাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন[৪৯]।

সুখ্যাত ইসলামী সাহিত্য পত্রিকার অফিস উদ্ধার

'মাসিক মদীনা' নামে স্বাধীনতাপূর্ব একটি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা মহিউদ্দিন খান ছিলেন প্রকাশক। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ইসলামী সাহিত্য বিকাশে পত্রিকাটির অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি স্বাধীনতার পর কিছু ভূগ্রাসী তা জবরদখল করে নেয়। মাওলানা মহিউদ্দিন খান বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলে পরের দিনই তিনি তা ফিরে পান[৫০]।

মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় পত্রিকা প্রকাশ

মুসলিম স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ভারত পাকিস্তান বিভাগের প্রশ্নে বাঙালী সাধারণ মানুষের কথাগুলো নিরপেক্ষভাবে জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো কাগজ ছিলোনা। বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসিম সাহেব ও কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসসহ বঙ্গবন্ধু কর্মীদেরকে নিয়ে 'মিল্লাত' পত্রিকা প্রকাশে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি এর প্রচার-প্রসারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন[৫১]।

মুসলিম সাহিত্যিক সম্মেলন

১৯৪১ সালের দিকে ফরিদপুর জেলার ছাত্রলীগের উদ্যোগে শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির, ইব্রাহীম খাঁ উপস্থিত হন উক্ত কনফারেন্সে। ১৪৪ ধারা জারি করে কনফারেন্স করতে না দিলে হুমায়ূন কবির সাহেবের বাড়িতে কনফারেন্স হয়। সেখানে কাজী নজরুল ইসলাম গান পরিবেশন করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা বললাম, এই কনফারেন্সে রাজনৈতিক আলাপ হবে না, শিক্ষা ও ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হবে[৫২]।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু এবং সকল ভাষা সৈনিকরা যে সফল আন্দোলন করেছিলেন তার ফল যেনো উত্তরোত্তর টিকে থাকে সেই লক্ষ্যেই বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে মাতৃ ভাষা চর্চা ও এর মান সমুন্নত রাখতে

---

৪৮ আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *বঙ্গবন্ধু ও ইসলাম*, কামরুজ্জামান লিটন (সম্পা.) (ঢাকা: বঙ্গবন্ধু রূপপ্রকাশক, ১৯৯৭), পৃ. ১১৮

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

৫০ আহমদ সেলিম রেজা, *বঙ্গবন্ধুর ইসলামপ্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিল (ঢাকা: সুচয়নী প্রকাশন, ১৯৯৬), পৃ. ২৫৫

৫১ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬

বাংলা একাডেমি কর্তৃক '১ম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন' এর আয়োজন করা হয় ১৯৭৪ সালের ১৪-২৭ শে ফেব্রুয়ারী।

এতে যোগদেন বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার সাহিত্যিক। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙেরী, জিডিআর, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। ফলে এটি পরিণত হয় একটি 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন'। যার প্রধান অতিথি ছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। ১৪ ই ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩টায় সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষণা করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্যের চুম্বক অংশ ছিলো- 'সাহিত্য ও শিল্পের উৎস জনগণ'। তাই তিনি উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও বঙ্গবন্ধু

আল কোরআনের মূল বিষয়বস্তু মানুষ। আর রাসূল (সা)-এর দাওয়াতের টার্গেট ছিলো মানুষ। আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি বক্তব্য কিংবা কর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দুও ছিলো 'মানুষ/জনগণ'। প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি ঘোষণাই করে দিয়েছেন যে, 'জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিছিন্ন হয়ে কোনো দিন কোন মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্প কর্ম সৃষ্টি হতে পাওে না। আমি সারা জীবন জনগণকে সাথে নিয়েই সংগ্রাম করেছি, এখনও করছি; ভবিষ্যতেও যা কিছু করবো জনগণকে নিয়েই করব'।

মানবতার কল্যাণবাহী সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য। সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ভিত্তিই ছিলো মানবতার কল্যাণ নির্ভর। জনগণের কল্যাণসাধন কল্পে শুধু উচ্চ শ্রেণীর নয় বরং সকল শ্রেণীর মানুষকে উপজীব্য করে, চিন্তা ও চেতনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে নবতর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সোনার মানুষ তৈরীর মধ্য দিয়ে স্বপ্নের সোনার বাঙলা গড়াই ছিলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এই মহান লক্ষ্য অর্জনে সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি সেবীদেরকে উদাত্ত আহবান জানিয়ে তাদেরকে তিনি মানবতার সুদক্ষ প্রকৌশলী বলে আখ্যায়িত করেন[৫৩]।

ইসলামী সাহিত্যের বাহন 'মাতৃভাষা' রক্ষার আন্দোলনে সুদৃঢ় নেতৃত্ব

ইসলাম মানবতাবাদী জ্ঞান অর্জনে মাতৃভাষার গুরুত্ব দিয়েছে অপরিসীম। কারণ মাতৃভাষাকে মাধ্যম করে সহজেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। আল্লাহ তা'য়ালাও সবকিছু সহজভাবে উপস্থাপনের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

অর্থাৎ- আমি এ কোরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে সহজ করেছি, কিন্তু কেউ আছে কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?[৫৪] হযরত আনাস (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا অর্থাৎ- 'তোমরা সহজ করো কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও তাড়িয়ে দিওনা'[৫৫]। আর ইসলামী মূল্যবোধ প্রসারে সাহিত্যের বিকল্প নেই। এই

---

৫৩ মোতাহের হোসেন সুফী, *ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক* (ঢাকা: অনন্যা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৬), পৃ: ৪২৪

৫৪ সূরা আল ক্বামার: ৪০

৫৫ সহীহ আল বোখারী, হাদীস নং: ৬৮

সাহিত্যের বাহন হচ্ছে ভাষা। সাহিত্য পারে মূল্যবোধের ম্যাসেজ সহজে মানব দোরে পৌঁছে দিতে। সাহিত্যের এই বাহন রক্ষায় বাঙ্গালী এই মহান নেতার বক্তৃতা, আন্দোলন-সংগ্রাম-যুদ্ধ অমূল্য।

১১ই মার্চ, ১৯৪৮ সালে ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। গণপরিষদে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে তিনি লড়াই করেন। ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯৩ তম অধিবেশনে পৃথিবীর মানব জাতির সম্মুখে গর্বের মাতৃভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় রূপ দান করেন। সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালতসহ সবধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার প্রচলন বাধ্যতামূলক করেন[৫৬]। বাংলা একাডেমিতে সাঁটলিপি, মুদ্রাক্ষর ও নথি লেখার প্রশিক্ষণ নেবার ধুম পড়ে গিয়েছিল। ১৩৮২ বঙ্গাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র প্রধানকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা (গুণ টানা) কার্ড পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানান[৫৭]। ইসলামী সাহিত্য রক্ষায় তাঁর এই ত্যাগ অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে। যুগে যুগে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন স্বগোত্রের ভাষায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ

'আমি কোন নবীই এমন পাঠাইনি, যে তাঁর জাতির (মাতৃ) ভাষায় আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছায়নি, যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াত) স্পষ্ট করে দিতে পারে[৫৮]।

অথচ ইসলাম রক্ষার ঠিকাদার পাকিস্তান সেই বাণী অবজ্ঞা করে বাংলা ভাষীদের উপর জোরপূর্বক অন্য ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। অথচ রাসূল (সা) তাঁর প্রশিক্ষক সাহাবীকে প্রেরিত অঞ্চলের ভাষা শিখার তাগিদ দিয়েছেন। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে তিনি ইয়াহুদীদের ভাষা শিখতে আদেশ করলে তিনি তা ১৫ দিনে শিখে ফেলেন[৫৯]। বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয় ৪০০ বা ৪০০০ দিরহাম। আর সামর্থ্যহীনদের মধ্যে যারা অক্ষর জ্ঞানের অধিকারী ছিলো তাদের জন্য আনসার সন্তানদেরকে অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেয়াকে রাসূল (সা) মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারণ করে দেন[৬০]।

মানবাধিকার রক্ষায় যুদ্ধে অবতীর্ণ

অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে জান মাল বিলিয়ে দিয়ে অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন লৌহমানব, মানবপ্রেমী, সত্যের সৈনিক, মানবাধিকার রক্ষার

---

৫৬ ভবেশ রায়, *হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ শত বাঙালী মনীষীর কথা* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ: ৪৩৭

৫৭ শামছুজ্জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

৫৮ সূরা ইবরাহীম: 8

৫৯ عن زيد بن ثابت رض قال أمرني رسول الله ص أن اتعلم له كلمات من كتاب يهود قال إني والله ما آمن يهود على كتابي قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم (رواه الترمذي، رقم: 2715)

৬০ روى الأمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال " كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة"

সিপাহ-সালার, বাংলার শার্দুল বঙ্গবন্ধু। তিনি ৬ দফার মাধ্যমে আপামর লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির, শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার, ধর্মীয় সহাবস্থানের নিশ্চয়তার, আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি ও আত্মমর্যাদার সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠার সনদ ঘোষণা করেন[৬১]। তিনি ৭ কোটি মানবের মুক্তির লক্ষে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কবির ভাষায়-'শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে/ রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে/ অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন/ তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল/হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার/ সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী/ গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শুনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি/ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ.

অর্থাৎ- 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল, তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো, কেননা তাদের ওপর সত্যিই যুলুম করা হয়েছিল; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা এ (মাজলুম)-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম'[৬২]। মজলুমের আর্তনাদে আকাশ বাতাস হাহাকার করছিল। এহেন অসহায় মুহূর্তে জনতার পাশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার তুলেন মহান নেতা। যেন পবিত্র কুরআনের সেই বাণীর সাড়া দিয়েছেন তিনি। আল্লাহ বলেন,

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

'তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও (দুস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করো না, যারা এই বলে ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, যালেমের এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও, অতঃপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও'[৬৩]।

ইসলামী সাহিত্য চর্চায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ইসলাম মানব জাতির কল্যাণ ও সফলতার চাবিকাঠি। তাই ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পর্যন্ত ইসলামের দিকনির্দেশনা মানুষের সামনে স্পষ্ট থাকা অতীব জরুরী। ইসলামের সার্বিক দর্শনকে সহজ করে উপস্থাপনের জন্য গবেষণা ও উহা দেশের সিংহভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচার প্রসারের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে

৬১ ডাঃ শাহাদাত হোসেন (সম্পা.), *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩
৬২ সূরা আল হাজ্জ: ৩৯
৬৩ সূরা আন্ নেসা: ৭৫

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ[৬৪] এক অধ্যাদেশ জারি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মীয় গ্রন্থ ও ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে যুগের পর যুগ মানুষের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে যায়।

ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাভাষী মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' বাংলাদেশে একটি রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম প্রচারে এর নানামুখী কর্মসূচীর মাঝে ইসলামী সাহিত্য চর্চা তথা রচনা ও প্রচার-প্রসার মৌলিক কাজের অংশ। পবিত্র কুরআনের তাফসীর এবং হাদীসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের আলোকে জীবন ঘনিষ্ঠ নানা বিষয়ে ইসলামী সাহিত্য রচনা, বিশ্বনবীর (সা) আদর্শ প্রচারে সিরাত সাহিত্য প্রবর্তন ও সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী দিকনির্দেশনা সম্বলিত সাহিত্য রচনায় এই প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে রেখেছে। নিম্নে ইসলামী সাহিত্যের বিকাশে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে'র পদক্ষেপ গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

লাইব্রেরী স্থাপন

ক. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা

ইসলামী সাহিত্যের গবেষণা ও সর্বস্তরের মানুষের ইসলামী জ্ঞানার্জনের সুযোগ করে দিতে প্রতিষ্ঠালগ্নেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে কুরআন-হাদীস, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসহ নানা বিষয়ের উপর প্রায় একলক্ষ ছাব্বিশ (১২৬০০০) হাজার পুস্তক ও পুস্তিকা রয়েছে।

এখানে আছে 'মাসহাফে ওসমানী', উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ কুরআনুল কারীম, কুরআনের ছায়ালিপি, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কোরআন, অন্ধদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির কুরআন, বার্মিজ, তাজিক, আসাম, লেবানিজ ও ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ। এ ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক সাময়ীকি মিলিয়ে প্রায় ৫০টি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায়[৬৫]।

এছাড়া দেশের ৬৪টি জেলাতেও ইসলামিক ফউন্ডেশন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ. মসজিদ ভিত্তিক ইসলামী পাঠাগার স্থাপন

ইসলামের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও মাসায়েল শিক্ষা, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে[৬৬]। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২৭৮৩২ টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি মডেল পাঠাগার এবং ৪৭৭ টি উপজেলায় মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে[৬৭]।

---

৬৪ অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মমদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৬৫ সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন* (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৭), পৃ.২১

৬৬ অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মমদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৬৭ সামীম মোহাম্মদ আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার' ও বৃত্তি প্রবর্তন

ইসলামের দিকনির্দেশনামূলক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় ও জাতীয় জনহিতকর কাজে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এমনকি ইসলামিক বিষয়ে গবেষণার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে[৬৮]। ইসলামের মৌলিকত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে প্রতি হিজরী সনে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়[৬৯]।

গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

ক. গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ, ফিক্‌হ, মাসআলা-মাসায়েল ও ইসলামী বিষয়সমূহের উপর গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও প্রকাশনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলি পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এ বিভাগের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্মের উপর গবেষণা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ইতোমধ্যে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ফাতাওয়া ও মাসাইল, আল-কুরআনে অর্থনীতি, Scientific Indications in the Holy Quran, Muslim Contribution to Science & Technology এবং বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ত্ব ও দর্শন, মাসাইলে আহনাফ, আরবী-বাংলা ও বাংলা-আরবী অভিধান, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়নসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৭৭টি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিদগ্ধ গবেষকদের মাধ্যমে ইসলাম ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সভা-সেমিনার বাস্তবায়নসহ নানাবিধগবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়া আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স অত্র বিভাগের অধীন চালু হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা শীর্ষক একটি গবেষণা ত্রৈমাসিক এ বিভাগের তত্ত্বধানে বিগত ৬০ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। পরিচালক, গবেষণা, এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

খ. গবেষণা পত্রিকা

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' শীর্ষক একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিগত ৫৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে[৭০]। এ পত্রিকাটি ইসলামের সার্বজনীন ও শাশ্বত জীবন-বিধান, নীতিমালা ও মূল্যবোধের প্রচার-প্রসারে জাতীয়

---

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৬৯ অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মমদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৭০ সামীম মোহাম্মদ আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

পর্যায়ে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্রিকাটি গবেষণা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত। ২০১২ সাল পর্যন্ত ৫০ বছরে ১৬০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়[৭১]।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামী সাহিত্যের মূলনীতি তথা কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস চর্চায় এই বিভাগের রয়েছে অনেক বড় অবদান। বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১২ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যা বাংলা ভাষায় সীরাত সাহিত্য চর্চায় একটি মাইলফলক। এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে ৩৮০ টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।[৭২]

ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত অন্যভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সম্বলিত বাংলায় 'ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলায় ২ খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষসহ ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত বৃহত্তর 'ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হয়েছে। 'সীরাত বিশ্বকোষ' নামে ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত জীবনী বিশ্বকোষ প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন। এতে আম্বিয়া কিরাম (আ) ও রাসূল (সা) এর জীবনী স্থান পেয়েছে। আল-কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত শব্দাবলীর আলোকে 'আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ' শিরোনামে মোট ৬ খণ্ডে সমাপ্য। অত্র বিভাগ থেকে ভবিষ্যতে সাহাবায়ে কিরাম বিশ্বকোষ, তাবে-তাবেয়ীন বিশ্বকোষ, আউলিয়ায়ে কেরাম বিশ্বকোষ, পীর-মাশায়েখ বিশ্বকোষ, ইসলামী শিশু-কিশোর বিশ্বকোষ, তাসাউফ বিশ্বকোষ এবং আরবী পরিভাষা বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।[৭৩]

প্রকাশনা বিভাগ

ক. পুস্তক প্রকাশ

ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃষ্টি, আর প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমেই উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনেকটাই বাস্তবায়ন করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে।

খ. মাসিক পত্রিকা প্রকাশ

'সবুজ পাতা' নামে একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা ও 'ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়' বিভাগ থেকে 'অগ্রপথিক'নামে একটি সৃজনশীল মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে[৭৪]। অনিয়মিত প্রকাশনীর মধ্যে আছে 'প্রত্যয়-০৯' নামে ১টি সাময়িকী, অমর একুশে স্মরণিকা'০৯, ইফা. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা ও ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক ২৫টি প্রকাশনা[৭৫]।

---

৭১ গবেষণা বিভাগ (সংকলন), *প্রবন্ধ সূচি ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা: ইফাবা, ২০১২), পৃ.৫-১০

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৭৫ ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পুস্তক তালিকা (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৬), পৃ. ৬

ভাষণে ইসলামী সাহিত্যের উপাদান

- **ঈমান-একতা-শক্তি**

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে 'ঈমান-একতা-শক্তি' এই মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই বিজয়ী সেনাপতি। ইসলামে ঈমান ছাড়া আমল মূল্যহীন। আর নিখাঁদ ঈমানই পারে একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলতে। ঈমান সতেজকারী এসকল বক্তব্য তাঁকে ইসলামী সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে স্বর্নাক্ষরে লিখে রেখেছে। ঢাকা স্টেডিয়ামে এক বক্তৃতায় জাতির জনক বলেন, '... টাকা নাই, পয়সা নাই, চাল নাই, ডাল নাই, রাস্তা নেই, ফেরাউনের দল সব শেষ করে দিয়ে গেছে কিন্তু আছে আমার মানুষের একতা, আছে তাদের ঈমান, আছে তাদের শক্তি। এই মনুষ্য শক্তি দিয়েই এই বাংলাকে নতুন করে গড়তে চাই।

- **মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয় সুনিশ্চিত**

তিনি মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে ভারতের নয়াদিল্লিতে প্রদত্ত ভাষণে ও ১৯৭৫ সালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১ম ক্যাডেটদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ ছিলো অন্যায়কে শক্ত হাতে রুখে দাঁড়ানোর প্রকাশ্য ঘোষণা। বক্তব্যে ছিলো অন্যায়কে প্রতিহত করার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

অর্থাৎ তুমি বলো, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অবশ্যই মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতে হবে[৭৬]। অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কয়েকটা চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, ঘুষ খোর দেশের সম্পদ বাইরে বাইর করে দিয়ে আসে, জিনিসের গুদামজাত করে মানুষকে না খাইয়ে মারে, উৎখাত করতে হবে বাংলার বুকের থেকে এদের, দেখি কতদূর তারা টিকতে পারে! চোরের শক্তি বেশী না ঈমানদারদের শক্তি বেশি, সেটা এবার প্রমাণ হয়ে যাবে। অন্যায়ের কাছে কোনদিন মাথানত করি নাই। বারবার পাকিস্তানীরা আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছে। বারবার বুকটান করে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, কারণ আল্লাহ আমার সহায় ছিলো। বাংলার জনগণের দোয়া ছিলো। এখনো সেই দোয়া আছে। ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাহায্য, তোমাদের সহানুভূতি, তোমাদের কাজ, দেশের জনগণের ভালোবাসা আর ঈমানদার মানুষের সহযোগিতায় এই দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করতে হবে'।

- **সাহসিকতার জয় ভীরুতার পরাজয়**

বঙ্গবন্ধুর সময় অনেকেই ছিলেন। কিন্তু 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে উঠলেন শুধুই তিনি। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো 'জনস্বার্থে দুঃসাহসিকতা'র পরিচয়। ইসলাম সাহসিকতাকে সফল নেতৃত্বের অন্যতম মূলনীতি নির্ধারণ করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিলো ৩১৩ জন। আর কাফির শিবিরে ছিলো ১০০০ জন। কিন্তু বিজয় হয়েছিল মুসলমানদের। রাসূল (সা)-এর বিজীত সকল যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য কাফিরদের এক-তৃতীয়াংশ ছিলো। কিন্তু আল্লাহতে বিশ্বাস আর সাহসিকতাই তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করেছে।

---

৭৬ আল-কোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১

- **ধর্মীয় স্বাধীনতা**

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র থেকে ধর্মের উচ্ছেদ হলেও বঙ্গবন্ধু 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে সকল ধর্মের সহাবস্থানকে বুঝিয়েছেন। যা তার বক্তৃতা, কর্মকাণ্ড এবং বুদ্ধিজীবীদের লেখনী থেকে স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'আমি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম বিরোধীতা নয়। আমি মুসলমান। আমি ইসলামকে ভালোবাসি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন দেখবেন এদেশে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড কখনই হবে না[৭৭]। সকল ধর্মের সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাঙালীর শ্রেষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায়, কাজে, ভালোবাসায় ইসলামকে ধারণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যে ধর্মহীনতা নয় তার কয়েকটি প্রমাণ এ রকম:

ক. বাণী পাঠ রহিত করে রেডিওতে কুরআনের তিলাওয়াত প্রচলন

বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণার পর তৎকালীন টেলিভিশনের মহাপরিচালক জামিল চৌধুরী সুখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসানকে দিয়ে কিছু ন্যায়-নীতি সংক্রান্ত বাক্য রেকর্ডিং করে নেয় রেডিওতে প্রচারের জন্য এই চিন্তায় যে, এখন তো দেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাই এখন অনুষ্ঠানের শুরুতে আর কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হবে না। এই বাণী বোধ হয় দু-একদিন পাঠ করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বাণী শুনে ভয়ানক রুষ্ট হয়ে জামিল চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। বঙ্গবন্ধু জামিল চৌধুরীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, 'একজন মুসলমানের বাড়ীতে সকাল বেলা কিসের শব্দ শুনা যায়? গানের না হরিবোলের। সবাই তখন তটস্থ হয়ে গেছে, তিনি তখন নিজেই উত্তর দিলেন, মুসলমানের ঘরে কুরআন শরীফের আওয়াজ শুনা যায়। আজ থেকেই রেডিও টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি কুরআন শরীফের আওয়াজ শুনতে চাই'[৭৮]। কারণ কুরআন তেলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে অনেক আয়াত-হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তিলাওয়াত করবে, তার জন্য দশটি নেকি বা কল্যাণ রয়েছে'[৭৯]। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী, যা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করা হয় না, তা বরকত শূন্য[৮০]।

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু

দীনি ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ[৮১]। রাসূল (সা) হিজরতের পূর্বেই মক্কায় যায়েদ ইবনে আরক্বামের বাড়িতে 'দারুল আরক্বাম' নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মাকরামা ইবনে নওফলের বাড়িতে 'দারুল কুর্‌রাহ' মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুগে যুগে মাদ্রাসায় কল্যাণমুখী উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো। তাই ইসলামে মাদ্রাসার গুরত্ব অপরিসীম। একবার ঢাকায় বুদ্ধিজীবী মহল মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটি বিবৃতি দেয়। এ বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসান তৎকালীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসূফ আলীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, ড. মল্লিক মাদ্রাসার জন্য সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেবার

---

৭৭ সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
৭৮ সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৭৯ তিরমিযি, ২৯১০
৮০ মুসনাদে আহমাদ,১৪/৩২৯
৮১ বায়হাকী: শুয়াবুল ঈমান, ১৬১৪

একটি প্রস্তাব প্রধান মন্ত্রীর কাছে দিচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু যাতে এ ফাইলে অনুমোদন না করেন সে ব্যবস্থা তিনি করবেন। পরে দেখা গেলো বঙ্গবন্ধু ঐ ফাইলের উপর লিখেছেন যে, 'মাদ্রসা শিক্ষার জন্য যে বরাদ্দ এতদিন ছিলো সেটাই থাকবে, তবে ভবিষ্যতে এ বরাদ্দ বাড়ানো যায় কিনা এবং কতটা বাড়ানো যায় তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে'। শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আলী আহসানকে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে জানেন এবং এদেশের মানুষ যে মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে তাও তিনি জানেন। সুতরাং ধর্রনিরপেক্ষতা নামে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করবেন, এটা কল্পনাই করা যায় না'[৮২]।

গ. মাদ্রাসা বোর্ড সংস্করণ

মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণের জন্য মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা ও অনুদান বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। ফলে এটি একটি স্বতন্ত্র বোর্ডে পরিণত হয় এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়[৮৩]।

ঘ. আনন্দ প্রকাশে বাজনা নয় মিলাদ

বঙ্গবন্ধুর সুস্থভাবে পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে আসায় আনন্দ প্রকাশের জন্য চানখার পুলের আওয়ামী কর্মীরা একটি উৎসবের আয়োজন করবে বলে সৈয়দ আলী আহসানকেসহ বঙ্গবন্ধুর নিকট যায় এবং সে জন্য টাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। তিনি বললেন, কী করবা তোমরা বলো? তখন তারা বাজি পোড়ানো, গানবাজনা করার কথা বললে তিনি রেগে গিয়ে বলেন, 'ঐ, মুসলমানরা খুশি হলে বাজি পোড়ায় না মিলাদ পড়ায়? যা, মিলাদের ব্যবস্থা কর, আর সৈয়দ সাহেবকে দিয়ে মিলাদ পড়াইয়া দে'[৮৪]। কারণ রাসূলের উপর দরুদ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা হয়। আর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলে তিনি বরকত বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যদি তোমরা (আমার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে (এ অনুগ্রহ) আরো বাড়িয়ে দেবো'[৮৫]।

ঙ. ইসলামী সংস্থার সদস্য হওয়া

তিনি 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন', 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে'র সক্রিয় কর্মী ও কাউন্সিলার নির্বাচিত হন[৮৬]। 'পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন[৮৭]। যা তাঁর ধর্মীয় নিষ্ঠার পরিচায়ক।

- **হিংসা পরিহার করা, পরাজিতের প্রতি উদারতা ও মহানুভবতা**

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে ভারতের নয়াদিল্লিতে প্রদত্ত ভাষণে হিংসা পরিহার করা, ন্যায়নিষ্ঠার জয়, পরাজিতের প্রতি উদারতা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্য কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয়

---

৮২ সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
৮৩ ড. রফিকুল ইসলাম, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৮), ২৪শ খণ্ড (১ম ভাগ), পৃ. ৫৮
৮৪ সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৮৫ সূরা ইবরাহীম, ৭
৮৬ ড. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৮৭ হারুন অর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

হয়েছে’[৮৮]। হিংসা সমাজকে শতধাভিক্ত করে দেয়। হাবিলকে কাবিল হিংসা করতে যেয়ে সমাজে বিশৃংলা সৃষ্টি হয়। বরং ভালোবাসাতেই মাহাত্ম্য। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন, মু’মিন ব্যক্তি ভালোবাসা ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কাউকে ভালোবাসেনা এবং কারো ভালোবাসা পায় না[৮৯]। পাক নাগরিকদের নির্যাতন না করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ‘এমন কিছু করো না যাতে বাঙালির বদনাম হয়’[৯০]। তিনি দেশে ফিরেই মিত্র শক্তিকে এক নির্দেশে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন[৯১]।

- **ইসলামী রীতির চর্চা**

তিনি বক্তব্যের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ এবং শেষে ‘ইনশাআল্লাহ’ এসব ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জাতিকে চির শাশ্বত জীবন বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। ৭ই মার্চের ভাষণের ‘ইনশাআল্লাহ’ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডাঃ এস এ মালেক বলেন, “That historic speech was that did not forget to say ‘Insha Allah’, i.e. if Allah pleases. It was for them to judge who still propagate that Bangabandhu had no faith”[৯২]. ১৯৭৪ সালে মিলিটারী একাডেমিতে প্রদত্ত বক্তব্যে সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার বলছিলেন ‘ইনশাআল্লাহ’। ‘আমি সোনার বাংলা দেখবার যেতে না পারি কিন্তু হবে ইনশাআল্লাহ’। অন্তত ২০ বার ইনশাআল্লাহ বলেছেন ১টি বক্তব্যে।

- **বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী**

বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একটি দেহের মত। এক দেশের বিপদে অন্যরা এগিয়ে আসবে। হযরত নু‘মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা মু’মিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে, দেহের কোনো অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর ও নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে[৯৩]।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্স জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠক উপলক্ষে ইসলামী নেতৃবৃন্দের সামনে বঙ্গবন্ধু মাজলুমের আর্তনাদ হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করে বিশ্বনেতৃত্বের বিবেকে সজোরে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী দুর্বলের উপর সবলের অন্যায়-অত্যাচার, অধিকারহরণ, শক্তির অপব্যবহার, প্যালেস্টাইনে বিশ্বমোড়লদের অত্যাচারী ভূমিকার কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরেন। এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক নীতি ঘোষণা করেন, ‘ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি’। মহানবীর প্রচারিত মানবপ্রেম ও মানব মর্যাদার শাশ্বত মূল্যবোধ প্রসারের মাধ্যমে বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ

---

৮৮ মোঃ আশিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮
৮৯ মিশকাতু মাসাবীহ, ৪৯৯৫
৯০ শামছুজ্জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
৯১ ডাঃ শাহাদাত হোসেন (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩
৯২ Dr. S A Malek, *Steam of thought*, Dhaka: News & Views Publications, 1997, p. 29-30
৯৩ বুখারী, ৫৫৫২

ব্যক্ত করেন। এ মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি নতুন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা বলেন। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্ব ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে 'ও আই সি' সম্মেলন, কুয়েত ও কায়রো সফর এবং চীনে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনসহ বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান করে তিনি বিশ্বশান্তি বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের সাথে দৃঢ় সম্পর্কের মাধ্যমে আন্তঃ ইসলামী বিশ্ব সংস্কৃতি চর্চার দ্বার উন্মোচনে অবদান রাখেন।

- **ক্ষমতার প্রতি নির্লোভ ও গণসম্পৃক্ততা**

এই মহান নেতার কর্মতৎপরতা, দেশপ্রেম আর মানব প্রেম বলে তিনি সত্যিই ক্ষমতার লোভহীন ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, সাহাবী-তাবেয়ী ও তাবয়েতাবেয়ীনদের যুগে ইসলামের খলিফাগণ ছিলেন গণসম্পৃক্ত। ১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, 'ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই, তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে। কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমার চা-ই চা-ই। সে শক্তি যোগাতে পারেন কেবল আপনারাই'[৯৪]।

- **ঐক্যের প্রতি বিশেষ নজর**

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন তিনি ঐক্যের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন তিনি বলেন, 'ভাইরা তাদের (বিশ্বাস ঘাতক) গায়ে হাত দিওনা; তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই; বাঙালীরা কেবল মাত্র স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করতে পারে, তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে'[৯৫]।

- **আল্লাহ ওপর নির্ভরতা**

মু'মিন তার সকল কর্মে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

যখন তুমি (কোনো কাজের) সংকল্প করবে, তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা (তাঁর উপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন[৯৬]।

বঙ্গবন্ধুর বন্ধু লুৎফুর রহমান তাঁকে ৩২ নম্বর বাড়িতে অরক্ষিত থাকতে নিষেধ করলে তিনি বলতেন, 'আজরাইল যখন আসবে, তখন ট্রাংকের মধ্যে তালা চাবি মাইরাও তো আমাকে রাখতে পারবানা'[৯৭]।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.

---

৯৪ দৈনিক পূর্ব-দেশ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০
৯৫ আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
৯৬ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান: ১৫৯
৯৭ বদিউজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ৪২

তোমরা যেখানেই থাকো- মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা যদি কোনো) মজবুত দুর্গেও থাকো[৯৮]।

- **সাচ্চা দেশপ্রেমের নজির**

'বঙ্গবন্ধু' নামটিই যেনো সাচ্চা দেশপ্রেমের উপযুক্ত প্রতিশব্দ। যা ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক উপাদানের অন্যতম। হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন,

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها

'আল্লাহ্‌র পথে একদিন দেশের সীমান্তে পাহারা দেয়া দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। আর (এ কাজের বদৌলতে) তোমাদের কেউ যদি জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পায়, তাহলে তা দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম[৯৯]। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'[১০০]। **১৯৭৫** সালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত **১ম** ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, 'আরেক দল আছে যারা বিদেশীদের অর্থে বাংলার স্বাধীনতাকে নস্যাত করতে চায়। রাতের অন্ধকারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে এবং বিদেশী আদর্শ বাংলার মাটিতে চালু করতে চায়, তাদের বাংলার মাটিতে স্থান হবে না। মনে রেখো তোমরা, তাদের বাংলার মাটিতে শেষ করতে হবে, কেমন করে একটা লোক নিজের দেশের মাতৃভূমিকে বিক্রি করতে পারে, পয়সার লোভে, ভাবতে আমি শিওরে উঠি। যেখানে অন্যায় অবিচার দেখবা চরম আঘাত করবা, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবা, গুরুজনকে মেনো, নিরপরাধে যেন অন্যায় না হয় এদিকে খেয়াল রাখবা'।

- **মুসলিম স্বার্থ ও আল-কুরআন**

রাসূল (সা) অল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ও স্বার্থ সংরক্ষণে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় একটি নিরাপদ আবাস ভূমি নির্মাণ করেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ইস্যুর উপর অনুষ্ঠিত **১৯৪৬** সালের সাধারণ নির্বাচনী প্রচারণায় তৎকালীন ছাত্র নেতা খন্দকার আবুল হাশেমকে লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'হাশেমরে, যা করবি পরে করিস, আগে পাকিস্তান বানা, নইলে এদেশের মুসলমানদের মায়ের দুধ হারাম হয়ে যাবে, কোরআন নিশ্চিহ্ন হবে'[১০১]।

বক্তব্যে ইসলামী উদাহরণ ব্যবহার

ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম উপাদান সাহাবীদের জীবনাচার। বঙ্গবন্ধু সে কাজটিও তার বক্তব্যে সার্থকভাবে তুলে ধরতেন। নেতার কোনো অন্যায় কর্মীর চোখে ধরা পড়লে নেতাকে বিনয়ের সাথে সংশোধন করা কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। এটাই ইসলামের শিক্ষা। কর্মীরা সহজেই

---

৯৮ আল-কুরআন, সূরা নেসাঃ ৭৮

৯৯ সহীহ বুখারী, ২৭৩৫

১০০ শামছুজ্জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

১০১ বদিউজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

যেন নেতাকে কোনো অসংগতি সম্পর্কে সচেতন করার সুযোগ পান এই সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কোনো নেতা যদি অন্যায় করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা ও তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন হযরত ওমরকে (রাঃ) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড় জামা পরেছিলেন বলে। যদিও সেটা তাঁর অন্যায় ছিলো না। কিন্তু বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে মানুষের চোখে অন্যায় মনে হয়েছিল বলে তারা প্রশ্ন করেছিল[১০২]।'

- **ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ**

১৯৭৫ সালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত **১ম** ক্যাডেটদেরকে উদ্দেশ্য করে দেয়া নজিরবিহীন ইসলামী সংস্কৃতি সংবলিত একটি ভাষণে তিনি বলেন, 'এতো রক্ত দেয়ার পরে যে স্বাধীনতা এনেছি চরিত্রের পরিবর্তন অনেকের হয় নাই, এখানে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী বাংলার দুঃখী মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন- 'কিন্তু যে দুঃখী মানুষ দিনভর পরিশ্রম করে, তাদের গায়ে কাপড় নাই, যাদের পেটে খাবার নেই, তাদের বাসস্থানের বন্দবস্ত নাই, লক্ষলক্ষ বেকার, পাকিস্তানিরা সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে, কাগজ ছাড়া আমার জন্য কিছুই রেখে যায় নি। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে আমার আনতে হয়, আর এই চোরের দল আমার দুঃখী মানুষের সর্বনাশ করে লুটতরাজ করে খায়।'

একনিষ্ঠ ইসলাম

এখলাস ছাড়া আমল আল্লাহ তা'য়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের দেহের দিকে তাকাবেন না আর না তোমাদের চেহারার দিকে, বরং তিনি লক্ষ্য করবেন তোমাদের অন্তরের প্রতি'[১০৩]। তিনি আরো বলেন,إنما الأعمال بالنيات অর্থাৎ- সকল কর্মের ফলাফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল[১০৪]। বঙ্গবন্ধুর কাজে লৌকিকতার কোনো লেশ মাত্র ছিলোনা। একবার এক বিদেশী তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, Sir, what is your qualification? Mujib: I love my people. What is your disqualification then? Mujib: I love them too much[১০৫]. যেনো রাসূল (সা) এর ঐ বাণীর প্রতিধ্বনী যে, তিনি বলেন, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه অর্থাৎ- হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেহ ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে[১০৬]। **১৯৭০** সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে নভেম্বর মাসে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য- লেবাস সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে করীম এর ইসলাম। যে ইসলামে জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের

---

১০২ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০
১০৩ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন-০৭
১০৪ বুখারী, ০১
১০৫ শামছুজ্জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩
১০৬ বুখারীঃ ১২, মুসলিমঃ ৬৪

প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে'[১০৭]।

উপসংহার

বাংলাদেশের মতো আয়তনে অত্যন্ত ছোট অথচ জনবহুল দেশে বঙ্গবন্ধুর মতো ভিশনারী নেতার প্রয়োজনীয়তা ছিলো অপরিহার্য। কিশোর বয়স থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু দেশ আর দেশের মানুষকে নিঃস্বার্থ ভালোবেসে গেছেন তিনি। ফিদেল কাস্ত্র বলতেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি'। সত্যিই তো হিমালয় সম সাহস যার তাঁর পক্ষেই একটি প্রতিষ্ঠিত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিজের আত্মবিশ্বাস, সঠিক দিকনির্দেশনা আর জনগণের উপর অগাধ বিশ্বাসের বলে স্বাধীনতা ঘোষণা করা এবং অর্জন করা সম্ভব। দেশ স্বাধীনের পর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঈমান-আক্বীদা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি সংরক্ষণে আমৃত্যু চেষ্টা করে গেছেন। ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে তাঁর সফল অবদান ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রাখবে। ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন জেলায় ৪০টি শাখা দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত অস্থায়ী পড়ে থাকে। যা বঙ্গবন্ধু কন্যা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সবগুলো স্থায়ী করে দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ৫ তলা বিশিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয়। লাইব্রেরীতে নতুন বই, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণা কক্ষ, পাঠকক্ষ, শিশু পাঠ কক্ষ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক পাঠ কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। 'ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়' অনুমোদন, ৪০০০ টি মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ্ড করা, ৩ বছর মেয়াদে ২৩ কোটি টাকার ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সুদৃঢ় নেতৃত্বের অধিকারী তাঁর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া এই কাজগুলি সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

---

১০৭ ডাঃ শাহাদাত হোসেন (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ এনামুল হক*
মোহাম্মদ জামাল হোসেন**

প্রারম্ভিকা

সূচনা : শিশু-কিশোররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির উপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির উন্নতি। শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের একটি অংশ কোন কারণে অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চরম হুমকি ও সুস্থ সমাজ জীবনের প্রতিবন্ধক হোক তা কারো কাম্য নয়। এজন্যই ইসলাম শিশু-কিশোরদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং অপরাধমুক্ত জীবন যাপনে উপস্থাপন করেছে সর্বজনীন ও কল্যাণকর নীতিমালা যা বাস্তবে কার্যকর করতে পারলে পরিবার পেতে পারে কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি এবং দেশ ও জাতি লাভ করতে পারে অমূল্য সম্পদ।

কিশোর অপরাধ পরিচিতি

কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টির ইংরেজী হলো Juvenile Delinquency। আর Delinquency ল্যাটিন শব্দ Delinquer থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ to omit বাদ দেয়া, বর্জন করা, উপেক্ষা করা ইত্যাদি।

রোমানরা কোন ব্যক্তির উপর আরোপিত কর্ম অথবা কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা বুঝাতে Delinquency শব্দটি ব্যবহার করত।[১] ১৪৮৪ সালে উইলিয়াম কক্সসন সর্বপ্রথম Delinquent পরিভাষাটিকে দোষী ব্যক্তির প্রচলিত অপরাধ বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও ১৬০৫ সালে ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক "Macbeth" এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[২]

কিশোর অপরাধ পরিভাষা আলোচনার পূর্বে শব্দ দু'টিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে এর প্রতিপাদ্য বিষয় সহজেই অনুমেয় হবে। সাধারণত কিশোর বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা বাল্য ও

---

* জেলা প্রশাসক জামালপুর

** প্রভাষক : ইসলাম শিক্ষা, কালিকাপুর আবদুল মতিন খসরু সরকারি কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা

১. "The term "Delinquency" has been derived from the Latin word Delinquer which means "to omit", The Romans used the term to refer to the failure of a person to perform the assigned task or duty. দ্র: Dr. N. V. Pranjape, Criminology and Penology, Allahbad : Central Law Publications, 2005, p. 486.

২. Ibid.

যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সের ছেলে-মেয়েদের বুঝায়।[৩] তবে কৈশোর কালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত আইনে দেশ ও সমাজভেদে নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে মেয়েরা কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত। যেমন বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীর বয়স সীমা হলো ৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত।[৪] এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:[৫]

পোল্যান্ড	১৩ থেকে ১৬
অস্ট্রিয়া	১৪ থেকে ১৮
জার্মানী	১৪ থেকে ১৮

মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অসীম রহমতে মানব সন্তান শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কাল পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا۔

"আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর তোমরা যেন যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, সে যেন জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে স্বজ্ঞান থাকে না।"[৬]

মানব জীবনের বিবর্তিত স্তরগুলোকে আরবী অভিধানে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৭] ইসলামী আইনবিদগণ কিশোর বলতে ঐ ছেলেদের বুঝিয়েছেন যাদের ইহতিলাম[৮]

৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খ্রি., ২৪ তম সংস্করণ, পৃ. ১৫২।

৪. পান্না রাণী রায়, অপরাধ বিজ্ঞান, ঢাকা : উপমা প্রকাশন, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১৭৪

৫. আব্দুল হাকিম সরকার, অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ ঢাকা : কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৬৪

৬. আল-কুরআন, সূরা আল্ হাজ্জ, আয়াত : ৫

৭. মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন সন্তানকে জানীন (جنين), ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে সাতদিন বয়সের সন্তানকে সাদীগ (صديغ), দুগ্ধপানকারীকে রাযী (رضيع), দুধ ছাড়ানো সন্তানকে ফাতীম (فطيم), নিজে নিজে চলাফেরা করতে পারা সন্তানকে দারিজ (دارج), দুধের দাঁত পড়া সন্তানকে মাছগুর (مثغور), দাঁত পড়ার পর নতুন দাঁত উঠা সন্তানকে মুছ্ছাগির (مثغر), দশ বছর অতিক্রমকারীকে মুতার'আরি' (مترعرع), ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণকারী স্বপ্নদোষের নিকটবর্তী মুরাহিক/ইয়াফি (مراهق/يافع), স্বপ্নদোষ হলে তাকে হাযাওয়ার (حزور), উপর্যুক্ত সকল অবস্থাকে বলা হয় গোলাম (الغلام), গোঁফ কালো হলে তাকে বাকল

বা স্বপ্নদোষ শুরু হয়নি এবং কিশোরী বলতে যাদের হায়েয[৯] বা মাসিক ঋতুস্রাব হয়নি এমন মেয়েদেরকেই বুঝিয়েছেন।[১০] ইসলাম কৈশোর কালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ না করে বিশ্বজনীন ও বাস্তবসম্মত নীতি হিসেবে বয়ঃপ্রাপ্তিকে চূড়ান্ত সীমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ হিসেবে ছেলে-মেয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে তারা কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং বয়ঃপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। ছেলে ও মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুযলো হলো ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় ইহতিলাম বা বীর্যপাত হওয়া।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

"তোমাদের সন্তানেরা স্বপ্নদোষ[১১] হওয়ার পর্যায়ে পৌছলে অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ।"[১২]

এছাড়াও মেয়েদের হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব ও গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তি প্রমাণিত হতে পারে।[১৩]

উপর্যুক্ত লক্ষণগুলোর কোনটিই যদি কারো মধ্যে প্রকাশিত না হয়, সে ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের মাধ্যমে বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করা যায়। তবে ইসলামী আইনবিদগণ কিশোর-কিশোরীর বয়সের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও মালিকী আইনবিদদের মতানুযায়ী, যে ছেলের ইহতিলাম

(بقل), ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্য বয়সের লোককে শাব্বুন (شاب), ষাট বছর বয়সে উপনীত হলে কাহলুন (كهل) এবং ষাট বছরের বয়সের পর সময়কে হারিম (هرم) বলে। দ্রঃ আবূ মানছূর আছ-ছা'লাবী, ফিকহুল লুগাহ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১৷৷

৮. ইহতিলাম (احتلام) : ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সঙ্গে দ্রুতবেগে পুরুষ বা নারীর বীর্য নিসৃত হওয়াকে ইহতিলাম বলা হয়। দ্রঃ সা'দী আবূ জীব, আল-কামূসুল ফিকহী, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামী, ১৩৯৭ হি. পৃ. ১০১

৯. হায়েয (حيض) শব্দের অর্থ প্রবাহ বা স্রাব। প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর জরায়ু থেকে রোগব্যাধি ব্যতীত প্রতি মাসে কয়েকদিন যে রক্ত নির্গত হয় তাকেই হায়েয বলে। দ্র. সা'দী আবূ জীবন, আল-কামূসুল ফিক্হী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১০. 'আলা-উদ্দীন আবূ বকর ইবন মাস'উদ আল-কাসানী, বাা'ইউস সানাঈ', করাচী : আদব মানযিল, ১৪০০ হি., খ. ৭, পৃ. ১৭২; মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, আল-উম্ম, মিসর : কিতাবুশ শা'আব, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৯১; আল-হাত্তাব মুহাম্মদ আত্-তারবিলসী, মাওয়াহিবুল জালীর, লিবিয়া : মাকতাবাতুন নাজাহ, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৫৭-৫৯; আহমদ ইবন আলী ইবনে হাজার আল-'আস্কালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., খ. ৫, পৃ. ৩৪৭

১১. আয়াতে الحلم শব্দটি 'ইহতিলাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াবিশেষ্য। এর অর্থ স্বপ্নদোষ। (ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, খ. ১২, পৃ.১৪৫)

১২. আল-কুরআন, সূরা আল্ মু'মিনূন, আয়াত : ৫৯

১৩. আল-হুসায়ন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি., খ. ২, পৃ. ১২

বা বীর্যপাত হয়নি, তার আঠার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যে মেয়ের ইহতিলাম বা বীর্যপাত হয়নি, তার সতের বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কিশোরী বলে গণ্য করা হবে।[১৪] অন্য দিকে কোন ছেলে-মেয়ের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন লক্ষণ যদি আদৌ প্রকাশ না পায়, তাহলে পনের বছর বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তারা উভয়ই কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে বলে ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ, হানাফী আইনবিদ ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ রহ. সহ অধিকাংশ আইনবিদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৫]

অপরাধের আরবী আল-জারীমাহ (الجريمة)। ইংরেজীতে একে crime, offence বলা হয়।[১৬] আল-জারীমাহ শব্দটি একবচন, বহুবচনে আল-জারাইম (الجرائم) যা আল-জুরম (الجرم) থেকে উদ্ভূত। আল-জুরমু (الجرم) শব্দটির জীম অক্ষরে পেশ যোগে অর্থ পাপ (الذنب), সীমালঙ্ঘন (التعدى ইত্যাদি।[১৭] ইসলামী আইনের পরিভাষায় অপরাধ বলতে শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা করলে হদ্দ অথবা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[১৮]

কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টির সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোর বয়সে অবাঞ্ছিত ও সমাজ বিরোধী আচরণ সম্পাদন করাকেই বলা হয় কিশোর অপরাধ।[১৯] মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানী Cavan বলেন, সমাজ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ।[২০] আইনগত দিক থেকে কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক আইন বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় কর্ম সম্পাদন করাকেই বুঝায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে কিশোর অপরাধের নির্ধারিত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সংজ্ঞায় বলা হয়,

---

১৪. আল-কাসানী, বাদাই'উস সানাঈ', প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭২, ইব্‌ন হাজার 'আল-'আস্‌কালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৭; সায়্যিদ সাবিক, ফিক্‌হুস সুন্নাহ, আল-কাহেরা : দারুল ফাত্‌হ, ১৪২০ হি., খ. ৩, পৃ. ২৮২; মুহাম্মদ আবূ-যাহরাহ, আল-জারীমাহ, আল-কাহেরা : দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৩৭

১৫. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাঈ', প্রাগুক্ত, খ. ৭, ১৭২; ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৮; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, আল-আশ্‌বাহ ওয়ান নাযাইর, আল-কাহেরা : তাব'আ আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৭ হি., পৃ. ২৪০; ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, আত্‌-তাফসীরুল মুনীর, দামিশ্‌ক : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৮ হি., খ. ৪, পৃ. ২৫০; মুহাম্মদ আবূ যাহরাহ, আল-জারীমাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

১৬. J. Milton Cowan, A Dictionary of Modern Written Arabic, London : Macdonald and Evens Ltd, 1980, p. 121

১৭. ইব্‌ন ফারিস, মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ২১০; ইব্‌ন মানযূর, লিসানুল 'আরব, আল-কাহেরা : দারুল হাদীছ, ১৪২০ হি., খ. ২, পৃ. ১০৫

১৮. الْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ। আবুল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৫ হি., পৃ. ২৭৩

১৯. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা, ঢাকা : প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৪৪

২০ Dr. N. V. Pranjape, Criminology and Penology, ibid, pp. 486-87

Juvinile Delinquency should be understood the commission of an act which is commited by an adult, would be considered a crime.[২১]

কিশোর অপরাধ বলতে কমিশন সে কাজকে বুঝায়, যে কাজ একজন বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে কিশোর অপরাধের পরিচয়ে বলা যায় যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক সংঘটিত দেশীয় আইন, সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডকেই কিশোর অপরাধ বলে।

কৈশোরকাল মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ স্তর শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানব সন্তানের উপর বিভিন্ন শর'ঈ বিধি-বিধান ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়।

এর আগ পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীরা গায়রু মুকাল্লাফ বা বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতামুক্ত হিসেবে বিবেচিত। কেননা হাদীসে তিন ব্যক্তিকে শরী'আতের বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলা হয়েছে,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ ۔

"তিন ব্যক্তি যাবতীয় দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতক্ষণ না বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।"[২২]

সেজন্য আল্লাহ্র অধিকার লঙ্ঘনজনিত অথবা মানুষের অধিকার ক্ষুণ্নকরণজনিত কারণে তাদের উপর শরী'আত নির্ধারিত হুদূদ[২৩] ও কিসাস[২৪] পর্যায়ের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। তবে

---

২১. C.N. Shankar Rao, Sociology : Primary principles of Sociology, S. Chand Limited, 2006, p. 543

২২. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : আল-মাজনূন ইয়াসরিকু আও ইউসিবু হাদ্দা, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯ হি., খ. ৩, পৃ. ৫৬, হাদীস নং ৪৪০৩; হাদসিটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহ ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ৯, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং ৪৪০৩

২৩. হুদূদ (حدود); আরবী ভাষায় 'হুদূদ' শব্দটি 'হদ্দ' এর বহুবচন। ইসলামী আইনের পরিভাষায় হদ্দ হলো আল্লাহ্র অধিকার লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। দ্র. আস সারা সা. আল-মাবসুত, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, ১৯৯২ খ্রি. খ. ৯, পৃ. ৩৬।

২৪. কিসাস শব্দটি قص শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সমতা বা সাদৃশ্য বিধান, কর্তন করা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারী বা আহতকারীকে হত্যা বা আহত করাকে কিসাস বরে। দ্র. ড. রাওয়াস কা'লাজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, করাচী : ইদারাতুল কুরআন, ১৪০৪ হি., পৃ ৩৬৪; ড. সায়্যিদ হাসান 'আব্দুল্লাহ, আল-মাকাসিদুশ শার'ইয়্যাহ লিল 'উকূবাহ ফীল ইসলাম, বৈরূত : দারু ইবন হাযম, ১৪২৭ হি., পৃ. ১৩৯

জনস্বার্থে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদেরকে সংশোধনমূলক তা'যীরী[২৫] শাস্তি প্রদান করার নির্দেশনা ইসলামী আইনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,...

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَّفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ·

"তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সের পর সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে।"[২৬]

এ প্রসঙ্গে ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির এর অভিমতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোর ব্যভিচার অথবা চুরি অথবা ডাকাতির মতো অপরাধ করলে সামাজিকভাবে তাকে অপরাধী বলে গণ্যই করা হবে না–এমনকি মনে করা সঠিক নয়, কেননা তা হবে আইনের অপব্যাখ্যা মাত্র। বরং উত্তম হলো যে, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অপরাধের ন্যায় শিশু-কিশোরের অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো–শর্তপূরণ না হওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের উপর সুনির্দিষ্ট শাস্তি যেমন হুদূদ, কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। তবে কোন শিশু-কিশোর যদি শরী'আতের সুনির্দিষ্ট শাস্তিযোগ্য গুরুতর অপরাধ করে অথবা সুনির্দিষ্ট তা'যীরী অপরাধসমূহের মধ্যে কোন একটি অপরাধ সংগঠন করে তাহলে তার অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিচার করে সংশোধনমূলক কোন শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোন বাধা-নিষেধ নেই।[২৭] অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা করলে তা'যীর প্রযোজ্য হয়।

কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর অপরাধের সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিষয়। তথাপিও অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালিয়েছেন। যা অপরাধের নানাবিধ সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়ক। কিশোর অপরাধের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক

২৫. তা'যীর (تعزير) শব্দটি আল-'উযরু (العزر) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, নিষেধ করা, সাহায্য করা ইত্যাদি। ইসলামী আইনের পরিভাষায় যে সব অপরাধের জন্য শরী'আত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি বা কাফফারা নির্ধারণ করে দেয় নি, সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে। দ্র. সা'দী আবু জীব, আল-কামূসুল ফিকহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; আস-সায়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৫।

২৬. আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : সালাত, অনুচ্ছেদ : মাতা ইয়ুমারুল গুলামু বিস-সালাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫, হাদীস নং ৪৯৫; হাদীসটি হাসান ও সহীহ (حسن و صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহ ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ, আল-মাকাতাবাতুম শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৪৯৫, হাদীস নং ৪৯৫

২৭. ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির, আত্-তা'যীরু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, আল কাহেরা : দারুল ফিক্র আল-'আরাবী, ১৪২৮ হি, পৃ. ৫৮

আরনল্ড টয়েনবী অভিমত ব্যক্তি করেছেন যে, বর্তমানের ধর্মহীনতাই অন্যান্য অপরাধের ন্যায় কিশোর অপরাধের কারণ।[২৮] অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের জনক কার্লমার্কস্ এর মতে, কিশোর অপরাধসহ সব ধরনের অপরাধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রভাব।[২৯] আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানের জনক সিজার লোমব্রোসো কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে জৈবিক প্রভাবকে দায়ী করেছেন।[৩০] সমাজবিজ্ঞানী হিলি এবং ব্রোনার (Healy and Bronner) কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন।[৩১] বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তে মানুষের মনোজগতের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩২]

জৈবিক কারণ

বংশগতি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জৈবিক বৈশিষ্ট্য কিশোর অপরাধের অন্যতম একটি কারণ। শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেটিই তার বংশগতি। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয় বংশগতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। জন্মগতভাবে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে তারা অস্বাভাবিক আচরণ ও অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে।[৩৩] জন্মগত শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিগুলো যেমন মাথার খুলি স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট বা বড়, গাঢ় ও ঘন ভ্রু, চেপ্টা নাক, প্রশস্ত হাতের তালু, প্রশস্ত কান, ঘন চুল, লম্বা বাহু, চোখ বসা, হাত-পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল, সংকীর্ণ কপাল, অসামঞ্জস্য দাঁত, দুর্বল চিত্ত, ক্ষীণ বুদ্ধি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণহীন, অসৎ প্রকৃতি ও বেদনার প্রতি অতি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি।[৩৪]

উপর্যুক্ত ত্রুটিগুলো থেকে পাঁচটি ত্রুটি শিশু-কিশোরের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে অপরাধকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৩৫]

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী W. Healy শিকাগো শহরে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কিশোর অপরাধীদের ৩১% এর দৈহিক বিকাশ অস্বাভাবিক। এছাড়াও ইতালিতে

---

২৮. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, অপরাধ বিজ্ঞান, ঢাকা : মুহিত পাবলিকেশন, ২০১০ খ্রি., পৃ. ২৩৬

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. 'উবূদুস সিরাজ, 'ইলমূল ইজ্রাম ওয়া 'ইলমুল 'ইকাব, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় : ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি., পৃ. ১৮৩

৩১. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, ঢাকা : অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১২ খ্রি., পৃ. ২৭৪

৩২. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ, ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ২০৭-০৯; বোরহান উদ্দীন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা : প্রভাতী প্রকাশনী ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১১৩

৩৩ 'উবূদূস সিরাজ, 'ইলমুল ইজরাম ওয়া 'ইলমুল ইকাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

৩৪. প্রাগুক্ত, ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ, আল-কাহেরা : দারু আহ্লিল কুরআন, ১৪২৩ হি., পৃ. ২২-২৩; Schafer Stephen, Theories in Criminology, New York : Raudom House, 1969, p, 120; বোরহান উদ্দীন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; বি. এল. দাস অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০০১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৭৬।

৩৫. ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, দৈহিক অক্ষমতা দূর করা গেলে কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।[৩৬] তবে কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে বংশগতিকে দায়ী করলে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, একই ব্যক্তির একাধিক সন্তানের মধ্যে ভিন্নধর্মী আচরণের জন্য কী কারণ দায়ী? যদি বংশগতিকেই অপরাধের কারণ মনে করা হয়, তাহলে মানুষ কেন তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে? কেননা বংশগতির বিষয়ে মানুষের কোন হাত নেই। আর আল্লাহ তা'আলার নীতি হলো একজনের ভার অন্য জনের উপর চাপিয়ে না দেয়া।

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى۔

"কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।"[৩৭]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْا شَيْئًا۔

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না।"[৩৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ۔

"প্রত্যেক সন্তান ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[৩৯]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বংশগতি কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী নয়।

পারিবারিক কারণ

কিশোর অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সবসময় পরিবারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। কেননা পরিবার মানুষের আদি সংগঠন এবং সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। পরিবারের সূচনা হয় স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে। আর পারিবারিক পরিমণ্ডলে সন্তানের জন্ম হয় এবং বিকাশ লাভ করে। সন্তানের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের জন্য পিতামাতার মধ্যে সম্প্রীতিময় দাম্পত্য জীবন একান্ত অপরিহার্য। পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ বিবাদ থাকলে সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে, যা পরিণামে শিশু-কিশোরদের

৩৬. মো: আমিনুল হক, বিকাশ মনোবিজ্ঞান, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৪১

৩৭. আল-কুরআন, সূরা আল আন্ আম, আয়াত : ১৬৪

৩৮. আল-কুরআন, সূরা আন্ নাহল, আয়াত : ৭৮

৩৯. ইমাম আর-বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-জানাইয, অনুচ্ছেদ : মাকীলা ফী আওলাদিল মাশরিকীন, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২৩ হি., খ. ১, পৃ. ৩০৩, হাদীস নং ১৩৮৫

অপরাধপ্রবণ হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।[৪০] অনুরূপভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যদি অনৈতিক বা সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে তাহলে পরিবারে কিশোর অপরাধ সমস্যা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।[৪১] তেমনিভাবে ভগ্ন পরিবার ও কিশোর অপরাধের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ভগ্ন পরিবারে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং পরিবারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয় দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শিশু-কিশোররা ত্রুটিপূর্ণ আচার-আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে উঠে।[৪২] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আফসার উদ্দিন কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধীদের শতকরা ৩৭ ভাগ ভগ্ন পরিবার থেকে আগত।[৪৩] অন্যদিকে বাসস্থানের অনুপযুক্ত পরিবেশ কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন নিম্নমানের গৃহায়ণ ও বস্তি এলাকার পরিবেশে শিশু-কিশোররা জীবনের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিচ্যুত আচরণ দ্বারা তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়। এভাবেই বাসস্থানের খারাপ পরিবেশ কিশোর-কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়।[৪৪]

অর্থনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কিশোর অপরাধের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। দারিদ্রতা ও সম্পদের প্রাচুর্য উভয়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিশোর অপরাধ সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার রাখে। দরিদ্রতার কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে কিশোররা বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) কুফরীর পাশাপাশি দরিদ্রতা থেকেও আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৪৫]

---

৪০. আহ্‌মাদ মুহাম্মদ কুরাইয, আর-রিয়া'আতুল ইজ্‌তিমা'ইয়াহ লিল্ আহ্‌দাছিল জানিহাইন, দাশিমক : মাতবা'আতুল ইন্‌শা, ১৪০০ হি., পৃ. ১৮০-১৮১; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৪১. আব্দুল হাকিম সরকার, অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; আহমাদ মুহাম্মদ কুরাইয, আর-রিয়া'আতুল ইজ্‌তিমা'ইয়াহ লিল আহ্‌দাছিল জানিহাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২

৪২. আব্দুল হামীদ আশ-শাওয়ারাবী, জারাঈমূল আহদাছ, আর-ইস্কান্দারীয়া : দারুল মাতবা'আতিল জামি'ঈয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ২১; আব্দুল হাকিম সরকার, অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৪৩. ড. এ. এইচ, এম, মোস্তাফিজুর রহমান, সামাজিক সমস্যা, ঢাকা : লেখা-পা, ২০১১ খ্রি., পৃ. ২৮৬

৪৪. আহ্‌মাদ মুহাম্মদ কুরাইয, আর-রি'আয়াতুল ইজ্ তিমা'ইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮৪; আনোয়ার মুহাম্মদ আশ-শুরকাবী, ইনহিরাফুল আহ্‌দাছ, আল-কাহেরা : দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ৯৯-১০৮; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৪৫. আস-সুয়ূতী, শারহু সুনানিন নাসাঈ, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী তা.বি., খ. ৮, পৃ ২২৬; শায়খাইন এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح), আল-হাকিম আন-নায়শাপুরী, আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন, অধ্যায় : আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ : আদ্ দু'আ ওয়াত তাকবীর ওয়াত তাহলীল

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا "দরিদ্রতা কুফরী ডেকে আনে।"[৪৬]

তেমনিভাবে সম্পদের প্রাচুর্যের অপব্যবহার শিশু-কিশোরদেরকে অন্যায়, অপকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত হতে সহায়তা করে।

মহান আল্লাহ এ বাস্তবতাকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন,

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ،

"আল্লাহ তার বান্দাদেরকে জীবনোপরকণে প্রাচুর্য দিলে তারা জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো।"[৪৭]

সামাজিক কারণ

কিশোর অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। বিধায় আবাসিক পরিবেশ, সঙ্গীদের প্রভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি সামাজিক উপাদানগুলো শিশু-কিশোরদের আচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ক. আবাসিক পরিবেশ : শিশু-কিশোরদের নৈতিক ও সামাজিক আচরণের উপর আবাসিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্যই বাসস্থানের অনুপযুক্ত পরিবেশ (যেমন ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকা) কিশোর-কিশোরীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ধাবিত করতে পারে। বিভিন্ন আবাসিক এলাকার উপর পরিচালিত গবেষণামূলক জরিপে প্রতীয়মান হয় যে, বস্তি এলাকার বিরাজমান সামাজিক পরিবেশই অপরাধমূলক আচরণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কেননা বস্তি এলাকার লোকজন সাধারণত অস্থায়ী বাসিন্দা হয় এবং তারা ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সংযোগ ও সংহতি থাকে না। এরূপ পরিবেশে শিশুরা গৃহের বাইরে অবাধে অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়।[৪৮]

খ. সঙ্গদল : কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে সঙ্গদলের প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিশোর-কিশোরীরা এই বয়সে পরিবারের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলতে চায় এবং পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা অত্যন্ত সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, যা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে তা করতে পারে না।[৪৯] সুতরাং সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ অসৎ প্রকৃতির বা অপরাধপ্রবণ থাকলে তাদের

ওয়াত তাসবহি ওয়ায যিকর, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ : ২য় সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ৪৯২, হাদীস নং ১৮৯৯

৪৬. আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : আল-হাছ্ছু 'আলা তারকিল গিল্লি ওয়াল হাসাদ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১৪, পৃ, ১২৫, হাদীস নং ৬৩৩৬; হাদীসটির সনদ য'ঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সিলসিলাতুল আহ্দাছিল যা'ঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাছছায়্যি ফীল উম্মাহ, রিয়াদ : দারুল মা'আরিপ, ১৪১২ হি., হাদীস নং ৪০৮০

৪৭. আল-কুরআন, সূরা আশ্ শূরা, আয়াত : ২৭

৪৮. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ২১২

৪৯. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ, পৃ. ৬৫২

প্রভাবে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।[৫০] রাসূলুল্লাহ (সা) ভাল ও খারাপ প্রকৃতির সঙ্গীর সাথে উঠা-বসার বাস্তব পরিণতি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরে বলেন,

وَمَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَّمْ يَصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيْحِهِ

وَمَثَلُ جَلِيْسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ إِنْ لَّمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ ٠

ভাল মানুষের সাহচর্য লাভকারী ব্যক্তি মিস্‌ক সুগন্ধিদ্রব্য বিক্রেতার ন্যায়। সে যদি তোমাকে মিস্‌ক নাও দেয়, তবে এর একটু ঘ্রাণ তোমার নিকট পৌঁছবেই। আর মন্দ লোকের সাহচর্য অবলম্বনকারী কর্মকারের ন্যায়। কর্মকারের হাপরের ময়লা তোমার গায়ে না লাগলেও একটু ধুয়া হলেও তোমার গায়ে লাগবে।[৫১]

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা : সামাজিক পরিবেশে পরিবারের ভূমিকার পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব শিশু-কিশোরদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এসকল প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যেমন শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, সততা, আন্তরিকতা, ছাত্র শিক্ষকের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চেতনা কার্যত অনুপস্থিত।[৫২] এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য গঠনমূলক চিত্তবিনোদন, খেলা-ধুলার সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও প্রকট।

সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি শিশু-কিশোরদের রুচি ও সামর্থ্যের অনুপযোগী হলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তারা নানা অপরাধমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের মানসিক তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। যেমন স্কুল পালিয়ে তারা রাস্তায় ঘোরাফিরা করে এবং ইভটিজিং, আত্মহত্যা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও বিপণনসহ নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

ঘ. সামাজিক শোষণ বঞ্চনা : বর্তমানে জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পেশা গ্রহণে ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারার কারণে সামাজিক শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়। ফলে তাদের মনে তীব্র হতাশা ও নৈরাশ্য দানা বাঁধে, যা এক পর্যায়ে সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও আক্রোশে রূপ নেয়। এমন পরিস্থিতিতে এই ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং অপরাধমূলক আচার আচরণে লিপ্ত হয়।[৫৩]

---

৫০. আদনান আদ-দূরী, আস্‌বাবুল জারীমা ওয়া তবী'আতুস সুলূকিল ইজরামী, কুয়েত : মানশুরাতু যাতিস সালাসিল, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৩০৬; আনোয়ার মুহাম্মদ, ইনহিরাফুল আহদাছ, আল-কাহেরা : দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ১১৫-১১৬

৫১. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : মান ইয়ুমারু আন ইয়ুজালিসা, খ. ৩, পৃ. ১৮৬-১৮৭, হা-৪৮২৯; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩২৯; হাদীস নং ৪৮২৯

৫২. আব্দুল হাকিম সরকার, অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৫৩. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩; ইব্‌রাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

ঙ. ভৌগোলিক পরিবেশ : কিশোর অপরাধের সাথে ভৌগোলিক পরিবেশের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন মরু এবং গ্রীষ্ম প্রধান এলাকার মানুষ সাধারণত রুক্ষ স্বভাবের ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে থাকে। এছাড়াও অরণ্যে ঘেরা দুর্গম পাহাড়ী এরাকা, চরাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকার কিশোর-কিশোরীরা তুলনামূলক অপরাধপ্রবণ হয়।[৫৪] অপরাধবিজ্ঞানী ডেক্সটারের মতানুযায়ী, বায়ুর চাপের সাথে মানুষের স্নায়ুবিক চাপ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং তার ফলে ব্যারোমিটারে পারদের উঠা-নামার সাথে অপরাধ প্রবণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।[৫৫] অন্যদিকে জলবায়ুর প্রভাবজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক শিশু-কিশোর পারিবারিক পরিবেশের বাইরে উদ্বাস্তু ও ভাসমান হিসেবে বেড়ে উঠে। বিধায় জীবনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এসব কিশোরের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৫৬]

চ. ঘন ঘন কর্মসংস্থান পরিবর্তন : পিতা-মাতার ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে শিশু-কিশোররা নতুন নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সহজেই তা অনুসরণ করতে পারে না এবং তাদের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠে। ফলে এটি শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়।[৫৭]

ছ. গণমাধ্যমের প্রভাব : বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন মোবাইল, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, ইউটিউবের ন্যায় গণমাধ্যমগুলো শিশু-কিশোরদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই উক্ত গণমাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা যথেষ্ট সচেতন না হলে কোমলমতি শিশু-কিশোররা অপরাধে লিপ্ত হতে পারে। বিশেষ করে কুরুচিপূর্ণ যৌন আবেগে ভরপুর ম্যাগাজিন ও পত্রিকা কিশোর-কিশোরীদের মন-মানসিকতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যৌন রসে সিক্ত সিনেমা, বিজ্ঞাপন চিত্র, ফ্যাশন শো-এর নামে টেলিভিশনে প্রদর্শিত যৌন আবেদনময়ী অনুষ্ঠানমালা আবেগেপ্রবণ করে তোলে।[৫৮] এছাড়াও টেলিভিশনে প্রদর্শিত দুঃসাহসিক অভিযাত্রার সিরিয়াল কিশোরীরা অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।[৫৯] অধুনা সাইবার ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীরা আশঙ্কাজনক হারে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।[৬০]

---

৫৪ ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, সামাজিক সমস্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৫৫. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৫৭. ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৫৮. আলী মুহাম্মদ জা'ফর, আল-আহদাছ আল-মুনহারিফুন, বৈরূত : আল-মু'য়াসসাতুল, জামি'ইয়্যাহ, ১৪০৫ হি., পৃ. ৮৭; আদনান আদ-দূরী, আসবাবুল জারীমা ওয়া তরিয়াতুস সুলূকিল ইজরামী, পৃ. ৩৩৮; আহমাদ মুহাম্মদ কুরাইয, আর-রিয়া'আতুল ইজতামা'ইয়াহ লিল আহদাছিল জানিহাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

৫৯. আব্দুল হাকিম সরকার, অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০, ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, সামাজিক সমস্যা, প্রাগুক্ত, ২৭৮-২৭৯; ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

৬০. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

জ. মাদকাসক্তি : মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তিও অনেক ক্ষেত্রে কিশোর অপরাধের উৎপত্তি ঘটায়। মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হতে পারে।[৬১] এছাড়াও মাদকদ্রব্য পাচার ও বিপণনের কাজে কিশোর-কিশোরীরা জড়িত থাকার কারণে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটতে পারে এবং দেখা দিতে পারে নানা ধরনের অপরাধ। এজন্যই মাদকদ্রব্যকে বলা হয়েছে, ...অর্থাৎ সকল প্রকার খারাপ কাজের সূতিকাগার।[৬২]

সর্বোপরি মাদকাসক্তি মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাত থেকে বিমুখ করে রাখে এবং পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ٠

"শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?"[৬৩]

মদপানের ভয়াবহতা ও অনিষ্টতার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'উছমান রা. বলেন, 'পূর্ববর্তীকালে একজন ভালো লোক সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত। একজন মহিলা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ক্ষতি করার ইচ্ছা করলো। তখন সে তার দাসী পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে আনল। লোকটি মহিলার ঘরে প্রবেশ করলে সে দরজা বন্ধ করে দিল। একজন সুন্দরী মহিলা, একটি সুদর্শন বালক ও এক পেয়ালা মদ দেখিয়ে মহিলাটি বললো, আমি প্রস্তাব করব, তার কোন একটি গ্রহণ না করলে তোমার মুক্তি নেই। হয় এই সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করতে হবে, নয়তো এ সুদর্শন বালককে হত্যা করতে হবে, আর না হয় মদ পান করতে হবে। লোকটি ভেবে দেখল, তিনটি অপরাধের মধ্যে মদ পান অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ। অতএব, লোকটি মদ পান করার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর সে বললো, আমাকে মদ দাও। তখন তাকে মদ পান করতে দেয়া হলো। সে অধিক মদ পান করে সম্পূর্ণভাবে মাতাল হয়ে গেল। এরপর সে ঐ সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করলো এবং এক পর্যায়ে বালকটিকেও হত্যা করলো।'[৬৪]

---

৬১. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৬২. ইমাম আদ-দারাকুতবী, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-আশরিবা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি., খ. ৪, পৃ. ১৬১, হাদীস নং ৪৫৬৬

৬৩. আল-কুরআন, সূরা আল্ মায়িদাহ্, আয়াত : ৯১

৬৪.

اِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسلَتْ اِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ اِنَّا نَدْعُوْكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُوْنَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيْئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّى وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ اَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِىْ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيْدُوْنِىْ فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ ـ

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মদ পানকারী শুধু নির্দিষ্ট একটি অপরাধের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তার দ্বারা অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে মানসিক গুণাবলির সুষ্ঠু বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের অভাবে শিশু-কিশোররা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। এজন্যই প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড[৬৫] অবদমিত কামনাকে অপরাধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬৬] এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "বেশির ভাগ নিষ্ঠুরতার জন্ম হয় শৈশবকালীন বঞ্চনা এবং নিপীড়নের কারণে। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হলে মনের কোমল অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে তার বদলে জন্ম নেয় হিংসা, নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব।"[৬৭] এছাড়া ব্যক্তিগত আবেগীয় সমস্যাও কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের কিশোররা খুব সহজেই অনিয়ন্ত্রিত আবেগে আক্রান্ত হয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুখ ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হয় এবং অপরাধ সংগঠন করে।[৬৮] এজন্যই মার্কিন মনোবিজ্ঞানী হিলে ও ব্রুনার কিশোর অপরাধের জন্য বাধাগ্রস্ত আবেগকে দায়ী করেছেন।[৬৯]

কিশোর অপরাধ সংগঠনে উপর্যুক্ত কারণগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় থাকতে পারে। তবে কিশোর অপরাধের প্রধান ও মূল কারণ হলো মানসিক। কেননা মানুষের প্রতিটি কর্মই মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে থাকে।[৭০] আর মানসিক বিকাশ সঠিক ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না হলে শিশু-কিশোরদের আচরণে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং তাকে অপরাধ প্রবণতার

দ্রঃ ইমাম আন-নাসাই, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-আশরিবা, অনুচ্ছেদ : যিকরুল আছামি আল-মুতাওয়াল্লিদাতি আন-শুরবিল খামরি মিন তারকিস সালাওয়াত, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা. বি., পৃ. ২৮২, হাদীস নং ৫৫৭২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহ ওয়া য'ঈফু সুনানি নাসাই, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১২, পৃ. ১৬৬; হাদীস নং ৫৬৬৬

৬৫. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, Sigmund Frud, ১৮৫৬ সারের ৬ই মে মোরাভিয়ার অন্তর্গত ফ্রাইবার্গ নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জেকব ফ্রয়েড এবং মাতার নাম এ্যামিলিয়া নাথানস। তিনি ১৮৭৩ সালে ১৭ বছরে বয়সে ডাক্তারী পড়তে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৮৮১ সালে ২৫ বছর বয়সে ডাক্তারী পাশ করে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি মারা যান। দ্রঃ Encyclopedia Americana. U.S.A : Americana Corporation, 1924, vol, 12, p, 83-87; Calrin S. Hall, Frcudian Psychology, New York : The World Publishing Company, 1954, pp. 3-11; ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাত মাননীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২০৯

৬৬. Robert C. Trojanowicz, Juvenile Delinquency concepts and Controls, New Jersey : prentice Hall, Inc. 1978, p. 55.

৬৭. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৬৯. ড. এ. এইচ. এম মোস্তাফিজুর রহমান, সামাজিক সমস্যা, পৃ. ২৮৫

৭০. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্রঃ ইমাম আল-বুখারী, আস্-সহীহ, অধ্যায় : বাদউল ওয়াহী, অনুচ্ছেদ : কায়ফা কানা বদিউল ওয়াহী ইলা রাসূলিল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৯, হাদীস নং ১

দিকে ধাবিত করে। মানব মন মহান আল্লাহ্‌র এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর সুষ্ঠু লালন ও বিকাশ সাধন করলে তা ভাল কাজ সম্পাদন করে। আর লালন-পালন ও বিকাশ সাধনে ত্রুটি হলে তা দ্বারা মন্দ কর্ম বা অপরাধ সংঘটিত হয়। মনের এ বিপরীতমুখী দ্বিবিধ আচরণের বাস্তব তত্ত্ব তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا ۔ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَا ۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۔ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۔

প্রাণের শপথ, আর শপথ সে সত্তার, যিনি তাকে সুসংহত করেছেন। অতঃপর তাকে দিয়েছেন ভাল-মন্দের অনুভূতি। যে তাকে পরিচ্ছন্ন রেখেছে, সে নিশ্চিত কল্যাণ লাভ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে মলিন করেছে।[৭১]

নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَلَا وَإِنَّ الْجَسَدَ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَاوهِيَ الْقَلْبُ.

"সাবধান! শুনে রেখো, দেহ বা শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ ও ভাল থাকে তখন সমস্ত দেহ ও শরীর ভাল থাকে এবং তা যখন নষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহ ও শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটি হলো ক্বালব বা অন্তর।"[৭২]

কিশোর অপরাধের প্রতিকার

কিশোর অপরাধ প্রতিকারে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সঠিক পন্থায় শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ না হওয়ার কারণেই মূলত কিশোর অপরাধ সংঘটিত হয়। এ ছাড়াও যে সব কারণে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কিশোর অপরাধ প্রতিকার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে তার প্রতিকার করেছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় ইসলাম বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আর সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় নিয়েছে বাস্তবসম্মত নানা পদক্ষেপ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে বুঝায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যেসব কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়, সেগুলোকে আগে থেকে দূর করাই এ পর্যায়ের

---

৭১. আল-কুরআন, সূরা আশ শামস, আয়াত : ৭-১০

৭২. দ্রঃ ইমাম আল-বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ফাদুল মান্ ইসতিবরাহা লি দীনিহি ঈমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩, হাদীস নং ৫২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি ইবন মাজাহ, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ৪৮৪, হাদীস নং ৩৯৮৪

অন্তর্ভুক্ত।[৭৩] মানবজীবন কতগুলো স্তর বা ধাপের সমষ্টি। জীবন পরিক্রমায় এই স্তর বা ধাপ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। শিশু-কিশোরদের জীবন-প্রকৃতি বড়দের থেকে আলাদা। তাদের চাহিদা এবং বিকাশকালীন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও ভিন্নতর। বিধায় পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা যেন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য যেসব কার্যকারণ অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে তাদেরকে উৎসাহিত করে অথবা তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাদেরকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর কতিপয় আবশ্যকীয় দায়িত্বারোপ করেছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. পরিবারের দায়িত্ব

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উত্তম স্থান হলো পরিবার। জন্মের পর শিশু পারিবারিক পরিবেশে মাতা-পিতার সংস্পর্শে আসে। শিশুর সামাজিক জীবনের ভিত্তি পরিবারেই রচিত হয়। তাই তাদের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এজন্যই ইসলাম শৈশবকাল থেকে ঈমানের শিক্ষা, 'ইবাদতের অনুশীলন, ইসলামের যথার্থ জ্ঞানার্জন ও নৈতিকতা উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে পরিবারের উপরে। যাতে করে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোররা অপরাধমুক্ত থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এবং তাদের পরিজনদের অপরাধমুক্ত জীবন-যাপন করার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا۔

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"[৭৪]

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম কুরতুবী রহ. লিখেছেন যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, সমস্ত কল্যাণকর জ্ঞান ও অপরিহার্য শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া আমাদের কর্তব্য।[৭৫]

অনুরূপভাবে মহানবীর (সা) হাদীসেও শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিকাশ ও সামাজিকীকরণে পরিবারের দায়িত্বের বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أُهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔

৭৩. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৭৪. আল-কুরআন, আত্‌তাহরীম, আয়াত : ৬

৭৫. فعلينا تعليم او لادنا واهلينا الدين والخير ومالا يستغنى عنه من الادب দ্র: মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি'উ লি আহ্‌কামিল কুরআন, আল-কাহেরা; দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হি., খ. ১৮, পৃ. ৪২০

"প্রত্যেকেই নিজ পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানাদির অভিভাবক। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৭৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

"পিতা তার নিজের সন্তানকে যা কিছু দান করেন তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।"[৭৭]

অতএব বলা যায় যে, কিশোর-কিশোরীর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে পরিবার সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ যোগায়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। কেননা তারাই শিশু-কিশোররের সামনে বহির্বিশ্বের বাতায়ন প্রথম উন্মুক্ত করে দেয় এবং সন্তানের অনুপম চরিত্র গঠনের কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

২. ঈমানের শিক্ষা

ঈমান[৭৮] মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানবজাতিকে ঈমানের দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। জাগতিক জীবনের প্রকৃত শান্তি, বিশুদ্ধ জীবনযাত্রা, সামগ্রিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি ইত্যাদি সবকিছুর সফলতা প্রকৃত অর্থে ঈমানের বিশুদ্ধতার উপরই নির্ভরশীল। ঈমান হলো সকল প্রকার অপরাধ প্রতিরোধক। অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ঈমানের ভূমিকা অপরিসীম। যার হৃদয় মনে ঈমান সক্রিয় ও জাগরুক থাকে, সে কখনোই কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান লংঘন করে অপরাধে লিপ্ত হতে পারে না। তবে ঈমান যেমন মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত বানায়, তেমনি কুফর বানায় শয়তানের অনুসারী। যারা নিজেদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করবে, তারাই শয়তানের প্ররোচনায় সকল প্রকারের পাপকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে।

আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ .

---

৭৬. ইমাম আল-বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : আল-মারআতু রাইয়াতুন ফী বাইতি জাওযিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬, হাদীস নং ৫২০০

৭৭. ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল মাক্কিয়ীন, বাব-১৩, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৩০, পৃ. ৪২০; হাদীস নং ১৪৮৫৬, হাদীসটির সনদ সহিহ (صحيح); হাকিম আন-নায়শাপুরী, আল-মুসতাদরাক, মক্কা আল-মুকাররামা : মাকতাবাতু নিযার মুস্তফা আল-বায, ১৪২০ হি., খ. ৭, পৃ. ২৭৩৯, হাদীস নং ৭৬৭৯

৭৮. ঈমান শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস করা। পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ স. তাঁর মহান রবের থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা মনেপ্রাণে গ্রহণ ও বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে। দ্র. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-ফারহারী, আন-নিবরাস, দেওবন্দ : আল-মাকাতাবাতুল আশরাফিয়্যা, তা.বি., পৃ. ৪৬-৪৯

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। কেননা, যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের নীতি গ্রহণ করবে, শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও অপরাধমূলক কর্মেরই আদেশ করবে।"[৭৯]

কেবলমাত্র ঈমানই পারে মানুষকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে। এজন্যই শিশু-সন্তান যখন প্রথম কথা বলতে শুরু করে, তখন ঈমানের প্রশিক্ষণ হিসেবে পিতা-মাতার উচিৎ সন্তানের মুখ দ্বারা সর্বপ্রথম আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করানো। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে,

افتحوا على صبيا نكم أول كلمة بلاإله إلا الله.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রথম কথা শুরু করবে এই বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।"[৮০]

একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা।[৮১] উক্ত হাদীসে ঈমানকে শ্রেষ্ঠ কর্মরূপে চিহ্নিত করার মূলে ছিল, তার সর্বোত্তম কল্যাণের ধারক হওয়া এবং যাবতীয় অন্যায় অকল্যাণ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করা।[৮২]

এছাড়াও সন্তানদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তথা ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাতে হবে। এ বিষয়ে লুকমান হাকীমের উপদেশগুলো প্রণিধানযোগ্য। যা প্রতিটি মানবসন্তানের ঈমানকে সুদৃঢ়, কর্মকে পরিশুদ্ধ, চরিত্রকে সংশোধন ও সামাজিক শিষ্টাচারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আল-কুরআনে উক্ত উপদেশাবলি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۔

"(হে নবী, স্মরণ করো) যখন লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক গুরুতর অপরাধ।"[৮৩]

এভাবে অভিভাবকগণ পর্যায়ক্রমে সন্তানদের সামনে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো যেমন আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের প্রতিটি পর্যায় যেমন কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের পরিচয় অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে তুলে ধরে সেগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। ফলে

---

৭৯. আল-কুরআন, সূরা আন্ নূর, আয়াত : ২১

৮০. ইমাম আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : হুকমূল আওলাদ, আল-মাকতাবাতুম শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ১৮, পৃ. ১৬২, হাদীস নং ৮৩৯৭

৮১. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ العَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ দ্র: ঈমান, আল-বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : মান কালা ইন্নাল ঈমানা হুয়াল 'আমল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭

৮২. যয়নুদ্দীন ইবন রজব, জামি'উল উলূম ওয়াল হিকাম শারহু খামছীনা হাদীছান, মিসর : মুস্তফা আল-হালাবী, ১৯৬২ খ্রি., পৃ. ২১

৮৩. আল-কুরআন, সূরা লুকমান, আয়াত : ১৩

সন্তানের ঈমান হবে সুদৃঢ়। আর ঈমান দৃঢ় শিরকমুক্ত হলে নৈতিক গুণাবলি অর্জন তার জন্য অত্যন্ত সহজ হবে।

৩. ইসলামের যথার্থ জ্ঞানার্জন

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানবিক গুণাবলি উৎকর্ষিত ও বিকশিত হয়। যে জ্ঞানের কল্যাণেই মানবজাতি সমগ্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। সেটি হলো কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। আল-কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস। হাদীস তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।"[৮৪]

বস্তুত জ্ঞানার্জন দীনকে ভালভাবে উপলব্ধি করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দীনের কল্যাণ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে জ্ঞানার্জনের উপর। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে।

যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাহদের মধ্যে কেবল বিদ্বানগণই আল্লাহকে ভয় করে।"[৮৫]

সুতরাং মাতা-পিতা সন্তানকে ঈমানের শিক্ষা প্রদানের পর ইসলামের যথার্থ জ্ঞান দান করবেন এবং তাদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলবেন। যাতে করে তারা অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা ভাল-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে অপরাধকর্ম থেকে।

৪. 'ইবাদত অনুশীলন

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে 'ইবাদতের রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। 'ইবাদত বলা হয় চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে আল্লাহ্র আনুগত্য করা। ব্যাপক অর্থে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করার নামই 'ইবাদাত।[৮৬] ইসলামের মৌলিক

---

৮৪. ইমাম ইবন মাজাহ, আস-সুনান, তাহকীক : মাহমুদ মুহাম্মাদ মাহমুদ হাসান নাস্সার, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল 'উলামা ওয়াল-হাছছু 'আলা তলবিল 'ইলম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি., খ. ১, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং ২২৪; ইমাম বায়হাকী হাদীসটির মতকনকে মাশহুর (مشهور) এবং সনদকে য'ঈফ (ضعيف) বলে আখ্যায়িত করেছেন; ইমাম আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ফী তলবিল 'ইলম, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং ১৬১২

৮৫. আল-কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮

৮৬. ড. ইউসূফ হামিদ আর-'আলিম, আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ রিয়াদ : আদ-দারুল 'আলামিয়্যাহ লিল কিতাবিল ইসলামী, ১৪১৫ হি., পৃ. ২৩৪

'ইবাদত যথাক্রমে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেকটিই মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেছে এবং প্রত্যেকটিরই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ বানানো।[৮৭] যেমন সালাত মহান আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর বান্দাহদের গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা সৃষ্টি করে। যা তাদেরকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধা দেয়।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۔

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৮৮]

সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। যা মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সাহায্য করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"[৮৯]

এভাবেই 'ইবাদত পালনের মাধ্যমে যাবতীয় অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায় ইসলাম। মাতা-পিতা শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের সালাত, সিয়ামসহ ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। যাতে করে তারা কুপ্রবৃত্তি বা শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ কর্মে লিপ্ত না হয় এবং পরবর্তী জীবনে 'ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়। শিশু-কিশোরদের উপর সালাত ফরয না হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তানদেরকে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনে প্রহারের অনুমতি দিয়ে বলেন,

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَّفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।"[৯০]

---

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৮৮. আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত : ৪৫

৮৯. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩

৯০. দ্রঃ আবূ দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত

৫. নৈতিকতার উন্নয়ন

চরিত্র মানুষের উত্তম ভূষণ। মানুষের আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যে স্বভাব প্রকাশিত হয় তাকে আখলাক বা চরিত্র বলে।[৯১] বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ইমাম গাযালী রহ. চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'চরিত্র হলো মানব মনে প্রোথিত এমন অবস্থা, যা থেকে কোন কর্ম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অনায়াসে প্রকাশিত হয়।[৯২] আর মানুষের আচার-আচরণ ও কাজ-কর্ম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা আদর্শের আলোকে গড়ে উঠলে তাকে বলা হয় নৈতিকতা। শৈশবকাল থেকেই মূলত নৈতিকতা বিকশিত হওয়া শুরু হয় এবং কৈশোরকালের শেষ পর্যায়ে গিয়ে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।[৯৩] শিশু-কিশোরের নৈতিকতার উন্নয়নে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। মা-বাবা নৈতিকতা মেনে চললে এবং শিক্ষা দিলে শিশু-কিশোররা তা অনুকরণ করে মেনে চলতে শিখবে। এভাবে তারা চরিত্র গঠনের নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারলে কিশোর অপরাধ প্রবণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চরিত্র গঠনের উত্তম গুণাবলি যেমন তাকওয়া, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, আমানতদারিতা, সবর, ইহসান, বিনয়, নম্রতা, উদারতা ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলি পরিবারের পক্ষ থেকে সন্তানকে শিক্ষা দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এ ক্ষেত্রে সন্তানকে উদ্দেশ্য করে লুকমান আ.-এর উপদেশগুলো সকল পিতা-মাতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।

যা আল-কুরআনে সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۔ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۔

"হে প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধারণ করবে, এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে; নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৯৪]

---

৯১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪ হি., পৃ. ৮১

৯২. فالخلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية দ্রঃ আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, বৈরূত : দারুল মা'আরিকা, তা.বি, খ. ৩, পৃ. ১৭৭

৯৩. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৯৪. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭-১৯

আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তানদেরকে শৈশবকাল থেকে শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, فإذا بلغ ست سنين أدب 'আর যখন সন্তান ছয় বছর বয়সে পদার্পণ করবে, তখন তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।'[৯৫]

পিতা-মাতা সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিবেন। যেমন খাবার, পানাহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও গৃহে প্রবেশের শিষ্টাচারসহ যাবতীয় আদব শিখাবেন। যা তাদের নৈতিকমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে 'উমার ইবন আবী সালামাহ (সা)-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

"হে বালক! আল্লাহ্‌র নাম বলো, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও।"[৯৬]

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও শিশু যে পরিবেশে মানুষ হবে সে পরিবেশটিকে যথাসম্ভব সবদিক থেকে স্বাস্থ্যসম্মত করে তুলতে হবে। অভাব-অনটন, পারিবারিক সমস্যা, পিতা-মাতার কলহ-দ্বন্দ্ব যেন সন্তানদেরকে স্পর্শ না করে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শিশু-কিশোরদেরকে অশ্লীল বিনোদন থেকে দূরে রাখতে সুস্থ গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন উপকারী খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আনন্দ ভ্রমণ প্রভৃতি।[৯৭] তাদের নিত্যসঙ্গী, খেলাধুলার সাথী ও বন্ধু-বান্ধব যাতে সুনির্বাচিত হয় সেদিকে পিতা-মাতাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা বন্ধু ভাল না হলে জীবন-জগৎ ও পরকাল সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলাম বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্বারোপ করেছে।

এজন্যই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভাল লোকদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

"নিজেকে তুমি তাদেরই সংস্পর্শে রাখবে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে

---

৯৫. আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, ২১৭, হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী রাহ. একে ইমাম গাযালীর 'ইহয়াউ 'উলুমিদ্দীন'-এ উল্লেখিত সে সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেগুলোর তিনি কোনো সনদ খোঁজে পান নি। (তাজুদ্দীন আস-সুবকী, তাবাকাতুশ শাফি'ইয়াতিল কুবরা, খ. ৬, পৃ. ৩১৮)

৯৬. ইমাম আল-বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-আত্'ইমা, অনুচ্ছেদ : আত-তাসমীয়াতু 'আলাত ত্ব'আমি ওয়াল আকলু বিল ইয়ামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯, হাদীস নং ৫৩৭৬

৯৭. আশ–শায়খ আস'আদ মুহাম্মদ, শু'আবুল ঈমান, বৈরূত : কালিম আত্‌তৃয়্যিব, ১৪১৮ হি., খ. ৪, পৃ. ৯৮

তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরে নিয়ো না; যার চিত্তকে বা অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।"[৯৮] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ.

"মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা বন্ধু গ্রহণ করবে, তারা যেন পর্যবেক্ষণ করে তা গ্রহণ করে।"[৯৯]

সমাজের দায়িত্ব

শিশু-কিশোররা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজেরও রয়েছে অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজে যদি অন্যায়-অনাচার অবাধে চলতে থাকে, তাহলে শিশু-কিশোররা তা অনুসরণ করে অপরাধ প্রবণ হতে পারে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে কেবলমাত্র শিশু সমাজকে উন্নত করলেই চলবে না; বরং সমগ্র সমাজের উন্নয়ন করতে হবে। সমাজের নৈতিক আদর্শ, পারস্পরিক আচরণ, কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতির মান্নোনয়ন হলে স্বাভাবিকভাবেই তখন অপরাধ সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্যই ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

"তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করবে, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, দূরবর্তী সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকাভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"[১০০]

ইসলাম সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অপকর্ম প্রতিরোধ করে সমাজকে স্থিতিশীল, শান্তিময় ও কল্যাণকর রাখার জন্য ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে বাধা

---

৯৮. আল-কুরআন, সূরা আল্ কাহফ, আয়াত : ২৮

৯৯. ইমাম আহমাদ, আল মুসনাদ, অধ্যায় : বাকী মুসনাদিল মুকাছ্ছিরীন, অনুচ্ছেদ : মুসনাদু আবী-হুরায়রাহ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১৬, পৃ. ২২৬, হাদীস নং ৭৬৮৫; ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান ও গরীব (حسن وغريب) বলেছেন এবং ইমান নববী রহ. সনদকে সহীহ (صحيح) বলেছেন; মুহাম্মাদ আত্-তাবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৩, ৮৭, হাদীস নং ৫০১৯

১০০. আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩৬

প্রদানের কর্মসূচি কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۰

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল অবশ্যই হতে হবে, যারা মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে।"[১০১]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۰

"তোমরা কল্যাণকর ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না।"[১০২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সমাজে অন্যায়, অপকর্ম হতে দেখলে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

"তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় ও গর্হিত কাজ করতে দেখলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে (বল প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। এতে সক্ষম না হলে সে যেন তার মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) প্রতিহত করে, তাতেও সক্ষম না হলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা (অপছন্দ করে/ মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা করে) প্রতিহত করার চেষ্টা করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।"[১০৩]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মু'মিনের দায়িত্ব হলো নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করবে ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যকেও ভাল কাজে উৎসাহ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন, সমাজ সেবামূলক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন ও ক্রীড়া বিষয়ক সংগঠন শিশু-কিশোরদের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

মানব জীবনে শিক্ষা একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের পরিচয় লাভের জন্য শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যক। আল্লাহকে চিনতে হলে এবং তাকে সঠিকভাবে মানতে হলে শিক্ষা

১০১. আল-কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১০৪

১০২. আল-কুরআন,সূরা আল মায়িদাহ্, আয়াত : ২

১০৩. ইমাম মুসরিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : আলঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু কাওনিন নাহী 'আনিল মুনকার মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা ইয়াযীদু, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি., খ. ১, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ৭৮

লাভের বিকল্প নেই। এছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমেই শিশু-কিশোরদের মানবিক বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়। তাদের মেধা, মনন ও রুচি উৎকর্ষ লাভ করে এবং আচার-আচরণ হয় পরিশীলিত ও মার্জিত। পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে শিশু-কিশোররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং এখানেই তাদের শিক্ষার মূল ভিত রচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষায়তনে শিশু যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, পরবর্তী জীবনে তার চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে তাই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। শিশু-কিশোররা তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে যা শিখে তাই তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। পারিবারিক পরিবেশে যদি এর সমর্থন মিলে তাহলে তা তার চরিত্রে প্রোথিত হয়ে যায়। অতএব, অভিভাবক যদি মনে করেন যে, নৈতিকতা সম্পন্ন করে তিনি তার সন্তানকে গড়ে তুলবেন তাহলে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সহপাঠী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ; তাদের জীবন-দর্শন, তাদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষযগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা এগুলো শিক্ষার্থীর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) বলেছেন,

اِنّ هذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ .

"নিশ্চয়ই এই 'ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং কার নিকট থেকে দীন গ্রহণ করছ তা সতর্কতার সাথে দেখে নিবে।"[১০৪]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেখান-সেখান থেকে এবং যার-তার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ সমীচীন নয়। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকের মান কাঙ্ক্ষিত না হলে শিশু-কিশোররা বিপথগামী হতে পারে। ইসলাম জ্ঞানার্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং শিক্ষালাভকে সকলের মৌলিক ও অনিবার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। উত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। আল-কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে শিক্ষার বিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ .

"আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনান, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করেন, তোমাদেরকে

---

১০৪. ইমাম মুসরিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, খ. ১, পৃ. ১৪; ইবনু সীরান রহ. এর উক্তি হিসেবে এটি সহীহ (صحيح), যেমনটি আল-আলবানী মিশকাতুল মাসাবীহ-এর তাহকীক-এ উল্লেখ করেছেন। মিশকাতুল মাসাবীহ, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং ২৭৩; তবে এটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস হিসেবে খুবই দুর্বল (ضعيف جدا); দ্র. আর-আলবানী, সিলসিলাতুয যঈফাহ, হাদীস নং ২৪৮১

আল-কিতাব (আল-কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। আর যা তোমরা জানোনা, সেগুলো শিক্ষা দেন।"[১০৫] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ٠

"(তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকেই কিছু কিছু লোক বের হতো, যাতে করে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানাশীলন করতো, অতঃপর যখন তারা নিজ নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা সতর্ক করতো, যাতে করে তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে) বিরত থাকতে পারে।[১০৬]

এই আয়াতটি ইমাম কুরতুবী রহ. জ্ঞান শিক্ষার মৌলিক দলীল হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১০৭] আলোচ্য আয়াতে 'ইলম শিক্ষার প্রকৃতি, পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব কী হবে তা বলে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে মানবতার জন্য কল্যাণকর ও উপকারী জ্ঞান শিক্ষা প্রদানের নির্দেশনা হাদীসেও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِّنْ أَقْطَارِ الأَرَضِيْنَ يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا ٠

"মানুষেরা তোমাদের অনুসরণ করবে এবং দীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করার জন্য বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে তোমাদের কাছে ছুটে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা তাদেরকে কল্যাণকর উপদেশ (শিক্ষা) দিবে।"[১০৮]

অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শিশু-কিশোরদের উপযোগী কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচী, উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা সহায়ক কার্যকম নিশ্চিত করতে পারলে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখা যাবে এবং তারা নৈতিক মানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

রাষ্ট্র বা সরকার সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের অধিবাসীরা তাদের সামাজিক জীবনের আইন-শৃংখলা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। সরকার বিভিন্ন রকম আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসরত

---

১০৫. আল-কুরআন,সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫১

১০৬. আল-কুরআন,সূরা আত্ তাওবাহ্ , আয়াত : ১২২

১০৭. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আর-জামিউ' লি আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৬০৪

১০৮. ইমাম আত-তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীল ইসতীসাই বিমান তৃলাবাল 'ইলমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬০, হাদসি নং ২৬৫০; হাদসিটির সনদ য'ঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহ ওয়া য'ঈফু সুনানিত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫০, হাদীস নং ২৬৫০

নাগরিকদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়। বিধায় শিশু-কিশোরদের সামাজিক বিকাশ রাষ্ট্র দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ শিশু-কিশোর একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আজকের শিশু আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের একটি অংশ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে অপরাধে লিপ্ত হোক এবং সমাজকে কলুষিত করুক এটি কারো কাম্য নয়। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সরকার শিশু-কিশোরদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন সব শিশু-কিশোরের জন্য শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ অবারিত করা এবং পাঠ্যসূচীতে নৈতিকতার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিশুপার্ক, শিশু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ও খেলার মাঠ গড়ে তোলা এবং গণমাধ্যমে অশ্লীলদৃশ্য প্রদর্শন আইন করে বন্ধ করা। অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোরদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়াও রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অন্যায় অপকর্ম প্রতিরোধ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাষ্ট্র কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারে যাবতীয় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে। যা সমাজে কার্যকর করতে পারলে কিশোর অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। সেজন্যেই ইসলাম রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য কিছু মৌলিক কর্মসূচি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۔

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।"[১০৯]

উক্ত আয়াতে সালাত কায়েমের নির্দেশের মাধ্যমে সমস্ত শারীরিক 'ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, সরকার রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য শারীরিক 'ইবাদত পালনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করবে, যাতে করে শিশু-কিশোরসহ প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা আদায় করতে পারে। তেমনি যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোর সহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করবে। সকল প্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন এবং সমস্ত খারাপ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দান ও তা মূলোৎপাটন করা রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য।

১০৯. আল-কুরআন,সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ৪১

সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

কিশোর অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হলো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা। যে সকল কিশোর-কিশোরী অল্প বয়সের কারণে এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার হয়ে অপরাধকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই অপরাদের সম্ভাব্য সকল পথ বন্ধ করতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পন্থা অবলম্বন করেছে। এরপরও যদি মানবীয় দুর্বলতা ও শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে অপরাধের কারণ, অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিবেচনায় নিয়ে শিষ্টাচারমূলক তা'যীরী শাস্তি প্রয়োগ করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সংশোধনের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। যাতে করে তারা পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে।

কিশোর অপরাধের বিচারকাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় বয়স্কদের মতো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা না করে সহানুভূতিশীল ও সংশোধনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিশোর আদালতে বিচার পরিচালনা করাই শ্রেয়। শিশু-কিশোরদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশনা মহানবীর (সা) হাদীসেও পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ٠

"যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১১০]

কিশোর আদালতের উদ্দেশ্য কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধান ও শুনানী সম্পন্ন করে সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে বিচারের রায় দেয়া। অপরাধে লিপ্ত শিশু-কিশোরদের কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত রেখে সামাজিক পরিবেশে আত্মশুদ্ধির সুযোগ প্রদান এবং একজন উপার্জনক্ষম ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের আইনসম্মত সুযোগ প্রদানকে প্রবেশন বলা হয়।[১১১] এ ধরনের সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে অপরাধী কিশোরদের নিয়মিত শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলা হয়।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম শিশু-কিশোরদের দায়মুক্তি নীতি গ্রহণ করেছে। তবে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের অপরাধমূলক আচরণ

---

১১০. ইমাম আত্-তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-বির-ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী রহমাতিস সিবইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬, হাদীস নং ১৯১৯; হাদীসটির সনদ সহীহ, হাকিম আন-নায়শাপুরী, আল-মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৬২৫, হাদসি নং ৭৩৫৩

১১১. V.V. Devasia & Leelamma Devasia, Criminalogy Victimology and Corrections, New Delhi : Ashish Publishing House, 1992, p. 45.

সংশোধনের জন্য তা'যীরী বা শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে।[১১২] যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে পেশাদার অপরাধীতে পরিণত না হয় এবং তাদেরকে দেখে সমাজে অন্য শিশু-কিশোররাও অপরাধকর্মে জড়িয়ে না পড়ে।[১১৩] তা'যীরী শাস্তি প্রদানের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَّفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ·

"তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।"[১১৪]

হুদূদ ও কিসাস পর্যায়ের কোন অপরাধ কিশোর-কিশোরীরা সংগঠন করলে তাদেরকে ইসলামী শরী'আহ নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করা যাবে না। কেননা তারা শরী'আতের দায়-দায়িত্ব মুক্ত হওয়ায় শাস্তিযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে 'উমার (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

لا قود ، ولا قصاص، ولا قتل ، ولا حدولا نكال ، على من لم يلغ الحلم، حتى يعلم ماله فى الاسلام وما عليه ـ

"অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে তার জন্য এবং তার উপরে আরোপিত দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে না জানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর হদ্দ, কিসাস ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।"[১১৫]

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কিশোর অপরাধ একটি জটিল ও মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে কিশোর অপরাধ প্রবণতার কারণগুলোকে পর্যালোচনা করলে যে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় তা হলো, শিশু-কিশোররা বংশগতির মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে অপরাধ প্রবণতা লাভ করে না, যেমন কিছু রোগ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিশোর অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকগুলো কারণ সম্পৃক্ত। যেমন পারিবারিক ভাঙন, গৃহের খারাপ পরিবেশ, অসৎ সঙ্গ, পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, গণমাধ্যমে কুপ্রভাব ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বা মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা ইত্যাদি। তবে প্রবৃত্তির অনুসরণে মনের চাহিদানুযায়ী যা ইচ্ছা তা করাই কিশোর অপরাধের মূল কারণ। কেননা মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাল-মন্দ প্রতিটি কর্ম সম্পাদিত হয়। আর অন্যান্য কারণগুলো মনকে

১১২. আর-কাসানী, বাদাইউস সানাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৩-৬৪
১১৩. ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির, আত্-তা'যীরু ফিশ শারী'আলি ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১১৪. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত
১১৫. আবু বকর আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ বৈরূত : ১৩৯২ হি. ১ম সংস্করণ, খ. ৯. পৃ. ৪৭৪

প্রভাবিত করে। মানুষের মনের সঠিকতার উপর নির্ভর করে আচরণের সঠিকতা। মন যখন ঈমান, যথার্থ 'ইলম, 'ইবাদত ও নৈতিক গুণাবলি দ্বারা সুশোভিত হবে, তখন ব্যক্তির সমস্ত কাজকর্ম সুন্দর হবে।

সন্তানের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারে তার পরিবার। কেননা শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সুশিক্ষা, সচ্চরিত্র এবং লালন-পালন সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিকারে ইসলাম দু'ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তা হলো প্রতিরোধের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করা এবং অপরাধ সংঘটনের পর শিষ্টাচারমূলক শাস্তি প্রয়োগে কিশোর-কিশোরীকে সংশোধন করা।

অতএব, সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিকার করতে হলে ইসলামের বিধি-বিধানকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে মেনে চলা ও কার্যকর করা একান্ত কর্তব্য। একমাত্র ইসলামী বিধি-বিধানই হতে পারে কিশোর অপরাধ প্রতিকারের সর্বোত্তম পন্থা। আর সেদিকেই প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

"এই হচ্ছে আমার অবলম্বিত সরল-সঠিক পথ। অতএব, তোমরা তারই অনুসরণ কর। এছাড়া অন্যান্য যেসব পথ রয়েছে, তা অনুসরণ করবে না। করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে ভিন্নতর পথে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন। আশা করা যায়, তোমরা বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে।"[১১৬]

কবির ভাষায় :

যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ন-মুকুট দেই আনি,
নতুন পৃথিবী-তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী।[১১৭]

"Were there any to receive it,
We would give a royal throne;
A new world we have to offer
Were an earnest seeker known"

---

১১৬. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১৫৩
১১৭. শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া-আল্লামা ইকবাল, পৃ. ৬৬

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

মাযহাব : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম*

[**Abstract:** *Madhab is an Islamic ideological terminology. It is a school of thought within fiqh (Islamic jurisprudence). Muslim scholars explained the etymological meaning of the Quran and Sunnah according to their ijtihad for them who are not higher educated in Islamic knowledge. Next time, these activities are known as madhab. In the beginning of Islam, many madhab were in the muslim world, but four madhab (Hanafi, Maliki, Shafi and Hanbali) are alive now. Every Madhab has individual characteristics, fundamental policies, rules and regulations. For this reason, each madhab is different from other; but all of these come from the Quran and Sunnah. In this article it will be tried to give a short comparative discussion about four madhabs.*]

শব্দ সংকেত : *মাযহাব, তাকলীদ, ফতোয়া, ফকীহ, উসূল, ইজতেহাদ।*

ভূমিকা

মাযহাব একটি ইসলামী পরিভাষা। ইসলামের সূচনা কাল হতে এ শব্দটি ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে ওতপ্রোত জড়িত থাকলেও সাম্প্রতিককালে এটি একটি বহুল আলোচিত শব্দ। নানা শিরোনামে, উপনামে চলছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। কেউ কেউ মুক্ত চিন্তার উন্মাদনায় মাযহাবকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। আবার কেউ কেউ মাযহাবকে দীন বা দল মনে করে এক মাযহাবের লাগামহীন ভালবাসায় বিভোর হয়ে অন্য মাযহাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। মূলত মাযহাব কোন দীন নয়, কোন দলও নয়। মাযহাব আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশনার বাস্তব প্রতিফলন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ

'যদি তোমরা না জান তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।'[১] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, (إنما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ) 'নিশ্চয় অক্ষমতার আরোগ্য হলো প্রশ্ন করা।'[২] মানব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যার সঠিক সমাধান বের করতে মহান ইমামগণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্মপন্থার যে পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়েছিলেন তাই পরবর্তীকালে মাযহাব নামে

---

* এম. ফিল. গবেষক, আলহাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. সূরা নাহল, আয়াতঃ ৪৩।

২. আবু দাউদ, *আসসুনান* (দারুর রিসালা আলআলামিয়্যা, ২০০৯), খ. ১, বাবঃ ১২২, হাঃ নং ৩৩৬। হাকেম, *মুসতাদরাক*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৯৯০), খ. ১, হাঃ নং ৬৩০। ত্বরানী, *আলমুজামুল কাবীর* (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, ১৯৯৪), খ. ১১, হাঃ নং ১১৪৭২।

প্রচলিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরবর্তী যুগে ওহী অবতরণ বন্ধ হওয়ার ফলে কোন সমস্যার সমাধান প্রদানের জন্য সাহাবীগণ কুরআন সুন্নাহকে সামনে রেখে ইজতেহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ইজতেহাদের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ সাহাবীদের গৃহীত মূলনীতির ভিন্নতার কারণে একই মাসয়ালার জবাবে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়। আর একেকটি মতই মূলত একেকটি মাযহাব। মাযহাব নতুন কিছু নয়, যাকে বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করা যায়। মাযহাবের উৎপত্তি সাহাবীদের যুগ থেকেই। পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত চার মাযহাবের ব্যাপ্তি রয়েছে। প্রতিটি মাযহাবের রয়েছে স্বতন্ত্র মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য। উম্মত এসব মাযহাবকে যুগযুগ ধরে গ্রহণ করে নিয়েছে।

মাযহাব পরিচিতি

মাযহাব শব্দটি আরবি। অর্থ: মত, পথ, ধর্ম, ধর্মমত, মতবাদ, আদর্শ, বিশ্বাস,[৩] পদ্ধতি, মতাদর্শ, তরিকা, পন্থা, উৎস, মূল,[৪] এছাড়াও ভাষাতত্ত্ববিদগণ এর বিভিন্ন বর্ণনা করেছেন-

- المعتقد الذي يذهب إليه 'নির্দিষ্ট মতাদর্শ, যার উপর চলা হয়।'[৫]
- الطريقة পন্থা, রাস্তা। যেমন বলা হয়–ذهب فلان مذهبا حسنا أى طريقة حسنة
'লোকটি সুন্দর মাযহাবে চলল, অর্থাৎ সুন্দর রাস্তায় চলল।'[৬]
- الأصل মূল, যেমন– ما يدرى له أين مذهبه. ولا يدرى له مذهبه – أى لا يدرى أين أصله
'তার মাযহাব কোথায় তা জানা যায় না। অর্থাৎ তার মূল কোথায় তা জানা যায় না।'[৭]
- এ ছাড়াও মাযহাব শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৮] যেমন–

مذهب ، مدرج، مسلك ، ممر، مخيط ، منهاج ، مهيع ، محجة ، طريقة، سبيل ، صراط، شارع، فج ، خط ، دليل ، مورد ، جدر.

পরিভাষায় মাযহাব হলো উম্মাহ্‌র প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, স্মৃতিধর, ইজতেহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন গবেষক আলেম কর্তৃক শরঈ নীতিমালার আলোকে নব উদ্ভূত সমস্যার সুবিন্যস্ত সমাধান।

মাযহাবের পরিচয় সম্বন্ধে বিখ্যাত অভিধান আল মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

---

৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আলমুজামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৯১৭।

৪. আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াবী, *মিসবাহুল লুগাত* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ২৮৭।

৫. মুহাম্মাদ আল হুসাইনী, *তাজুল আরুছ* (দারুল হিদায়া,তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৪৫০। ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারুস সদির, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ১৯৪; ইবরাহীম ও বন্ধুগণ, *আলমুজামুল ওয়াসিত* (দারুদ দাওয়া, তাবি.), খ. ১, পৃ. ৩১৭; মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী, *আলকামুসুল মুহিত* (বৈরুত: মাওসুয়াতুর রিসালা, ২০০৫), খ. ১, পৃ. ৮৬।

৬. *প্রাগুক্ত*

৭. *প্রাগুক্ত*

৮. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক, *আল-মুরাদিফ* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ১৩১।

مَجْمُوعَة من الآراء والنظريات العلمية والفلسفية ارْتبط بَعْضهَا بِبَعْض ارتباطا يَجْعَلهَا وحدة منسقة ·

'মাযহাব হলো নির্দিষ্ট কিছু মতামত, জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের সমষ্টি, যা পরস্পর একে অপরের সাথে মিলে মিশে একটি সুবিন্যস্ত মতাদর্শে পরিণত হয়।'[৯]

উল্লেখ্য যে, মানব জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মাযহাবের প্রচলন ও ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। যেমন অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আকিদা (ধর্ম বিশ্বাস) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মাযহাব শব্দ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। ফিকহের ক্ষেত্রে মাযহাব বলতে নবুয়াতী যুগ হতে চলে আসা ফকীহ ইমামগণের কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর সুবিন্যস্ত ফিকহী সমাধানকে বোঝানো হয়। তাই মাযহাব বলতে সাধারণত হানাফী, মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবকে বোঝানো হয়।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে মাযহাবের স্বরূপ

নবুয়াতী যুগে সাহাবাগণ নামাজ, রোজা, হজ্জসহ যাবতীয় শরয়ী বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখে দেখে পালন করতেন। পরবর্তীতে সাধারণ সাহাবাগণ মাসয়ালা, ফতোয়া জানার জন্য বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ ফকীহ সাহাবাগণের শরণাপন্ন হতেন। এ ক্ষেত্রে সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্যে দুইটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ। পরবর্তীকালে ব্যক্তি তাকলিদ মাযহাব নামে প্রচলিত হয়। ইসলামী অনেক পরিভাষা যেমনঃ আকিদা, সহীহ, যয়ীফ, হাসান, মাওযু' ইত্যাদির মত মাযহাব পরিভাষার প্রচলন সাহাবীদের যুগে ছিল না। তবে এসব পরিভাষার মূলনীতি, প্রয়োগকৌশল সাহাবাদের যুগ হতে শুরু হয়েছে। সাহাবাদের মধ্যে যাদের ইলম অর্জনের পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ ছিল না, অথবা যাদের কুরআন-সুন্নাহ হতে সরাসরি মাসয়ালা জানা সম্ভব ছিল না, তারা নির্দ্বিধায় ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবাদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের দেয়া ফতোয়া অনুসারে আমল করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ، فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي لَهُ وَالِيًا وَقَاسِمًا.

'হযরত ওমর (রা) জাবিয়া নামক স্থানে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, লোক সকল! কুরআন (ইলমুল কিরাত) সম্পর্কে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে উবাই ইবনে কা'বের কাছে এবং ফারায়েয সম্পর্কে কিছু জানতে হলে যায়েদ বিন সাবেতের কাছে আর ফিকাহ সম্পর্কে কিছু

৯. ইবরাহীম ও বন্ধুগণ, *আলমু'জামুল ওয়াসিত* (দারুদ দাওয়া,তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৩১৭।

জিজ্ঞাসা করার থাকলে মু'আয বিন জাবালের কাছে যাবে। তবে অর্থ সম্পদ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার কাছেই আসবে। কেননা আল্লাহ আমাকে এর বণ্টন ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করেছেন।'[১০]

এ খুতবায় হযরত ওমর (রা) তাফসীর, ফিকাহ ও ফারায়েয বিষয়ে সকলকে বিশিষ্ট তিনজন সাহাবার মতামত অনুসরণের উপদেশ দিয়েছে। আর এটা বলাবাহুল্য যে, মাসায়েলের উৎস ও দলীল বোঝার যোগ্যতা সবার থাকে না। সুতরাং খলীফার নির্দেশের অর্থ হলো; প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা তিন সাহাবার খিদমতে গিয়ে মাসায়েল ও দালায়েল (সিদ্ধান্ত ও উৎস) উভয়ের ইলম হাসিল করবে। আর যাদের সে যোগ্যতা নেই, তারা শুধু মাসায়েলের ইলম হাসিল করে সে মোতাবেক আমল করবে। তাই সাহাবা যুগে আমরা দেখতে পাই, যাদের ইজতিহাদী যোগ্যতা ছিলো না তারা নিঃসংকোচে ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবাগণের শরণাপন্ন হতেন এবং বিনা দলীলেই তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করতেন ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (র) লিখেছেন;

وَالَّذِينَ حُفِظَتْ عَنْهُمْ الْفَتْوَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ وَنَيِّفٌ وَثَلَاثُوْنَ نَفْسًا، مَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ.

'একশ ত্রিশজন সাহাবীর ফতোয়া আমাদের কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাদের মধ্যে পুরুষ সাহাবীর পাশাপাশি মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।'[১১]

ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কখনো কুরআন-সুন্নাহ হতে সরাসরি দলীল উল্লেখ করতেন আবার কখনো শুধু সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতেন। মুক্ত তাকলীদের পাশাপাশি ব্যক্তি তাকলীদের ধারাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। অনেক সাহাবী একই সাথে একাধিক সাহাবীর ফতোয়া অনুসরণ করতেন। আবার অনেক সাহাবী নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর অনুসরণে একনিষ্ঠ ছিলেন। হযরত ইকরামা (র)-এর বর্ণনায় আছে,

أَنَّ أَهلَ المدينةِ سألوا ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما عن امرأةٍ طافَت ثم حاضَت؟ قال لهم: تَنفِرُ، قالوا: لا نأخُذُ بقولِكَ، وندَعُ قولَ زيدٍ.

'একদল মদিনাবাসী হযরত ইবনে আব্বাসকে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। তাওয়াফ অবস্থায় কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কি করবে? (বিদায়ী তওয়াফের জন্য স্রাব বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে নাকি ফিরে যাবে?) ইবনে আব্বাস বললেন, (বিদায়ী তাওয়াফ না করেই) ফিরে যাবে। কিন্তু মদীনাবাসী দলটি বললো; যায়েদ বিন সাবিতকে বাদ দিয়ে আপনার মতামত আমরা মানতে পারি না।'[১২]

---

১০. ত্ববারানী, *আলমু'জামুল আওসাত* (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা. বি), হা: নং ৩৭৮৩।

১১. ইবনুল কাইয়্যিম, *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৯১), খ. ১, পৃ.১০।

১২. বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুল হাজ্জ, হা: নং: ৮১৯।

অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

لَا نُبَالِي أَفْتَيْتَنَا أَوْ لَمْ تُفْتِنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ لَا تَنْفِرُ.

'আপনার ফতোয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। যায়ে বিন সাবিত তো বলেছেন, (তাওয়াফুল বেদা না করে) যেতে পারবে না।'[১৩]

মুসনাদে আবু দাউদের বর্ণনায় আছে,

لَنْ نُتَابِعَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا، فَقَالَ: سَلُوْا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ.

'হে আব্বাসের পুত্র! যায়েদ বিন সাবিতের মুকাবেলায় আপনার কথা আমরা মানতে পারি না। হযরত ইবনে আব্বাস তখন বললেন, (মদিনায় গিয়ে) উম্মে সুলায়ম (রা) কে জিজ্ঞাসা করো, দেখবে আমার সিদ্ধান্তই সঠিক।'[১৪]

এখানে দু'টি বিষয় পরিষ্কার হল। প্রথমত মদিনাবাসী দলটি হযরত যায়েদ বিন সাবিতের মুকাল্লিদ ছিল। তাই তাঁর মুকাবেলায় অন্য কারো মতামত তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এমনকি বুখারী, মুসলিমের বর্ণনা মতে নিজের ফতোয়ার সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস তাদেরকে উম্মে সুলায়মের হাদীসও শুনিয়েছিলেন। কিন্তু যায়েদ বিন সাবিতের ইলম ও প্রজ্ঞার উপর তাদের আস্থা এত গভীর ছিল যে, তাঁর মতের পরিপন্থী বলে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি হাদীসনির্ভর ফতোয়াও তাঁরা প্রত্যাখ্যান করল। দ্বিতীয়ত এই অনমনীয় ব্যক্তিতাকলীদের 'অপরাধে' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁদের মৃদু তিরস্কারও করেননি। বরং হযরত উম্মে সুলায়মের কাছে অনুসন্ধান করে বিষয়টি যায়েদ বিন সাবিতের কাছে পুনরুত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র। মদীনাবাসী দলটি অবশ্য সে পরামর্শ অনুসরণ করে ছিল এবং মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী শরীফের বর্ণনা মতে সংশ্লিষ্ট হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর যায়েদ বিন সাবিতেরও মতপরিবর্তন ঘটেছিল। আর সে সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাসকে তিনি অবহিতও করেছিলেন।[১৫] ব্যক্তি তাকলীদের ক্ষেত্রে একজন সাহাবীর আংশিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। হাদীস ও তারীখের কিতাবে এমন উপমা অনেক।

মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে ফকীহ সাহাবাগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে দীন ও শরীয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান করতঃ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটলে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ হিজায, সিরিয়া, মিসর, ইরাক ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। এসব এলাকায় অনেক বড় বড় ফকীহ ও মুফতী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা ফতোয়া প্রদান করতেন। মানুষেরা তাদেরকে দীন ও শরী'য়াত শিক্ষার আস্থার জায়গা বানিয়েছিল। এ সকল মুফতী ও ফকীহ্র উসূল ও নীতিমালার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। উলামাই হিজায সনদ ও মতন সংরক্ষণের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ

---

১৩. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৭ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫৮৮।

১৪. আবু দাউদ আত ত্বায়ালুসী, *মুসনাদ* (মিশরঃ দারুল হিজর, ১৪১৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ২২৩, হাঃ নংঃ ১৭৫৬।

১৫. মুসলিম, *আসসহীহ*, কিতাবুল হজ্জ, হাঃ নং-৩২২১।

করতেন। তাঁদের সাহচর্যে যে সকল ফকীহ মুফতী গড়ে উঠেছেন তাঁরাও এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ইমাম মালিক (র) ছিলেন এ সকল ফকীহ্র ইলমের ধারক ও বাহক। উলামাই ইরাক হাদীসের অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও রহস্য উদঘাটনে প্রতি অধিক জোর দিতেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিলেন অনেক ফকীহ ও মুফতী। এ সকল ফকীহ্র ইলমের উত্তরসূরি ও ধারক বাহক ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (র)। যিনি তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে ফিকহ ও উসূলে ফিকহ সংকলন করেন।

ইমাম মালিক (র)-এর পর হিজাযের ফকীহগণের শিরোমনি ইমাম শাফিঈ (র) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। একদিকে তিনি উলামাই ইরাক থেকেও শিক্ষা লাভ করেন। যার ফলে তাঁর উপর হিজায ও ইরাক উভয় স্থানের প্রভাব পড়ে। তাই তিনি উভয় স্থানের ফকীহগণের ইলমের সমন্বয় সাধন করে ফিকহ সংকলন করেন। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে আহমাদ ইবন হাম্বল (র) শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি হিজাযী ইলমি ধারায় ইলমে ফিকহ সংকলন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের যাহেরি অর্থের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র খাল্লাল তাঁর মাসাইল ও ফতোয়াগুলো 'জামিউল কাবীর' নামে ২০ খণ্ডে বিরাট গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ করেন।

এ ছাড়াও বিভিন্ন শহর এলাকায় বহু ফকীহ ও মুফতী বিদ্যমান ছিলেন। প্রত্যেক শহর ও এলাকার জনসাধারণ স্থানীয় মুফতী ও ফকীহগণের অনুসরণ করতেন। যার ফলে প্রত্যেক এলাকার মুফতীর ফতোয়া মাসাইল ঐ এলাকার জনসাধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাযহাবরূপে গৃহীত হয়। আর এভাবেই মাযহাবগুলোর উৎপত্তি ও সূচনা হয়। প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের পাশাপাশি আরো কিছু মাযহাব ছিল। পরবর্তীতে এসব মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু হানাফী, মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বলী এ চারটি মাযহাব অবশিষ্ট থাকে।[১৬]

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হানাফী মাযহাবঃ ইসলামে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে এর মধ্যে হানাফী মাযহাব সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম আবু হানীফা নোমান বিন সাবিত (র) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় হানাফী মাযহাব। ইমাম আবু হানীফা (র) ই সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়ন ও সংকলন করেন। চল্লিশ জন ফকীহ্র সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বোর্ড গঠন করে ফিকহে হানাফী রচনা ও সংকলন করেন।

মালিকী মাযহাবঃ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দ্বিতীয় মাযহাব মালিকী মাযহাব। ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) এ মাযহাবের প্রবর্তক। মদীনা মুনাওয়ারা থেকেই এ মাযহাবের উৎপত্তি হয়।

শাফিঈ মাযহাবঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের তৃতীয় ফিকহী মাযহাব হল 'শাফিঈ মাযহাব'। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস শাফিঈ (র) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। মিসরে এ মাযহাবের উৎপত্তি হয়। ইমাম শাফিঈ (র)-এর অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন মিসরীয়।

হাম্বলী মাযহাবঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামা'আতের চতুর্থ ফিকহী মাযহাব হল 'হাম্বলী মাযহাব'। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) এই মাযহাবের প্রবর্তক। বাদগাদ ছিল এ মাযহাবের

১৬. মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন, *আইম্মা আরবা'আহ*, পৃ. ১১-২১।

কেন্দ্র। প্রাথমিক পর্যায়ে এ মাযহাবের প্রচার অন্য তিনটি মাযহাবের তুলনায় কম ছিল। আল্লামা ইবন খালদুন এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ফিকহী হাম্বলীতে ইজতিহাদের ব্যবহার ছিল খুব কম। এ মাযহাবের মাসআলা মাসাইল নিরূপণে আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপরই অধিকতর নির্ভর করা হত।

চার মাযহাবের মূলনীতি

চার মাযহাবের মূলনীতিগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। ১. প্রাথমিক মূলনীতি; মাযহাবের ইমাম বা ইমামের ছাত্র কর্তৃক নির্ধারিত কর্মপন্থা। ২. সাধারণ মূলনীতি; ইমামদের কর্মপন্থা অবলম্বনে পরবর্তী ইমামগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত কর্মপন্থা। যেমন: হানাফী মাযহাবে অনেক মূলনীতি ইমাম বাযদুবী, কারখী, সারাখসী, মুহিবুল্লাহ বিন আব্দুল শাকুরসহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতিও রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের এসব সাধারণ মূলনীতি মাযহাবের কোন ইমামের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিৎ নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) যথার্থই বলেছেন,

وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه.

'এ সব মূলনীতি ইমামদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে (এসব মূলনীতির প্রবক্তা ইমামগণ নয়)। তাই ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দুই ছাত্রের সাথে সম্পৃক্ত করে এসব মূলনীতি বর্ণনা করা বৈধ নয়।'[১৭] নিম্নে ইমামগণ কর্তৃক অনুসৃত মূলনীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

হানাফী মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম আবু হানিফা (র) কুরআন থেকে দলীল গ্রহণ করতেন, কুরআনে না পেলে সুন্নাহ থেকে, সুন্নাহে না পেলে সাহাবীদের বক্তব্য খুঁজতেন, তাও না পেলে কিয়াস করতেন।

ইবনু সাবাহ (র) বলেন,

كان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وان لم يكن فيها حديث صحيح اتبع أقوال الصحابة والتابعين وإلا قاس فاحسن القياس.

'কোন মাসয়ালা ইমাম আবু হানিফা (র)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি সহীহ হাদীসের অনুসরণ করতেন, সহীহ হাদীস না পেলে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বক্তব্য অনুসরণ করতেন, তাও না পেলে বিশুদ্ধ কিয়াস করতেন।'[১৮]

নুয়াইম বিন ওমর বলেন,

---

১৭. ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, *আল ইনসাফফি বয়ানি আসবাবিল ইখতেলাফ* (বৈরুতঃ দারুন নাফাইস, ১৪০৩ হি.), পৃ. ৮৯।

১৮. ড. কামাল আব্দুল আযীম আল আনানী, *মুকাদ্দামাহ, মাবসুদ* (বৈরুত:দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ২০০৯),পৃ. ৩২।

سَمِعْت أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: عَجَبًا لِلنَّاسِ يَقُولُونَ إنِّي أَقُولُ بِالرَّأْيِ وَمَا أُفْتِي إلَّا بِالْأَثَرِ.

'ইমাম আবু হানিফা (র) কে বলতে শুনেছি, কী আশ্চর্য! মানুষেরা বলে আমি নাকি কিয়াস করে ফতোয়া দেই। অথচ আমি তো আছার (সাহাবী ও তাবেয়ীদের বক্তব্য ও আমল) ছাড়া ফতোয়া দেই না।'[১৯]

আল্লামা লু'লুঈ ইমাম আবু হানিফা (র) হতে বর্ণনা করেন,

ليس لاحد ان يقول برأية مع كتاب الله ولا مع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا مع ما اجتمع عليه الصحابة، واما ما اختلفوا فيه فنخير فى اقاويلهم أقربها الى الكتاب او السنة ونجتهد، وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأى.

'কোন ব্যক্তির কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের ঐক্যমত্যপূর্ণ বিষয়ের সাথে কিয়াস বর্ণনা করা উচিৎ নয়। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমরা কুরআন, সুন্নাহ্‌র নিকটবর্তী বক্তব্য নির্বাচন করি। অন্যথায় ইজতেহাদ করে সমাধান দেই।'[২০]

এটা ছিল ইমাম আবু হানিফা (র) মাযহাবের মূলনীতির সারকথা। ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবে এমন বর্ণনা অনেক।[২১]

মালেকী মাযহাবের মূলনীতি

মালেকী মাযহাবে মূলনীতি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আলেম আবু মুহাম্মদ সালেহ প্রসিদ্ধ ফকীহ রাশেদ (র) হতে বর্ণনা করেন,[২২]

الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر:

١- نص الكتاب العزيز.

---

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

২০. *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩০

২১. ইবনে আব্দিল বার, *আলইনতিকা ফি ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা. বি.:), পৃ. ২৬১, ২৬২, ২৬৭; সাইমারী, *আখবারু আবী হানিফা ওয়া আসহাবিহী* (বৈরুতঃ আলিমুল কুতুব, ১৯৮৫), পৃ. ১০-১৩; বাগদাদী, *তারীখে বাগদাদ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা. বি.:), খ. ১৩, পৃ. ৩৬৮; আওয়াম, *ফাযাইলু আবী হানিফা*, পৃ. ২১২৩। মুয়াফ্‌ফাক আল মক্কী, *মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা* (দায়িরাতুল মায়ারিফ আননিযামিয়া, ১৯০৩), খ.১, পৃ. ৭৪-১০০।

২২. মুহাম্মদ বিন হাসান আলফাসী, *আলফিকরুস সামী ফি তারীখিল ফিকহিল ইসলামী* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪১৬ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫; শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, *আল ইনসাফ*, পৃ. ৮০।

٢- وظاهره وهو العموم.

٣- ودليله وهو مفهوم المخالفة.

٤- ومفهومة وهو باب آخر، ومراده مفهوم الموافقه.

٥- وتنبيهه وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا.......} الآية، وومن السنة أيضًا مثل هذه الخمسة، فهذه عشرة.

والحادي عشر: الإجماع, والثاني عشر: القياس، والثالث عشر: عمل أهل المدينة، والخامس عشر: الاستحسان، والسادس عشر: الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر: وهو مراعاة الخلاف، فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه،

১. কিতাবুল্লাহর নস,

২. কিতাবুল্লাহর প্রকাশ্য অর্থের ব্যাপকতা,

৩. মাফহুমুল মুখালাফ,

৪. আয়াতের মোদ্দা কথা (মাফহুমুল মুয়াফাকাহ)

৫. কুরআনের (فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا : এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ) আয়াতের প্রতি সতর্কদৃষ্টি।

কুরআনের অনুরূপ হাদীস হতেও পাঁচটি দলীল রয়েছে। মোট দশ।

১১. ইজমা,

১২. কিয়াস

১৩. মদীনাবাসীদের আমল

১৪. ইসতেহসান

১৫. সাদ্দুয যারায়ে,

১৬. ইখতেলাফী মাসয়ালায় দলীলের শক্তি অনুসারে মত গ্রহণ করা।

শাফিঈ মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে 'কিতাবুল উম্ম' এ বলেন,

الأصل قرآن وسنة , فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم, وصحَّ الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره, وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها

إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدى منقطع ابن المسيب، ولايقاس على أصل ولا يقال للأصل لم وكيف, وإنما يقال للفرع لم, فإذا صحَّ قياسه على الأصل صحَّ وقامت به الحجة "أ. هـ بلفظه" نقله النووي بالسند المتصل في المنهاج.

'মূল হল : কুরআন-সুন্নাহ। যদি কুরআন সুন্নাহয় স্পষ্ট না থাকে তাহলে কুরআন-সুন্নাহর উপর কিয়াস করতে হবে। হাদীস মুত্তাসিল সূত্রে সহীহ সনদে বর্ণিত হলেই তা সুন্নাত। খবরে আহাদ হতে ইজমা বড়। আর সনদ বিশুদ্ধ হলে হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল হবে, তবে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা হলে প্রকাশ্য অর্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ছাড়া অন্য কারো মুনকাতি হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। মূলের উপর কিয়াস চলে না। মূলের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যায় না কেন, কিভাবে। এসব প্রশ্ন শাখা মাসয়ালার ক্ষেত্রে হতে পারে। কিয়াস শুদ্ধ হলে তা দ্বারা দলীল প্রদান শুদ্ধ হবে। ইমাম নববী মুত্তাসিল সনদে মিনহাজ কিতাবে এ উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন।'[২৩]

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি সর্ম্পকে শাহওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) বলেন,

مبدؤه قريب من مبدإ الشافعي؛ لأنه تفقه عليه حتى إن الشافعية يعدونه شافعيا، ولكن الحق أنه مذهب مستقل وأن نسبته للشافعي كنسبة أبي يوسف لأبي حنيفة غير أن مذهب أبي يوسف ألف مع مذهب أبي حنيفة، فامتزجا بخلاف أحمد، فقد ألف مذهبه مستقلا

হাম্বলী মাযহাব শাফিঈ মাযহাবের মতোই। কেননা তিনি ইমাম শাফিঈর (র) নিকট হতে ফিকহ শিক্ষা করেন। তাই শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণ তাকে শাফিঈ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে প্রকৃত পক্ষে হাম্বলী মাযহাব একটি স্বতন্ত্র মাযহাব। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে শাফিঈর সাথে সম্পৃক্ত করা, ইমাম আবু ইউসুফকে ইমাম আবু হানিফার সাথে সম্পৃক্ত করার মতো। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ইমাম আবু ইউসুফের মাযহাব ইমাম আবু হানিফার সাথে সংকলিত হয়েছে। আর ইমাম আহমাদ সতন্ত্রভাবে মাযহাব সংকলন করেছেন।[২৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র)হাম্বলী মাযহাবের পাঁচটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। ই'লামুল মুয়াক্কিয়িন গ্রন্থ হতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।[২৫]

১. কুরআনের আয়াত ও মারফু হাদীস

২. সাহাবীদের ফতোয়া

৩. সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে ফতোয়া।

---

২৩. *আল ফিকরুস সামী ফি তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৬৮।

২৪. *প্রাগুক্ত, খ.* ২, পৃ. ২৫।

২৫. ই'লামুল মুয়াক্কিয়্যিন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, ১৯৯১), খ. ১, পৃ. ২৪।

৪. মুরসাল ও সামান্য দুর্বল হাদীস গ্রহণ

৫. কিয়াস।

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মূলনীতিগুলো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ মূলনীতিগুলোর মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শাখাগত কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিছু কৌশলগত ভিন্নতা পাওয়া যায়। তবে কেউই কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্ট বর্ণিত বিষয়কে কিয়াস বা রায়ের মাধ্যমে রহিত করে নি। মূলত চার মাযহাব অস্পষ্ট বিষয় সমাধানের গতিশীল কর্মপন্থা মাত্র।

চার মাযহাব এক পরিবারের চার সদস্য

মহান ইমামগণের কর্মকৌশলের সূক্ষ্মতা, প্রশস্ততা, মনোযোগের বিশালতা, ইখলাসের নিপুণতা এবং দীনের জন্য আত্মত্যাগের সংবাদ যুগ যুগ ধরে উম্মতে মুসলিমার মনের মনিকোঠায় আস্থার জায়গা করে নিয়েছে। যেহেতু ইমামে আযম আবু হানিফা (র) হযরত আলী (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্যদের ইলমের উত্তরসূরী। যাদের দ্বারা কুফার প্রতি ঘরের কোনায় কোনায় ফিকহ ও কুরআনের ইলেম ভরপুর ছিল। তিনি চল্লিশ সদস্যের তৈরি ফিকহী ফোরামের প্রধান ছিলেন। ঐ ফোরামে ফিকাহ গবেষণা, মাসয়ালা-মাসায়েল দলীল প্রমাণের আলোকে পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হতো তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো। এটি হল ফিকহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের বিস্ময়কর পদ্ধতি। ফিকহের কারণেই ইরাকের ইলমী অবস্থান পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে। অনুরূপভাবে ইমামু দারিল হিজরাহ মালিক বিন আনাস (র) ছিলেন মদিনা মুনাওয়ারার শ্রেষ্ঠ সাত ফকীহের শিষ্যদের ইলমের উত্তরসূরী। ইমাম আবু হানিফা (র) হজ্জ ও যিয়ারতে মদিনায় আগমন করলে ইমাম মালেক (র) তাঁর সাথে ফিকহী পর্যালোচনা করতেন। তিনি ইমাম আযমের কিতাব ও তাঁর কাছ থেকে ষাট হাজার মাসয়ালা সংগ্রহ করেন, এ কারণে মালেকী মাযহাবের কতেক ইমাম কোন মাসয়ালায় ইমাম মালেক (র)-এর মত জানা না গেলে আবু হানিফা (র)-এর মত গ্রহণ করার ওসীয়ত করেন। এভাবে ইমাম শাফিঈ (র) মদিনায় ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তা এবং বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে ফিকহ শাস্ত্রের বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি মাদানী ও ইরাকী ফিকহের সমন্বয় সাধন করেন। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) আবু ইউসুফ (র)-এর কাছে তিন বছর সহচার্যে ইলমের বিশাল ভাণ্ডার অর্জন করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিতাব থেকে ফিকহী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ইউসুফ বিন খালেদ সামতি (র) সহ আবু হানিফা (র)-এর অন্যান্য শিষ্যদের থেকে ফিকহী পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি আবু হানিফা (র)-এর অন্যান্য শিষ্য এবং ইমাম শাফিঈ (র) থেকে ফিকহী ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হাদীস এবং বিভিন্ন শহরের ফুকাহায়ে কেরামের ফিকহী সমাধানে এক জীবন্ত লাইব্রেরী ছিলেন। বাস্তবে তাঁরা ইসলামী ফিকহ গবেষণার এক আত্মত্যাগী কাফেলা। ইমাম আবু হানিফা (র) ও বিশিষ্ট সাত ফকীহদের শিষ্যদের থেকে ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও মালেক রহ, ইমাম শাফিঈ এবং আবু ইউসুফ, শাফিঈ (র) থেকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ফিকহী ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য লাভ করেন।[২৬]

২৬. মুহাম্মাদ যাহেদ আলকাওছারী, *মাকালাতুল আলকাওছারী* (মিশর: দারুস সালাম, ২০০৯), পৃ. ৯৯-১০৫ (সংক্ষেপিত)।

মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম উম্মাহ্‌র মুহাক্কিক আলেমগণ একমত যে, মাযহাব অনুসরণ দীন পালনের অনিবার্য বাস্তবতা। মাযহাব অনুসরণ ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য প্রচ্ছন্ন শরয়ী বিধি-বিধান পালন করা অসম্ভব। শরয়ী প্রয়োজনে মাযহাব অনুসরণ করা জরুরী। ইমাম নববী (র) লিখেছেন-

وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ جَازَ اتِّبَاعُ أَيِّ مَذْهَبٍ شاء لا فضى إِلَى أَنْ يَلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيفِ بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مُهَذَّبَةً وَعُرِفَتْ: فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ عَلَى التَّعْيِينِ.

‘ব্যক্তি তাকলীদ অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই যে, মুক্ত তাকলীদের অনুমতি দেয়া হলে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষ সকল মাযহাবের অনুকূল বিষয়গুলোই শুধু বেছে নিবে। ফলে হারাম হালাল ও বৈধাবৈধ নির্ধারণের এখতিয়ার এসে যাবে তার হাতে। প্রথম যুগে অবশ্য ব্যক্তি তাকলীদ সম্ভব ছিল না। কেননা ফিকহ বিষয়ক মাযহাবগুলো যেমন সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ ছিল না তেমনি সর্বত্র সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু এখন তা সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ আকারে সর্বত্র সহজলভ্য । সুতরাং যে কোন একটি মাযহাব বেছে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে তা অনুসরণ করাই এখন অপরিহার্য।’[২৭]

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, পরিশেষে সারা দুনিয়ায় এ চার মাযহাবের তাকলীদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। অন্যান্য ইমামের অনুগামী আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। সর্বসাধারণ চার মাযহাবের বিরোধিতার সব দুয়ার বন্ধ করে দিল। কারণ ইলমী পরিভাষা হয়ে গেল ব্যাপক এবং লোকদের মধ্যেও লোপ পেল ইজতিহাদের মর্যাদায় উপনীত হবার যোগ্যতা। অযোগ্য ও দুর্বল অভিমতের অধিকারী আলিমগণের মুজতাহিদ বনে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এজন্য আলিমগণ নিজেদের অপারগতা ও সামর্থ্যহীনতা স্বীকার করে নিয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করতে লাগলেন। ফলে প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ইমামের তাকলীদ করতে আরম্ভ করল এবং ইমামগণের মধ্যে কারো তাকলীদ করা অবস্থায় অন্য ইমামের তাকলীদ করাকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কারণ তাতে শরী‘আতের বিধান পালনের ব্যাপারটি খেলা ও উপহাসে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এভাবে তাকলীদ চার ইমামের মাযহাবে সীমিত হয়ে গেল।[২৮] আল্লামা খতীব বাগদাদী বলেন,

وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. . . وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَكَانَ فَرْضُهُ التَّقْلِيدَ، كَتَقْلِيدِ الْأَعْمَى فِي الْقِبْلَةِ , فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ آلَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ , كَانَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ فِيهَا.

---

২৭. নববী, *আলমাজমু শরহুল মুহায্যব*, দারুল ফিকর (তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৫৫।

২৮. আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন, *তারিখু ইবনে খালদুন* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৮), খ. ১, পৃ. ৫৬৬।

'শরয়ী বিধি-বিধান ও তার উৎস সর্ম্পকে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই এমন সাধারণ ব্যক্তির জন্য তাকলীদ অপরিহার্য।... (অতঃপর কুরআন সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ পেশ করে তিনি বলেন) ইজতেহাদী যোগ্যতার অভাবের কারণেই বাধ্যতামূলকভাবে মুজতাহিদের তাকলীদ করবে। ঠিক যেমন, ক্বিবলা নির্ধারণের যোগ্যতার অভাবে অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুস্মান ব্যক্তির তাকলীদ করে। মূলত তাদের জন্য এটাই শরীয়াতের নির্দেশ।'[২৯]

হাফেজ যাহাবীর বরাত দিয়ে আল্লামা আবদে রউফ মুনাবী লিখেছেন, আমাদের আকীদা হবে এই যে, চার ইমামসহ সকল ইমাম ও মুজতাহিদই 'আহলে হক' এর অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং ইজতিহাদের যোগ্যতা বঞ্চিতদের উচিত, যে কোন এক মাযহাবের তাকলীদে আত্মনিয়োগ করা। তবে ইমামুল হারামাইনের কথা মতে সাহাবা, তাবেয়ীগণসহ এমন কোন মুজতাহিদের তাকলীদ বৈধ নয়, যাদের মাযহাব পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত আকারে আমাদের কাছে নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয় যে, বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বর্তমানে চার মাযহাবই শুধু মূলনীতিসহ সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ আকারে ইসলামী জাহানের সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের অস্তিত্ব আজ ইসলামী জাহানের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই প্রেক্ষাপটে গবেষক আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে ইমাম রাজী বলেছেন, সাধারণ লোককে অবশ্যই বিশিষ্ট সাহাবীগণের (সরাসরি) তাকলীদ থেকে বিরত থাকতে হবে।[৩০]

চার মাযহাবের সীমাবদ্ধতার কারণ ও প্রেক্ষাপট

প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত চার মাযহাব ছাড়াও সুফিয়ান সাউরী, আওযাঈ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, বুখারী, ইবনে আবী লায়লা, ইবনে শাবরামাহ ও হাসান বিন সাহেলের মত যুগ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ফকীহ অনেক ইমামের মাযহাব সমাজে প্রচলিত ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই হকপন্থী ছিলেন। কিন্তু কালের স্রোতে প্রসিদ্ধ চার মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাব আজ আর সমাজে প্রচলিত নেই। প্রসিদ্ধ চার মাযহাব বিশ্বব্যাপী এখন স্বমহিমায় বিদ্যমান আছে। তার কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ:

১. সুবিন্যস্ত ও সংরক্ষিত গ্রন্থপঞ্জি।
২. যুগে যুগে অসংখ্য আলেমের উপস্থিতি।
৩. সুযোগ্য ছাত্রদের সীমাহীন ত্যাগ।
৪. উম্মতের ইজমা।

১. সুবিন্যস্ত ও সংরক্ষিত গ্রন্থপঞ্জি

প্রসিদ্ধচার মাযহাব অত্যন্ত চমৎকার পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত ও সংরক্ষিত। যা অন্য কোন ইমামের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র) যথার্থ বলেছেন, সাহাবা ও কল্যাণ যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (সরাসরি) তাকলীদ করা বৈধ নয়। কেননা ইলম ও তাকওয়ার

---

২৯. খতীব বাগদাদী, *আলফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্বিহ* (সৌদি আরবঃ দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৭ হি.), খ. ২, পৃ. ১৩৩।

৩০. মুনাবী, *ফায়জুল কাদীর শরহু জামেয়ীস সাগীর* (মিশরঃ মাকতাবাতুত তিজারিয়া আলকুবরা,১৩৫৬), খ. ১, পৃ. ২০৯।

ক্ষেত্রে পরবর্তী মুজতাহিদগণের তুলনায় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীত হলেও ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন এবং মূলনীতি ও ধারা সুবিন্যস্তকরণের বড় একটা অবকাশ তাঁরা পাননি। এ জন্যই তাঁদের কারো সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ মাযহাব নেই। এ মহা দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগের ইমাম মুজতাদিহগণই আঞ্জাম দিয়েছেন। (নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে) তারা সাহাবা তাবেয়ীগণের মাযহাব সংগ্রহ করেছেন এবং (কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে) মূলনীতি ও ধারা-উপধারা নির্ধারণ পূর্বক সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ফতোয়া পেশ করেছেন, সেই স্বনামধন্য ইমামগণের অন্যতম হলেন ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা (র)।[৩১]

২. যুগে যুগে অসংখ্য আলেমের উপস্থিতি

সকল যুগেই এ চার মাযহাবে নির্ভরযোগ্য ফকীহ বিদ্যমান ছিল, তাঁরা তাদের বরেণ্য ইমামগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাঁদের ফিকহী মতবাদ প্রচার প্রসারে সীমাহীন অবদান রাখেন। তাঁদের প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় যুক্তি-তর্ক, বাহাস-মুনাযারা করে ও কিতাব লিখে নিজেদের ইমামগণের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে তুলনামূলক দুর্বল আলেমের মতবাদ আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। পরিশেষে চারটি মাযহাব অবশিষ্ট থাকে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) লিখেছেন, কুরআন সুন্নাহ্র বিচারে ইমাম মুজতাহিদগণের মাঝে ইমাম মালেক, লাইস বিন সা'আদ, ইমাম আওযাঈ ও সুফিয়ান সাউরী প্রত্যেকেই স্ব স্ব সময়ের ইমাম ছিলেন। সুতরাং তাকলীদের ক্ষেত্রে এদের মাঝে তারতম্য করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। অবশ্য দু'টি অনিবার্য কারণে বর্তমানে কতিপয় মুজতাহিদের তাকলীদের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়ে থাকে। প্রথমত (নিষেধকারীদের মতে) তাদের মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী কোন আলিম বিদ্যমান নেই। আর মৃত ব্যক্তির তাকলীদের বৈধতা সম্পর্কে জোরালো মতবিরোধ রয়েছে। এক পক্ষের মতে কোন অবস্থাতেই তা বৈধ নয়। অন্য পক্ষের মতে, মৃত মুজতাহিদের মাযহাববিশেষজ্ঞ আলিম বর্তমান থাকার শর্তে তা বৈধ। আর চার ইমামই শুধু এ শর্তের মাপকাঠিতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারেন। দ্বিতীয়ত (নিষেধকারীগণ বলে থাকেন যে) বিলুপ্তির শিকার মাযহাবগুলোর প্রতিকূলে ইজমা সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে এ ধরনের ইমাম ও মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত জীবন্ত মাযহাবের অধিকারী মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হলে তা অবশ্যই সমর্থিত ও শক্তিশালী হবে।[৩২]

৩. সুযোগ্য ছাত্রদের সীমাহীন ত্যাগ

মাযহাব প্রচার প্রসারে ইমামগণের সুযোগ্য ছাত্রদের সীমাহীন ত্যাগ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। যেমনঃ ইমাম আবু হানিফা (র) হতে চল্লিশ হাজার ফকীহ ইমাম তার ফিকহ বর্ণনা করেছেন।[৩৩] প্রসিদ্ধ চার ইমামের প্রত্যেকেরই হাজার হাজার সুযোগ্য ছাত্র ছিল। যারা ইলম শিক্ষা করে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। নিজ ইমামের মাযহাব প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। যেমনঃ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ছাত্র ছিল অনেক। তাঁরা বিভিন্ন দেশ তথা ইরাক,

---

৩১. নববী, *শরহুল মুহায্যাব* (প্রকাশনা স্থান উল্লেখ নেই, দারুল ফিকর, তা. বি.),খঃ ১, পৃ. ৫৫।

৩২. ইবনে তাইমিয়া, *ফাতাওয়া কোবরা* (দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, ১৯৮৭), খ. ২, পৃ. ৩২৮।

৩৩. আব্দুল কাদের কুরাশী, *আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাফি ত্ববকাতিল হানাফিয়্যা*(করাচিঃ মিয়ার মুহাম্মাদ কুতুবখানা, তা. বি.:), খ. ১, পৃ. ৩।

বল্খ, খুরাসান, সমরকন্দ, বুখারা, রায়, সিরাজ, তুনিস, জানজান, ইসতারাবাদ, বুসতাম, ফারগানা, দামগান, খাওয়ারিজম ও ভারত ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তারা সর্বত্র ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব প্রচার করেন। বিভিন্ন এলাকার উলামায়ে কিরাম মুসলিম জনগণ এ মাযহাব গ্রহণ করেন। তারা তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেন এবং বিভিন্ন কিতাব রচনা করে এ মাযহাবের প্রসারতা বৃদ্ধি করেন।[৩৪]অনুরূপভাবে ইমাম মালিক (র)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ যিয়াদ ইবন আব্দুর রহমান, গাযী ইবন কায়স, ইয়াহ্ইয়া ইবন কায়স, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া মসমূদী প্রমুখ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে স্পেনে এসে আওযাঈ মাযহাবের স্থলে মালিকী মাযহাবের প্রচার প্রসার করেন। ইমামদের সুযোগ্য ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে মাযহাবগুলো ব্যাপকতা লাভ করে। অন্য ইমামদের ক্ষেত্রে এমনটি পরিলক্ষিত হয় না। তাই তো ইমাম শাফিঈ যথার্থ বলেছেন, "লাইস (র) মালেক (র)-এর তুলনায় অধিক ফকীহ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ছাত্ররা তাঁর ইলম বিনষ্ট করে ফেলে"।[৩৫] অর্থাৎ অনুসরণীয় এমন ছাত্র ছিল না, যাদের দ্বারা মাযহাব প্রসার লাভ করবে। বলাবাহুল্য যে, অন্যান্য মাযহাব বিলুপ্তির কারণে এখন তাঁদের অনুসরণ করা অনেকটাই কষ্টসাধ্য। অপর দিকে যে কোন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিলে উলামায়ে সূ নিজেদের মতকে মুজতাহিদের নামে চালিয়ে দিবে। চার মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের স্বতন্ত্র জামাত গবেষণা ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকায় তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দেয়া অসম্ভব।

৪. উম্মতের ইজমা

চার মাযহাবের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে মুফলিহ (র) বলেন,

وَفِي الْإِفْصَاحِ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ.

'ইফসা কিতাবে আছে, এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, চার মাযহাবের কোন একটিকে অনুসরণ করতে হবে এবং চার মাযহাবের মধ্যেই সত্য নিহিত।'[৩৬]

আল্লামা যারকাশী (র) লিখেন,

وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَصْرَ خَلَا عن الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ لَا عن مُجْتَهِدٍ في مَذْهَبِ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وقد وَقَعَ الِاتِّفَاقُ بين الْمُسْلِمِينَ على أَنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ في هذه الْمَذَاهِبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِغَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الِاجْتِهَادُ إلَّا فيها.

৩৪. কাযী মুহাম্মদ আতহার হোসাইন, *আইম্মা আরবাআহ*, পৃ. ১৯-২১।

৩৫. যাহাবী, *তাযকিরতুল হুফফায* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, ১৯৯৮), খ. ১, পৃ. ১৬৫ আব্দুল কাদির আলকারশী, *আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাফি তুবকাতিল হানাফিয়্যা* (করাচিঃ মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, ত. বি.),খ. ১, পৃ.৪১৬।

৩৬. ইবনু মুফলিহ, *আলফুরু* (প্রকাশনা স্থান উল্লেখ নেই, মাউসুয়াতুর রিসালা, ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ৩৭৪।

'স্বীকৃত বিষয় হলো বর্তমান যুগে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ (মুজতাহিদে মুতলাক) নেই। তবে সংশ্লিষ্ট মাযহাবের মুজতাহিদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হক এ চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সুতরাং এ চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয় এবং এ চার মাযহাবের মধ্যেই কেবল ইজতিহাদ করা যাবে।'[৩৭] যারকাশী (র) আরো বলেন,

الدَّلِيلُ يَقْتَضِي الْتِزَامَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

'দলীলের দাবী হলো, চার ইমামের পরে কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে চলা জরুরী।'[৩৮]

আল্লামা আলহাজ্জ ইবনে আমীর (র) বলেন,

مَا ذَكَرَ (بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) وَهُوَ ابْنُ الصَّلَاحِ (مَنَعَ تَقْلِيدَ غَيْرِ) الْأَئِمَّةِ (الْأَرْبَعَةِ) أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

'পরবর্তী আলিমগণ যেমন আল্লামা ইবনুস সলাহ উল্লেখ করেছেন যে, চার ইমামঃ ইমাম আবু হানীফা (র) ইমাম মালেক (র) ইমাম শাফেঈ (র) এবং ইমাম আহমাদ (র) ব্যতীত অন্য কারো মাযহাব অনুসরণ করা বৈধ নয়।'[৩৯]

ইমাম যাহাবী (র) তাঁর *'সিয়ারু আলামিন নুবালা'* কিতাবে লিখেছেন,

لاَ يَكَادُ يُوجَدُ الحَقُّ فِيمَا اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الاجْتِهَادِ الأَرْبَعَةُ عَلَى خِلاَفِهِ.

'চার ইমাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সে বিষয়ের বিপরীতে কোনো সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।'[৪০] আল্লামা মুনাবী (র) তাঁর *'ফাইযুল কাদীর'* কিতাবে লিখেছেন,

فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء والافتاء لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت

'বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবের অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।'[৪১]

একাধিক মাযহাব অনুসরণে শরয়ী বিধান

বিজ্ঞ মুফতী উম্মতের কল্যাণে কখনো কখনো নিজ মাযহাব পরিহার করে অন্য মাযহাবের অনুকূলে ফতোয়া দিতে পারে। তবে সাধারণ অবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব পরিবর্তন

---

৩৭. *আলবহরুল মুহিত* (প্রকাশনা স্থান উল্লেখ নেই, দারুল কুতুবী, ১৯৯৪), খ. ৮, পৃ. ২৪২।

৩৮. *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৪।

৩৯. ইবনু আমীর আলহাজ্জ, *আততাকরিব ওয়াত তাহবির* (বৈরুত:দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা,১৯৮৩), খ. ৩, পৃ. ৩৫৪।

৪০. যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালাহ* (মাউসুয়াতুর রিসালা, ১৯৮৫), খ. ৭, পৃ. ১১৭।

৪১. মুনাবী, *ফয়যুল কাদীর* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, ১৯৯৪), খ. ১, পৃ. ২৭২।

বা সুবিধা অনুযায়ী কোন মাযহাব গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা, মানুষ এ সুযোগ পেলে প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে, ফলে সে গোমরা হবে। ইমাম মা'মার (র) এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ويقول أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الْمُسْكِرِ كَانَ شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ.

'কেউ যদি গান, সংগীত ও পশ্চাদ্বারে স্ত্রী সংগমের ক্ষেত্রে (কতিপয়) মদীনাবাসী (মুজতাহিদের) ফতোয়া অনুসরণ করে এবং মোতা (সাময়িক) বিবাহের ক্ষেত্রে (কতিপয়) মক্কাবাসী (মুজতাহিদের) ফতোয়া অনুসরণ করে। আর মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে (কতিপয়) কুফাবাসী (মুজতাহিদের) ফতোয়া অনুসরণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্‌র নিকৃষ্টতম বান্দারূপে পরিগণিত হবে।'[৪২] তাই ফকীহগণ একাধিক মাযহাব অনুসরণে সাধারণ মানুষকে নিষেধ করেছেন। কেননা সুযোগ পেলে সুবিধাবাদীরা ইসলামের মূল চিত্র বিনষ্ট করে ফেলবে। নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো আমল করা শুরু করবে।

ইবনু আব্দুল বার (র) বলেন,

قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ.

'সুলায়মান আত-তায়মী বলেন, যদি তুমি সকল আলিমের ছাড় (রোখসাত)-এর উপর আমল কর তবে তোমার মাঝে সকল মন্দ একত্রিত হবে।'[৪৩]

ইমাম নববী (র) বলেন, সুলায়মান আত-তায়মী বলেন,

أَنَّهُ لَوْ جَازَ اتِّبَاعُ أَيِّ مَذْهَبٍ شاء لا فضى إِلَى أَنْ يَلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيفِ.

'যদি যে মাযহাব মন চায় সে মাযহাবের অনুসরণ জায়েজ হয়, তবে তা ব্যক্তিকে নফসের অনুসরণে বিভিন্ন মাযহাবের ছাড়গুলো একত্রিত করার দিকে ধাবিত করবে। ফলে সে হালাল-হারাম, ওয়াজিব-জায়েজ এর মাঝে পছন্দ করতে চাইবে। এ অভ্যাস তাকে ইসলাম থেকে অবমুক্ত করার দিকে ধাবিত করবে।'[৪৪]

সর্বোপরি কথা হলো, একত্রে একাধিক মাযহাব মানা যাবে না। এ বিষয়টি উম্মতের আলেমদের কর্মগত ইজমা (এজমায়ে ফে'লি) দ্বারা প্রমাণিত। তা ছাড়া এটা জায়েজ হলে ইসলাম একটি খেলনা হয়ে যাবে। জনসাধারণও মাযহাব রচনা শুরু করবে। চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তবে যদি কেউ এমন কোন এলাকায় দীর্ঘ দিন অবস্থান করে যেখানে তার নিজ মাযহাবের ফকীহ, মুফতী, কিতাবাদী না পায়. তাহলে সে নিজ মাযহাব পরিবর্তন করে ঐ এলাকার প্রচলিত মাযহাব অনুসরণ করতে পারবে। এ অবস্থায় মাযহাব পরিবর্তন তার প্রবৃত্তির দাসত্ব হবে না।

---

৪২. ইবন হাজার, *তালখীসুল হাবীর* (বৈরুত: দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, ১৯৮৯), খ. ৩, পৃ. ৩৯৮।

৪৩. *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযাইলিহী* (সৌদি আরব: দারু ইবনিল জাওযী, ১৯৯৪), খ. ২, পৃ. ৯২৭।

৪৪. নববী, *শরহুল মুহায্‌যাব*, খ. ১, পৃ. ৫৫।

হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

শুরা (পরামর্শ) ভিত্তিক ফিকহী সংকলন হানাফী মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর অসংখ্য ছাত্র ছিল। বিচক্ষণ মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি শক্তিশালী ফিকহী বোর্ড গঠন করেছিলেন। যাদের সম্মিলিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিরামহীন সাধনার ফলে ফিকহে হানাফী সংকলিত হয়েছে। ইমাম ইবনুল ফুরাত (র) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁর চল্লিশজন সঙ্গী নিয়ে ফিকহে হানাফী সংকলন করেছেন। তাঁদের শীর্ষ দশজনের মধ্যে ছিলেন আবু ইউসুফ, যুফার, দাউদ ত্বায়ী, আসাদ ইবনে আমর, ইউসুফ ইবনে খালিদ ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যাইদা। শেষোক্ত জন সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন।[৪৫] এ মাযহাবের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল; অন্য মাযহাবের তুলনায় কুরআন সুন্নাহ্‌র সূক্ষ্ম ও বাস্তব অনুসারী। ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব আশ শারানী (র) বলেন, আমি যখন চার মাযহাবের দলীল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছি তখন, আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর সঙ্গীদের মতামত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। আমি লক্ষ করেছি যে, তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোর সূত্র হচ্ছে কুরআন মাজীদের আয়াত (সহীহ) হাদীস ও আছার অথবা তার মাফহুম, কিংবা এমন কোন হাদীস যার একটি সনদ যয়ীফ হলেও মূল হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত, অথবা নির্ভরযোগ্য উসূলের উপর কৃত কিয়াসে সহীহ।[৪৬]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় মাযহাব দীন নয় বরং দীন পালনের মাধ্যম। এটা কোন ফিরকা বা দল নয় বরং একই উৎস হতে নির্গত একই গন্তব্যে পৌঁছানোর চারটি রাস্তা মাত্র। তাই যে যে রাস্তা অনুসরণ করবে, সে গন্তব্যে পৌঁছবে।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।'[৪৭] প্রসিদ্ধ চার মাযহাব পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত থাকায় যে কোন একটি অনুসরণ করার বিষয়ে আলেমদের ইজমা হয়েছে। মাযহাবকে দীন বা ফেরকা মনে করা, হয় ইলমী দীনতা, অথবা মাযহাব বিরোধিতার নামে নতুন মাযহাব তৈরীর ব্যর্থ প্রচেষ্ঠা। মাযহাব ছাড়া শরীয়া'তের বিধি-বিধান পালন করা সাধারণ মানুষের জন্য অসম্ভব। তাই মাযহাব অনুসরণ দীন পালনের অনিবার্য বাস্তবতা।

---

৪৫. কাওছারী, *ভূমিকা*, *নসবুর রায়াহ, খ:* ১, পৃ. ৩৮।

৪৬. জাফর আহমাদ উসমানী, *আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দীসুন* (বৈরুত: দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, তা. বি.:), পৃ. ৬০।

৪৭. সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

মাদকাসক্তি নির্মূলে ইসলামী অনুশাসন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সাইফুল্লাহ*
মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহ**

সম্প্রতি মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে। শুধু শহরে নয়, গ্রাম পর্যায়েও ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে ইয়াবা, হেরোইন, ফেনসিডিল, প্যাথেডিনসহ নানা নেশাজাতীয় দ্রব্য। মাদকের এই ভয়াল থাবায় আজ বিশ্বব্যাপী বিপন্ন মানব সভ্যতা। এই সর্বনাশা মরণছোঁবলে ব্যক্তি ও পরিবার অকালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে; সামাজিক জীবনেও বিপর্যয় নেমে এসেছে। তরুণ যুবশক্তি একটি দেশ বা জাতির মেরুদণ্ড। নেশার ছোঁবলে সেই মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে পড়েছে। মাদকাসক্তির কারণে সকল জনপদেই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মারামারি, হত্যা, রাহাজানি, ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার ও সন্ত্রাস বেড়ে গিয়েছে। বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক সংহতি ওনিরাপত্তা; ব্যাহত হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ফলে আজ আমাদেরকে এক রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মাদকাসক্তির সমস্যা নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বেই সুশৃঙ্খল ও টেকসই সমাজ ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে পবিত্র কোরআনুল কারীমে মাদককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যাতে মানবজাতি মাদকের ভয়ানক কুফল থেকে দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে রক্ষা পায়। শুধু তাই নয়; মানুষের বিবেক-বুদ্ধির হেফাজতের জন্য সুস্থ ও সবল দেহ, মেধা ও মননশীল সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইসলাম ধর্মে মাদকসেবী, উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, পরিবেশনকারী ও ব্যবসায়ীদের জন্য শাস্তির বিধান প্রণয়নের ব্যাপারেও কঠোরভাবে বলা হয়েছে। তাই একমাত্র ইসলামী অনুশাসন পালনের মাধ্যমেই মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মাদকাসক্তি নিরোধে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহের অনুশাসন এবং বাংলাদেশে মাদকাসক্তির বর্তমান চিত্রসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মাদকের পরিচয়

ড. এনামুল হক রচিত *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*-এ মদ শব্দের অর্থ দম্ভ, গর্ব, অহংকার (শক্তি-মদমত্ত), প্রমত্ততা, বিহ্বল ভাব, কস্তুরী (মৃগমদ), মদ্য, সুরা, প্রমত্তকর রস (মহুয়ার মদ)-কে বুঝিয়েছেন।[১]

Zillur Rahman Siddiqui তার গ্রন্থে এর অর্থ লিখেছেন-বিয়ার, ব্রান্ডি, হুইস্কি প্রভৃতি পানীয়; এইসব পানীয়তে বিদ্যমান বর্ণহীন তরলপদার্থ; কোহল; সুরা।[২]

---

* লেখক ও প্রাবন্ধিক, বি.এ (অনার্স), এম.এ. (ইসলামিক স্টাডিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

** প্রভাষক, সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

১. ড. এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৯৪৯।

২. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, Jaunary 2012, p. 21.

'লিসানুল আরাব' গ্রন্থাকারের মতে, মদের ক্রিয়াজাত অর্থ হলো- বিলোপ করা, ঢেকে ফেলা, আবৃত করা, গোপন করা, মিশ্রিত করা।[৩]

মদের আরবি শব্দগুলো হলো

خَمرَ، شَرَابُ، خَفِيُ، سَترَةُ، تُغَيِّرُ، اَلعَجِينُ، كِتمَةَ ।[8]

আর *A DICTIONARY of MODERN WRITTEN ARABIC* গ্রন্থে মদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- To cover, hide, conceal, to leave, raise, to ferment.[৫]

এসম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন,

اَلخَمرُ مَا خَامَرَ العَقل "মদ হলো তাই যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়।"[৬]

হযরত উমর (রা) বলেন, 'জ্ঞান আচ্ছন্নকারী বা বিলুপ্তকারী যে কোনো বস্তুই 'খাম্‌র'।'[৭]

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, "আঙ্গুরের রস দ্বারা প্রস্তুতকৃত পানীয় জাতীয় বস্তুই হলো 'খাম্‌র'।"[৮]

ইব্‌ন জারীর তাবারী (র)-এর মতে,"যে রোগ বা পানীয় বিবেক বুদ্ধিতে মিশে যায়, তাকে ঢেকে ফেলে তাকেই খাম্‌র (মদ) বলা হয়।"[৯]

আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার *ইসলামে হালাল হারামের বিধান* গ্রন্থে লিখেছেন,"মদ্য বা সুরা বলা হয় এমন এ্যালকোহলীয় পদার্থকে যা পান করা হলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়।"[১০]

আরব কবি মাদকদ্রব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন,

شَرَبتُ اَلخَمرَ حَتّٰى ضَلّ عَقلِى + كَذَالِكَ اَلخَمرَ تَفعَلُ بِالعُقُولِ

"আমি মদ পান করেছি, ফলে আমার বিবেক-বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে। আর মাদক মাত্রই বিবেক-বুদ্ধির সাথে এরূপ আচরণই করে থাকে।"[১১]

Oxford advanced learners dictionary-তে বলা হয়েছে, "An alcoholic drink made from the juice of grapes that has been left to ferment."[১২]

---

৩. ইবনে মানজূর, *লিসানুল আরাব*, খ. ৪র্থ, সং ২য়, পৃ. ২৫৮; বাংল-আরবি অভিধান, গবেষণা বিভাগ, ই.ফা., জুন ২০১৫, পৃ. ৭৯২।

৪. *আল-মুনজিদ ফিললুগাহ্*, ২০০৭, পৃ. ১৯৫; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ খ., মাকতাবাতু যাকারিয়্যা দেওবন্দ, ২০০১, পৃ. ২৫৫।

৫. J Milton Cowan (edited), *A DICTIONARY of MODERN WRITTEN ARABIC*, p. 261.

৬. মুসলিম, তাফসীর, (৬) বাব ফী নুযূলি তাহ্‌রীমিল খামর, নং ৭৫৬০/৩৩; আবু দাউদ, আশরিবা, বাব ১, নং ৩৬৬৯।

৭. ইমাম আবুল ফীদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*, ই.ফা., ২ খ., ৩ সং., পৃ. ২০৫।

৮. শামসুদ্দীন আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহি আল-মিনহাজ*, ১ম খ., পৃ. ১৬৯।

৯. ইব্‌ন জারীর তাবারী (র), *তাফীসরে তাবারী শীরফ*, ৪ খ., ই.ফা., মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ১১৪।

১০. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, মে ১৯৮৪, পৃ. ১০০।

১১. *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, খায়রুন প্রকাশনী, জুন ১৯৯১, পৃ. ২৪০।

১২. *Oxford advanced learners dictionary of current English*, *Eighth edition*, p. 1766.

বাংলা পিডিয়া গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"মাদকদ্রব্য (narcotics), ভেষজদ্রব্য যা প্রয়োগে মানবদেহে মস্তিষ্কজাত সংজ্ঞাবহ সংবেদন হ্রাস পায় এবং বেদনাবোধ কমায় বা বন্ধ করে।"[১৩]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এ বলা হয়েছে, 'এ্যালকোহল' অর্থ স্পিরিট এবং যে কোনো ধরনের মদ [ওয়াইন, বিয়ার] বা [৫০%-এর] অধিক এ্যালকোহলযুক্ত যে কোনো তরল পদার্থ।[১৪]

মুহাম্মদ সামাদ এ সম্পর্কে বলেন, "যে সকল ঔষধ বা দ্রব্যাদি সেবন করলে মানুষের স্বাভাবিকভাবে শারীরিক বা মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং উত্তরোত্তর সেসব ঔষধ বা দ্রব্যাদি সেবনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তাই মাদকদ্রব্য হিসেবে আখ্যায়িত হয়।"[১৫]

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য বলতে মদ, গাজা, ইয়াবা, মরফিন, আফিম, চরস, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ভাং, তাড়ি, ফেনসিডিল, স্পিরিট বা এলকোহল প্রভৃতি বস্তুকে বোঝায়।[১৬]

মোটকথা, যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদক বলে।

মাদকাসক্তি-এর সংজ্ঞা

মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা যার ফলে রোগী ড্রাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একবার ড্রাগ (মাদক) ব্যবহার ভাল লাগার আমেজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় পুনরায় ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ। এভাবে পুনঃপুনঃ ড্রাগ ব্যবহারের ফলে ড্রাগের প্রতি আসক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।[১৭] একসময় যে মাত্রায় মাদক নিলে পূর্বে একজন ব্যক্তির আসক্তি তৈরী হতো, পরবর্তীতে মাত্রা অনেক বাড়িয়েও ঐ পর্যায়ে আসক্তি তৈরী হয় না।

মাদকাসক্তি বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক অথবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী (মদ জাতীয়দ্রব্য) কোন ওষুধ যা কারণ ব্যতীত বার বার সেবন করে এবং উক্ত ঔষুধের উপর শারীরিক অথবা মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[১৮]

Sociology and Social Life-গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Drug addiction is the habitul use of certain narcotic that leads in time to mental and moral deterioration, as well as to deleterious social effects."[১৯]

---

১৩. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া*, খ. ১১, সং. ২, জুন ২০১১, পৃ. ৩৩।

১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০*, পৃ. ২।

১৫. মুহাম্মদ সামাদ, *মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪২ তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ.১৪৮।

১৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *মাদকাসক্তি ও সন্ত্রস প্রতিরোধে ইসলাম* (মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত), ই.ফা., এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ২৯৬।

১৭. মোঃ আনিছুর রহমান, *মাদকাসক্তির মরণ ছোবলে বিপন্ন মানব সভ্যতা : উত্তরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, ই.ফা. পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৮২।

১৮. সৈয়দা ফিরোজা বেগম ও মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, *সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা, প্রফেসরস প্রকাশনা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৭৬।

মাদকাসক্তি হচ্ছে এ্যালকোহাল জাতীয় পানীয় সেবনের অভ্যাস, যা মস্তিষ্ক এবং যকৃতসহ মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। শুধু তাই নয়, মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার নিজ জীবন ও তার পরিবারের অন্যদের জীবনও বিপন্ন করে তোলে।[২০]

উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য

প্রাচ্য দেশসমূহের বর্তমান সভ্যতা ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মাদকদ্রব্য একটি বিশেষ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরই প্রভাবে অধুনা প্রথম বিশ্বের (এশিয়া মহাদেশ)[২১] প্রায় সর্বত্র মাদকদ্রব্যের ব্যবহার দ্রুত বেড়ে চলেছে।

এতকাল প্রাচ্যের মানুষ ধর্মপ্রবণ হিসেবে সমাদৃত ছিল এবং প্রচলিত অনেক ধর্মেই মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে কিন্তু পাশ্চাত্যের সাথে সহজ যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার অবাধ মেলামেশা এবং নিত্য-নৈমিত্তক আদান প্রদানের কারণে প্রাচ্যবাসীদের ধর্মীয় বন্ধন শিথিল থেকে শিথিলতর হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রায় সবদেশে এক শ্রেণীর নাগরিক মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাদকদ্রব্যকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করে তারা তা ব্যবহার করছে।[২২]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীসও রয়েছে। তা হলো,

لاَتَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّ ونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

“অচিরেই এমনভাবে রাতসমূহ বা দিনসমূহ অতিবাহিত হতে থাকবে, যখন আমার উম্মতের এক শ্রেণির লোক শরাবের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে।”[২৩]

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যগুলো হলো-গাঁজা, ইয়াবা, কোকো, ক্যাফেইন, হাশিশ, হেরোইন, হুইস্কি, প্যাথেড্রিন, মরফিন, অ্যামফেটামিন, ভদকা, বার্বিচুরেট, মেথাকোয়লেন, তাড়ি, ট্রাংকুইলাইজাস, এলএসডি, পেথেডিন, সুরাসার, থিবাইন, ড্রায়াজেলাম, আফিম, আলফামিথাইল, অক্সিকোডন, ট্রেমাজিপাম, ডিনেচার্ড, নাইট্রাজিপাম, কেন্টাযোকাইন, ফেন্টানাইল, স্পিরিট, ফেন্সিডিল, ক্লোরডায়াজিপক্সাউ, নারকটিন, আলফা, ক্লোরজিপেট, রেসিন, ফরাজিপাম, লোরাজিপাম, এন্টোফাইল, অক্সিজিপাম, জিন, বাম, আলফেন্টানাইল, পঁচাই, মেথেডিন, কোডিন, প্যাপাভারিন, নোসকাফাইন, মেথাডন, পেন্টানাইল, প্রোডাইন, হাইড্রোমরফাইন ইত্যাদি।

---

১৯. Kimbal Young and W. Mack Raymond, *Sociology and Social Life,* New York 1962, p. 446.

২০. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন, *মাদকাসক্তি নিরোধে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা* (মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত), ই.ফা., ২০০৫, পৃ. ১৫৮।

২১. এশিয়া মহাদেশ তৃতীয় বিশ্ব নয়, প্রথম বিশ্ব। এশিয়া মহাদেশেই মানবজাতির গোড়াপত্তন হয়েছে। এখান থেকে মানবজাতি আফ্রিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ ওআফ্রিকা দ্বিতীয় বিশ্ব এবং অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা তৃতীয় বিশ্ব।

২২. লোকমান আহমদ আমীমী, *মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা* (মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত), ই.ফা., পৃ. ৮৯।

২৩. সুনানু ইব্‌ন মাজা, কিতাবুল আশরিবাহ্‌, বাব ৮, ৩য় খ., ই.ফা., আগস্ট ২০১৪, হা. নং ৩৩৮৪, পৃ. ২৪০; আবু দাউদ, বাব ৬, নং ৩৬৮৮; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪ খ., পৃ. ২৩৭, নং ১৮২৪১; ৫ খ., পৃ. ৩৪২, নং ২৩২৮৮।

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস

জাতিসংঘের অগ্রাধিকার তালিকার অন্যতম বিষয় হচ্ছে মাদক সমস্যা। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধের পেছনে মাদকের অবৈধ ব্যবসা ও অপব্যবহার অন্যতম কারণ। মাদকাসক্তদের ৮০ ভাগই তরুণ যুব সম্প্রদায়। সে কারণেই ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘ ২৬ জুনকে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসহিসেবে ঘোষণা করেন। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ২৬ জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন দেশব্যাপী নানা কর্মসূচী পালন করে থাকে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির লক্ষণসমূহ

একজন ব্যক্তি মাদকাসক্ত কি-না তা বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষণ দেখেই বুঝা যায়। নিম্নে মাদকাসক্ত ব্যক্তির লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হলো-

আচরণগত লক্ষণ

সাধারণত যারা মাদকাসক্ত তাদের চিন্তা ও আচরণে হঠাৎ বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন-মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়, কোনো কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না; স্কুল, কলেজ বা অফিস ঘনঘন মিস কওে বা ফাঁকি দেয়; সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে এবং প্রায়ই রাত করে বাসায় ফিরে; দেরি করে ঘুমাতে যায় অথবা সারা রাত জেগে থাকে; সর্বদা ঘুম ঘুম ভাব, ঝিমানো ও নিস্তেজ ভাব থাকে; বিভিন্ন অজুহাতে টাকা-পয়সার চাহিদা বেড়ে যায়; যখন তখন যেকোনো ব্যক্তির কাছে টাকা ধার চায়; টাকার জন্য আক্রমণাত্মক ও অস্বাভাবিক আচরণ করে, প্রায়ই বাসা থেকে টাকা-পয়সা বা সহজে বিক্রয়যোগ্য জিনিস অন্যের কাছে বিক্রি করে; ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করে; জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলার প্রবণতা বেড়ে যায়; ঘর থেকে মূল্যবান সামগ্রী বা অলংকার ইত্যাদি চুরি করে; অতি বিনয়ভাব দেখায়, সন্দেহমূলক আচরণ বৃদ্ধি পায়, ক্রমাগত মিথ্যাকথা বলে; হঠাৎ করে বাইরে চলে যায়; বখাটে টাইপের বন্ধুদের সাথে চলা-ফেরা করে; মাদক গ্রহণের কারণে পুরাতন ভালো বন্ধুদের পরিবর্তে নতুন নতুন মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেয়; অতিরিক্ত গোপণীয়তার প্রয়োজন হয়; বেশির ভাগ সময় একা থাকতে চায়; প্রায়ই রুম বন্ধ করে রাখে বা বাথ রুমে দীর্ঘ সময় কাটায় এবং কথা বলার সময় আপনার চোখের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে তাকায়; প্রায়ই মারামারি,ঝগড়া বা কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে; প্রয়োজন ছাড়াই বা মাঝেমধ্যেই দূরে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে; খেলাধুলা, ব্যক্তিগত শখ ইত্যাদিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে; সহকর্মী, শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছ থেকে ঘনঘন নালিশ আসতে থাকে; বাড়ীর বিভিন্ন জায়গায় তার ব্যবহৃত পোড়া কাগজ, ব্লেড, সিরিঞ্জ, মোমবাতি ও ম্যাচের কাঠি পাওয়া যায়; পোশাক পরিচ্ছেদ নোংরা, অপরিষ্কার থাকে এবং চরম নিয়মানুবর্তিতার অভাব লক্ষ করা যায়।

মানসিক লক্ষণ

মাদকাসক্ত ব্যক্তির মানসিক লক্ষণসমূহ হল : অজানা কারণে তাদের ব্যক্তিত্ব ও আচরণে পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। কথাবার্তা জড়িয়ে ফেলে বা কিছুটা অসংলগ্ন হয়; দ্রুত

মেজাজের পরিবর্তন হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়; প্রতিদিন নির্দিষ্ট কোনো সময়ে অস্থিরতা বেড়ে যায়; কোনো কাজ করার প্রেরণা হারিয়ে ফেলে; অলসতা বৃদ্ধি পায় এবং কাজে মনঃসংযোগ করতে পারে না; বিনা কারণে ভীতসন্ত্রস্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হয়; কোনো কারণ ছাড়াই হাসে, রেগে যায় বা বিরক্ত হয়।

শারীরিক লক্ষণ

মাদকাসক্ত ব্যক্তির শারীরিক লক্ষণসমূহ হল: চেহারার লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায় কিংবা চেহারার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন-চোখ লাল হয়ে যায়, চোখের নিচে কালি পড়ে, চোখের মণি স্বাভাবিকের তুলনায় ছোট বা বড় হয়। এছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি রুচি কমে যায়; কোনো কোনো সময় অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়; শরীরের যত্ন নিতে অবহেলা করে; শরীরে, মুখে অস্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যায় এবং তা লুকানোর জন্য অতিরিক্ত বডি স্প্রে ব্যবহার করে; শরীরে কোনো কাঁটা বা সুচ ফোটানোর দাগ দেখতে পাওয়া যায়,যার ব্যাখ্যা দিতে সে অনিচ্ছুক; শরীরের ওজন হঠাৎ করে কমে যায় বা বেড়ে যায়;জ্বর জ্বর ভাব থাকে; নাক দিয়ে প্রায়ই রক্ত পড়ে; হঠাৎ নাক-চোখ দিয়ে পানি ঝরে অথবা ঘনঘন নাক চুলকায়।

যদিও উল্লিখিত বিষয়গুলো বিভিন্ন রোগের লক্ষণসমূহের সাথে মিল থাকলেও মাদকাসক্তদের মধ্যে এই লক্ষণগুলো বেশি বেশি পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির চিত্র

বাংলাদেশের অবস্থান গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের মাঝামাঝি হওয়ায় তা মাদকদ্রব্য চোরাচালানের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে খুবই উপযুক্ত। এ দেশের মধ্য দিয়ে শতশত নদ-নদী ও খাল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। মাদক চোরাচালানকারীরা সমুদ্র উপকূল ও নৌপথকে তাদের পণ্য পাচারের খুবই উপযুক্ত পথ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ফলে এ অঞ্চলে মাদকদ্রব্য অতি সহজেই মাদকসেবীদের হাতে পৌঁছে যায়। বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান সত্যিই একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে এটি আরো আগেই শুরু করা উচিত ছিল। কারণ মদ ও মাদকদ্রব্যে বাংলাদেশের শহর, নগর এমনকি গ্রামাঞ্চল ব্যাপক হারে ছেঁয়ে গেছে। যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ এমনকি নারীরা পর্যন্ত অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝেও এর দানবীয় বিস্তার দেশের বিবেকবান ও সচেতন সমাজকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে। বিষাক্ত মাদক সেবনে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অসংখ্য মানুষ।

বাংলাদেশর মাদক পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের একটি জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে কমপক্ষে ৬৫ লাখ মানুষ সরাসরি মাদকাসক্ত। এদের মধ্যে ৮৭ ভাগ পুরুষ, ১৩ ভাগ নারী, এক লাখেরও বেশী মানুষ নানাভাবে মাদক ব্যবসয়ের সঙ্গে জড়িত। প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নারী এবং শিশু কিশোররাও এর সঙ্গে জড়িত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৪৬ লাখ এবং আসক্তদের মধ্যে বেশির ভাগই তরুণ। সমাজসেবা অধিদপ্তরের একটি জরিপে বলা হয়, আসক্তদের শতকরা ১১ ভাগ কিশোর ও তরুণ। মাদকাসক্তদের শতকরা ৪৫ ভাগ বেকার এবং ৬৫ ভাগ আন্ডার গ্রাজুয়েট। মাদকাসক্তদের সংখ্যার ১৫ ভাগ উচ্চ শিক্ষিত। অন্যদিকে ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনালের

পৃথক পরিসংখ্যান সূত্রে জানা যায়, দেশে সুই-সিরিঞ্জের মাদকাসক্তরা শিরায় মাদক গ্রহণ করায় এইচ.আই.ভি. ঝুঁকির মধ্যে বেশি থাকে।[২৪]

সারাদেশে প্রতিবছর মাদক ব্যবসায় এক লক্ষ কোটি টাকা লেনদেন হয়।[২৫]সরকারি হিসেবেই দিনে সেবন হয় ২০ লক্ষ ইয়াবা বড়ি। প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে স্রোতের মতো ইয়াবা ঢুকছে বাংলাদেশে। যেখানে ২০১০ সালে ৮১ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট আটক হয়েছিল; সেখানে ২০১৬ সালে আটকের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন কোটি। মিয়ানমারের বিদ্রোহী ও কিছু অপরাধী গোষ্ঠী ইয়াবা বিস্তারের প্রধান রুট করেছে বাংলাদেশকে। ধারণা করা হয়, বছরে কেবল বাংলাদেশে বিক্রিত ইয়াবার দাম আসে ২১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এক দিনেই মিয়ানমার বিক্রি করছে ৬০ কোটি টাকার ইয়াবা।[২৬]

MIA SEPPO and SERGEY KAPINOS wrote in their article, "In Bangladesh, an estimated 2.5 million people are addicted to drugs, as per a 2013 study of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) in Dhaka. The Department of Narcotics Control (DNC), Bangladesh's apex drug control agency, 16 and 40 comprise 88.39 percent of the drug abusing population. The yaba drug has further amplified problems pertaining to addiction and trafficking. As per DNC statistics, law enforcement agencies seized a mammoth cache of 40,079,443 yaba tablets in 2017."[২৭]

সারণী-১ : ২০১৪-২০১৮ মে পর্যন্ত সময়ে মাদক অপরাধ সংক্রান্ত অধিদপ্তরের মোবাইল কোটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ;

তথ্যসূত্র : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৮।

বছর	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার	সাজাপ্রাপ্ত আসামী
২০১৪	১৪৮১৫ টি	৭৯৪৮ টি	৮৩২০ জন	৮৩২০ জন
২০১৫	১৪৯৩৭ টি	৭৪৮৭ টি	৭৮২৩ জন	৭৮২৩ জন
২০১৬	১৩৫৪১ টি	৬৪৩০ টি	৬৫৯২ জন	৬৫৯১ জন
২০১৭	১২২১২ টি	৫৯৯১ টি	৬০৪৪ জন	৬০৪৪ জন
২০১৮ (মে)	৪৭৫৪ টি	২৪১৬ টি	২৪৪৮ জন	২৪৪৮ জন

সারণী-২ : ২০১০-২০১৭ সাল পর্যন্ত সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

---

২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই (হিমেল আহমেদ), ২২/০৫/২০১৮, পৃ. ৯।

২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, মাদক ব্যবসায় এক লক্ষ কোটি টাকা লেনদেন হয়, ২৮/১০/২০১৮, কলাম ২,পৃ. ১৯।

২৬. মীর আবদুল আলীম, মাদকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮/১২/২০১৭, পৃ. ৮।

২৭. MIA SEPPO and SERGEY KAPINOS, Drug Problem Requires Collective Solutions, *The Daily Star* (Editorial Column), 26/o6/2018.

বছর	আফিম (কেজি)	হেরোইন (কেজি)	ফেনসিডিন (বোতল)	ফেনসিডিন (লিটার)	গাঁজা (কেজি)	গাঁজা (গাছ)	ইনজেকটিং (এ্যাম্পল)	ইয়াবা (ট্যাবলেট)
২০১০	-	১৮৮.১৯	৯৬২২.৬০	৪১১৯.১৯	৪৮৭৪৯.৩৬	১৭৬০	৬৯১৫৮	৮১২৭১৬
২০১১	৮.০৭	১০৭.৫০	৯৩২৮৭৪	৩২২৮	৫৪২৪৪	৭৪২	১১৮৮৯০	১৩৬০১৮৬
২০১২	৪.৮৪	১২৪.৯২	১২৯১০৭৮	২৬১৩	৩৮৭০২	৪৮৫	১৫৭৯৯৫	১৯৫১৩৯২
২০১৩	১১.৬২	১২৩.৭৩	৯৮৭৬৬১	৮৫৭.৫৫	৩৫০১২.৫৪	৬৬৬	৯৯৫০৯	২৮২১৫২৮
২০১৪	৯১.২২	৭৮.৩০	৭৪১১৩৭	৪৩৮	৩৫৯৮৮	৭২৭	১৭৮৮৮৯	৬৫১২৮৬৯
২০১৫	-	১০৭.৫৪	৮৭০২১০	৫১০৫	৩৯৯৬৮	৭৬১	৮৫৯৪৬	২০১৭৭৫৮১
২০১৬	৫.১০	২৬৬.৭৯	৫৬৬৫২৫	২৭৫	৪৭১০৪	৮৯৪	১৫২৭৪০	২৯৪৫০১৭৮
২০১৭	-	৪০১.৬৩	৭২০৮৪৩	৩৩৮	৬৯৯৮	৫৩৮	১০৯০৬৩	৪০০৭৯৪৪৩

তথ্যসূত্র : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অপারেশনস্ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান।

এছাড়া বর্তমানে মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে সরকার 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে। সীমান্তে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ১২৩২৭২০৩ পিস ইয়বা ট্যাবলেট, ৩৫৬৬৭৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৩০ কেজি ১১ গ্রাম হেরোইন, ৯৯২২৯ বোতল বিদেশি মদ, ৫০৭৫০ বোতল বিয়ার, ৭৪০১ লিটার দেশি মদ, ১৫৭৫৩ কেজি গাঁজা, ১০২৮৫০ পিস এ্যানেগ্রা ট্যাবলেট, ৩৫৪৪১৩ পিস সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ১০৩৫০৭০৪ পিস অন্যান্য ট্যাবলেট এবং ১৯৬২৯টি নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জব্দ করা হয়েছে ৪১২ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৯ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য।[২৮]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা

সম্প্রতি 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১৮' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, ইয়াবা সেবনের সর্বনিম্ন শাস্তি তিন মাস জেল আর সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড। এ ছাড়া মাদকদ্রব্য চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত, বহন, পরিবহন, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ। দুইশত গ্রাম বা তার বেশি ইয়াবা পাওয়া গেলে তার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড। ইয়াবা ছাড়াও কোকেন, হেরোইন ও পেথিড্রিন-জাতীয় মাদকেরব্যবহার, পরিবহন, আমদানি-রপ্তানি বা বাজারজাত করার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড।[২৯]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারবিভিন্ন সময়ে অনেক নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-(ক) ১৯৮২ সালের জাতীয় ওষুধনীতি;(খ) ১৯৮৪ সালের আফিম এবং মদের বিকল্প হিসাবে বহুল ব্যবহৃত মৃতসঞ্জীবনী সুরা নিষিদ্ধকরণ; (গ) ১৯৮৭ সালের গাঁজার চাষ বন্ধ করা এবং ১৯৮৯ সালের সমস্ত গাঁজার দোকান তুলে দেয়া এবং (ঘ) "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০" প্রণয়ন।[৩০]

---

২৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৯০।

২৯. *প্রথম আলো*, ইয়াবা সেবনের শাস্তি জেল-জরিমানা, ২৮/১০/২০১৮, কলাম ৫, পৃ. ১।

৩০. কাজী আলী রেজা (সম্পাদিত), *জাতিসংঘ এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ*, (ঢাকা জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র), ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২১।

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কারিগরি বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উপনীত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকেই যোগাযোগের যন্ত্রপাতি লাভ করে। কলম্বো পরিকল্পনা ব্যুরোর ডিএপি, সার্ক, ইউনেস্কো, এসকাপ, আইএলও প্রভৃতি সংস্থার কাছ থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। গত কয়েক বছরে এখানে বেশ কয়েকটি সার্ক কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। নতুন দিল্লীস্থ ডিইএ-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।[৩১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারতের সঙ্গে এসব দেশের ঢাকায় কর্মরত মাদকদ্রব্য লিয়াজোঁ কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য বিনিময় হয়ে থাকে। ভিয়েনাস্থ আইএনসিবি এবং কলম্বোয় অবস্থিত এসডিওএমডি-তে এখান থেকে নিয়মিত তথ্য পাঠানো হয়ে থাকে। অবৈধ মাদকদ্রব্য পাচার প্রতিরোধের ব্যাপারে মায়নমারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি চুক্তি রয়েছে। মাদকদ্রব্য অপব্যবহার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে মাদকদ্যব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।[৩২]

ইসলামী শরীয়াতে মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার তাৎপর্য

মদ ও জুয়া ছিল তৎকালীন আরব সমাজের ঘোরতর নেশা। এ নেশায় তারা অষ্টপ্রহর ডুবে থাকতো। কেননা সে সময় তাদের হাতে অন্য এমন কোনো মহৎ ও সম্মানজনক কাজ ছিলো না, যার ভেতরে তারা তাদের তৎপরতা, সময় ও আবেগ অনুভূতি নিয়োগ করতে পারতো।[৩৩] জাহিলিয়া যুগে আরবরা শরাব পানের জন্য পাগল হয়ে যেতো। আরবী ভাষায় শরাবের প্রায় একশটি নাম রয়েছে। তাদের কাব্য ও কবিতায় শরাবের বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ রয়েছে। তা পানপাত্র ও পরিবেশেনকারী-কারিনীদের সৌন্দর্য বর্ণনায়, সুরাপানের মজলিস-সমূহের গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছিল।[৩৪] তবে ঐ জাহিলী সমাজে এমন লোকও বিদ্যমান ছিলো জীবনে যারা কখনো মদ স্পর্শ করেনি।

কবি হযরত হাসান ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন,

فَنَشْرَبُهَا فَتَرْكُنَا مُلُوكاً + وَاَسَدًا مَا يَنَهنَهُمَا اَللّقاء.

"অতঃপর আমরা উহা (মদ) পান করতাম, আর মদ আমাদেরকে রাজা ও সিংহ হবার মর্যাদা দান করতো। যা আমাদেরকে (বন্ধু-বান্ধবদের) সাক্ষাতেও বাধা দিতো না।[৩৫]

আল্লাহ্‌র প্রতিটি বিধান তাৎপর্যপূর্ণ। গভীরভাবে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরী'আতে কোনো বিষয়ে হুকুম জারি করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতির বিশেষ মূল্যায়ন

---

৩১. *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৩২. *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৩৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *ফী যিলালিল কুরআন*, আল কুরআন একাডেমি লন্ডন, ২য় খ., ৬ সং., এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২১৪।

৩৪. *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৩৫. *তাবারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

করা হয়েছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ বাধার সম্মুখীন না হয়। তাই ইসলাম শুরুতেই মদ হারাম ঘোষণা করেনি, বরং এটি নিষিদ্ধ করতে শরী'আত এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছিল যার ফলে আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। তখন যদি হঠাৎ করে মদকে হারাম করা হতো তাহলে তা পালন করা তখনকার লোকদের পক্ষে হয়তো বড়ই কঠিন হতো।

এখানে ইসলামের বিধানসম্মতও প্রজ্ঞা-প্রশিক্ষণ পদ্ধতির একটি দিক আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। সেটি এই যে, যখন কোনো আদেশ বা নিষেধ কোনো মৌলিক আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন সেই ব্যাপারে ইসলাম প্রথম মুহূর্ত থেকেই চূড়ান্ত ও অকাট্য রায় ঘোষণা করে কিন্তু যখন তা কোনো আদত-অভ্যাস বা রসম-রেওয়াযের সাথে অথবা কোনো জটিল সামাজিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন ইসলাম সেই ক্ষেত্রে উদার পন্থা অবলম্বন করে এবং নম্র, কোমল ও পর্যায়ক্রমিক পন্থায় তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়। এরূপ নির্দেশের বেলায় তা বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নির্দেশ পালনের উপযোগী বানায়। ফলে তা পালন ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়। ইসলামের বহু সংখ্যক বিধিতে এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।[৩৬]

মূলত শরাব হারাম ঘোষণা করার বেলায়পর্যায় ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'য়ালার পরম প্রজ্ঞা এবং রাসূলে কারীম (সা)-এর সমাজ সচেতনতা, যা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।পবিত্র কুরআনে চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মদের অকল্যাণের একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। গোটা মুসলিম উম্মতের মতে, এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়। আল্লহ তা'য়ালা বলেন,

وَ مِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"আর খেজুর, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল থেকে তোমরা নেশাকর বস্তু ও চমৎকার খাদ্য আহরণ করে থাকো। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য" (সূরা আন-নাহল : ৬৭)।

অত্র আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দুরকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে। একটি হলো নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ (শরাব) বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কী প্রস্তুত করবে। নেশাজাত দ্রব্য তৈরী করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে?[৩৭]

দ্বিতীয় পর্যায়ে মদের অপকারিতা ও পাপ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। দীনদারির আবেগকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে মুসলামানদের অন্তরে শরীয়তের যুক্তি ও বুদ্ধিপূর্ণ কথা তুলে ধরা হয়েছে।

---

৩৬. *ফী যিলালিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ২য় খ., পৃ. ২১৪।

৩৭. মুফতি মুহাম্মদ শাফী' (র), *মাআরেফুল কুরআন*, সউদী মুদ্রণ, পৃ. ১১৬।

ইসলামের প্রথম যুগে জাহিলি আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মতো মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে কারীম (সা)-এর হিজরতের পরেও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। মদীনায় পৌঁছার পর কতক সাহাবা মদের অপকারিতা অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আযম, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[৩৮]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا...

"তারা আপনার নিকট মদ ও জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, উভয় জিনিসেই মারাত্মক পাপ রয়েছে, আর মানুষের জন্য (কিছুটা) উপকারও রয়েছে। কিন্তু এর পাপ এর উপকারিতার তুলনায় অধিক মারাত্মক" (সূরা বাকারা : ২১৯)।

উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক মদপান ত্যাগ করে।

তারপর মদের অভ্যাস পরিত্যাগ করানোর জন্য তৃতীয় পর্যায়ে আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াতে মদ্যপানের ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করে যদিও একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি, তবে তা পান করে নামাযে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ٥

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও এসো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তো বুঝতে পারো।" (সূরা নিসা: ৪৩)।

সাহাবারা চিন্তা করতে থাকে, যে জিনিস নামাযের প্রতিবন্ধক হয় তা মোটেই উত্তম জিনিস নয়– অনেকে মদ ত্যাগ করে এবং অনেকে তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অতঃপর সর্বশেষ পর্যায়ে নাযিল হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী আয়াত। কাজেই যখন হারাম ঘোষণার আয়াত নাযিল হলো, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তা পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! মাদকদ্রব্য, জুয়া, মূর্তি-পূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর হলো শয়তানের ঘৃণ্য তৎপরতা, অতএব তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা মাইদা : ৯০)।

---

৩৮. *মাআরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

এ আয়াত দু'টি নাযিলের কারণ সম্পর্কে দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। তা হলোঃ হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রা) কয়েকজন সাহাবীকে আহারের দাওয়াত দেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারপূর্ণ গৌরবগাথা বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। তাতে এক আনসারী উত্তেজিত হয়ে একটি হাড় সা'দ (রা)-এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করলেন, {اَللَّهُمَّ بَيِّن لَنَا فِى الخَمرِ بَيَانًا شَافِيًا}"হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদের একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান করো।' তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি নাযিল হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[৩৯]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ الآيَةَ قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُنَادِي أَلاَ لاَ يَقْرَبَنَّ الصَّلاَةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا.

"উমর ইব্‌ন খত্তাব (রা) বলেন, যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হলো, তখন উমর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টরূপে বর্ণনা করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, যা সূরা বাকারাতে আছে, "লোকেরা আপনার নিকট মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদের বলে দিন, এ দুটিতে আছে বড় গুনাহ.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এরপর উমার (রা)-কে ডাকা হয় এবং আয়াতটি তাকে পড়ে শোনান হয়। তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্ট করে বলে দিন। তখন সূরা নিসার এ আয়াত নাযিল হয়, "ওহে! যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। এরপর সালাতের ইকামত শুরু হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহবানকারী এরূপ ঘোষণা করতেন যে, "কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেনো সালাতে শরীক না হয়। অতঃপর উমর (রা)-কে ডেকে এ আয়াত পড়ে শোনান হয়। তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয়,

৩৯. *মাআরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

"নিশ্চয়ই মদ ও জুয়া ইত্যাদি এরূপ জঘন্য শয়তানী আমল, যা দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে দুশমনী সৃষ্টি করে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকির হতে বিরত রাখে। তবুও কি তোমরা ফিরে আসবে না ? তখন উমর (রা) বলেন, আমরা ফিরে আসলাম।"[৪০]

বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিল হওয়া কোরআনুল কারীমের এই কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও দরদ-সহানুভূতি গড়ে তোলার যে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, কোনো ঝগড়াঝাটি, বিবাদ-বিসংবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবির ও কারো কোনো ক্ষতি-লোকসান ছাড়াই সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং সমাজদেহ থেকে শরাব পানের বদ অভ্যাসটি বিদূরিত হয়েছে। হারাম ঘোষণার এই কয়েকটি আয়াতের সম্মোহনী শক্তি ছিলো এতোই প্রভাবশালী যে, সেগুলো নাযিল হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি অলিগলির মধ্যে এতো বিপুল পরিমাণে মদের পিপা ঢেলে দেওয়া হয় যে মদীনার রাস্তাগুলোতে যেনো মদের ঢল নেমে আসে। যারা পান পাত্র মুখে ধরেছে, এ আয়াতগুলোর শব্দ কানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা থেমে গেছে আর একটি ঢোকও গিলেনি।[৪১]

সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম স্পৃহা

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাহাবীগণ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আদেশ পাওয়া মাত্রই তা পালনে এক অনির্বচনীয় আগ্রহ ও স্পৃহা প্রকাশ করলেন। মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। মদের প্রতি তাদের অন্তরে তীব্র ঘৃণা জমে যায়। শুধু তাই নয়, মদের আসক্তি সৃষ্টি হয় এমন ব্যবহার্য পাত্র সামগ্রীসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সবকিছু তারা ঘর থেকে বের করে ছুড়ে ফেলে দেন। এমনকি তাদের ঘরে পূর্ব থেকে যে সকল মদের পাত্র সংরক্ষিত ছিল তা জনসমুক্ষে নিক্ষেপ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূল কারীম (সা) -এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার অলিগলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্য পান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করছিল তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলিগলির অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির ওপর দৃশ্যমান হতো।[৪২]

عَنْ أَنَس قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُفَقَالُوا أَكْفِئْهَا فَكَفَأْتُهَا.

---

৪০. *আবু দাউদ শরীফ*, কিতাবুল আশরিবাহ্‌, বাব তাহরীমিল খামর্‌, প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৬২৯; তিরমিযী, তাফসীর সূরা ৫, নং ৩০৪৯/৮; মুসনাদ আহমাদ, ১ খ., পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৩৭৮।

৪১. *ফী যিলালিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৪২. *মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

"আনাস (রা) বলেন, একটি আসরে দাঁড়িয়ে আমি আমার চাচাদের ফাযীখ (কাচা ও পাকা খেজুর থেকে তৈরি মদ) পরিবেশন করছিলাম। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এমন সময় বলা হলো, 'মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে'। তখন তারা বললেন, ঢেলে ফেলে দাও। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেলে দিলাম।"[৪৩]

যখন আদেশ হলো, যার কাছে যে মদ রয়েছে তা অমুক স্থানে একত্র করো, তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবাগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সকল মদ একত্র করেছিলেন। মহানবী (সা) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবাগণের দ্বারা ভঙ্গ করলেন।[৪৪]

একজন সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানি করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তার কানে পৌঁছলো তখন সেই সাহাবীও তার সমুদয় মাল যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে রাসূলে আকরাম (সা) -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে কি করতে হবে তার নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সা) হুকুম করলেন, মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তার এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে ফেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জিযা এবং সাহাবাগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন যা এ ঘটনায় প্রমাণিত হলো।[৪৫]

মদের এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা গেলো। তারা ভাবলেন, ইতিপূর্বে যারা মদপান ত্যাগ না করে মারা গেছেন তাদের কী অবস্থা হবে। নিম্নোক্ত হাদীসে এর উত্তর বিবৃত হয়েছে।

عَن اِبنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحرِيمَ الخَمرِ قَالُوا يَا رَسُولَ الله كَيفَ بِإِخوَانِ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُم يَشرَبُونَهَا فَنَزَلَت الاَيَة : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ .

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন মদ হারাম ঘোষণা করা হলো তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ঐসকল ভাইদের কি অবস্থা হবে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ তারা (জীবিত অবস্থায়) মদ পান করতেন। তখন নাযিল হয়, "যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা ইতিপূর্বে যা আহার (মাদক গ্রহণ) করেছে তার জন্য (তাদের বিরুদ্ধে) কোনো অভিযোগ নেই। যখন তারা সংযত হয়েছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, পুনরায় সংযত

---

৪৩. *বুখারী শরীফ*, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নাযালা তাহরীমুল খাম্‌র ওয়া হিয়া মিনাল বুস্‌র্ ওয়াত্তামার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫১৮২, পৃ. ১৮০।

৪৪. *মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৪৫. *মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

হয়েছে, ঈমান এনেছে, আবার সংযত হয়েছে ও উত্তম কাজ করেছে। আল্লাহ উত্তম কাজ সম্পাদনকারীদের মহব্বত করেন" (আল-মাইদা : ৯৩)।"[৪৬] রাসূলে পাক (সা)ও তাদেরকে বলেছিলেন, যদি তাদের জীবদ্দশায় তা নিষিদ্ধ করা হতো তবে তারা তা বর্জন করতো, যেমন তোমরা বর্জন করেছো"।[৪৭]

মাদকাসক্তি নির্মূলে ইসলামী অনুশাসন

সমস্ত পাপের মূল

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা মানুষের চিন্তা-চেতনার মূল উপকরণ। জ্ঞান লোপ পেলে সে যা ইচ্ছা করতে পারে। মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হলে তখন অবচেতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই হাদীস শরীফে মদ্যপানকে সকল পাপের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লহ (সা) বলেন, اَلْخَمرُ أُمُّ الخَطَاء "খামর, সমস্ত পাপের মূল।"[৪৮]

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লহ (সা) বলেছেন,

الخمر ام الفواحش الكبائر وأكثر من شربها وقع على امه وخالته وعمته.

"মদ হলো যাবতীয় অশ্লীলতার প্রধান এবং সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি তা পান করলো, সে যেন নিজ মা, খালা ও ফুফুর সাথে ব্যভিচার করলো।"[৪৯]

আবু দারদা (রা) বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (মুহাম্মদ) এই মর্মে ওসিয়াত করেছেন :

لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

"শরাব পান করো না কারণ তা সমস্ত পাপাচারের উন্মুক্ত দরজা।"[৫০]

রাসূলুল্লহ (সা)-এক হাদীসে বলেছেন,

إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ.

"সাবধান! শবার পরিহার করো। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য সমস্ত পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয় (অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে), যেমন তার গাছ (আঙ্গুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।"[৫১]

এ ব্যাপারে উসমান ইব্ন অফাফ্ফান (রা)-এর থেকে একটি ঘটনাও বর্ণিত আছে। উসমান (রা) বলেন-

---

৪৬. মুসনাদে আহমদ, কিতাবুল আশরিবাহ্, দারুল হাদীস পাবলিকেশন, হাদীস নং ২০৮৮, পৃ. ৫১৫।

৪৭. *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, প্রাগুক্ত, ই.ফা., ৩ খ., পৃ. ৬৪৩।

৪৮. কানযুল 'উম্মাল, হাদীস নং ১৩১৮৩।

৪৯. ত্বাবারানী, সঃ জামে', হাদীস নং ৩৩৪৫।

৫০. *সুনানু ইবনে মাজা*,কিতাবুর আশরিবাহ, ১-বাবুল-খামরি মিফতাহু কুল্লি শার, হা. নং ৩৩৭১, পৃ. ২৩৫।

৫১. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুর আশরিবাহ, ২-বাব মান শারিবাল খাম্‌র ফিদ-দুন্‌য়া...., হা. নং ৩৩৭২, পৃ. ২৩৫।

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

"তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর। কেননা তা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতী। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক কুলটা রমনী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক চাকরাণীকে তার (আবেদ ব্যক্তি) নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। যখন সে ঘরে প্রবেশ করলো তখন ঐ দাসী ঘরের সব ক'টি দরজা বন্ধ করে দিলো। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা শরাব। সেই নারী আবেদকে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি, বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা এই শরাব পান করবেন অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বললো, আমাকে এই শরাবের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা শরাবই পান করালো। তখন সে বললো, আরও দাও। অবশেষে ঐ আবেদ তার সাথে ব্যভিচার ব্যতীত ঐ স্থান ত্যাগ করলো না এবং সে ঐ ছেলেকেও হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ করো। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ! শরাব ও ঈমান একত্র হতে পারে না, এমনকি একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।"[৫২]

মদপান করলে বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, যা সকল প্রকার নিন্দনীয় কাজে মানুষকে জড়িত করে। ফলে তার মাধ্যমে খুন-খারাবি ও নানা রকম অন্যায় কাজ অবলীলায় ঘটে যায়। নানা রকম আত্মিক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। অনেক সময় তা ধ্বংসেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৫৩]

মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না

রাসূলুল্লাহ (সা) মদ্যপায়ীর ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদের ব্যাপারে বলেছেন, এরা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে পারবে না।

নবী করীম (সা) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

---

৫২. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুর আশরিবাহ, ৪৪-বাব যিকরিল আছামিল মুতাওয়াল্লাদ আন শারবিল খাম্‌র...., নং ৫৬৭১।

৫৩. *তাফসীরে উসমানী*, ১ম খ., ই.ফা., ২য় সং., নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৪৬।

"শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৫৪]

নবী (সা) আরো বলেছেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

"যে লোক উপকার করে খোটা দেয়, যে লোক মাতাপিতার অবাধ্য হয় এবং যে লোক সর্বদা শরাবপানে অভ্যস্ত, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৫৫]

মহানবী (সা) বলেছেন,

هِلية جَامَيتة تَمَ ابَطنِهِ فِيْهي وَتَمَا فَإِنْ مِنْهُ صَلاَتهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُقْتَلْ لَمْشرِبَهَا فَمَنْ أُمُّ الْخَبَائِثِ الْخَمْرَ.

"মদ যাবতীয় নোংরামির মূল। যে কেউ তা পান করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। যে ব্যক্তি তার মূত্রথলিতে ঐ মদের কিছু পরিমাণ রাখা অবস্থায় মারা যাবে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে এবং যে কেউ তা পেটে রেখে মারা যাবে, সে জাহেলী যুগের মরণ মরবে।"[৫৬]

মদ্যপায়ীর ঈমানী ও নৈতিক ক্ষতি

মদ ও মাদক এমন এক ভয়ংকর নেশা, যা খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, আত্মহত্যাসহ নানাবিধি পাপাচারের পথে নিয়ে যায়। মাদকসেবীরা বহুগামিতা, সমকামিতা ও যৌনাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্তি আল্লাহ্র স্মরণেও নামাযে বাধা দিতে চায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ .

"এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে ও নামায পড়তে বাধা দিতে চায়।" (সূরা মাইদা : ৯১)

মদ্যপায়ী মদ পানের সময় ঈমানদার থাকে না।

মহানবী (সা) বলেন,

مَن زَنٰى اَو شَرِبَ الخَمرَ نَزَعَ الله مِنهُ الاِيمَانَ كَمَا يَخلَعُ الاِنسَانُ القَمِيصَ مِن رَاسِهِ

"যে ব্যক্তি যেনা করে কিংবা শরাব পান করে, আল্লাহ তার উপর থেকে ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে যান-যেভাবে মানুষ মস্তকের দিক দিয়ে জামা খুলে নেয়।"[৫৭]

---

৫৪. *সুনানু ইবনে মাজা,* কিতাবুর আশরিবাহ, ৩- বাব মুদমিনুল খাম্‌র, হা. নং ৩৩৭৬, পৃ. ২৩৬।

৫৫. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুল আশরিবাহ, বাব আর-রিওয়ায়াতু ফিল মুদমিনিনা ফিল খামর্‌, হাদীস নং ৫৫৭৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং১১১৬৫।

৫৬. ত্বাবারানী, হাদীস নং ১৫৪৩; দারাকুত্বনী, হাদীস নং ৪/২৪৭; সিলসিলাহ সহীহাহ, হাদীস নং. ২৬৯৫।

৫৭. মুস্তাদরাকে হাকিম, ১: ২২।

রাসূলুল্লহ (সা) বলেছেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা সময় মু'মিন থাকে না। মদখোর যখন মদপান করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না। আর যখন কেউ এমনভাবে ছিনতাই করে যে, লোক দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন থাকে না।"[৫৮]

পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে মদ পান করে নাই তাদের জন্য জান্নাতে মদপানের ব্যবস্থা থাকবে।

রাসূলুল্লহ (সা)বলেছেন-

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ تَرَكَ الْـخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِيْ حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ

"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেন নি, আমি তাকে অবশ্যই পবিত্র বিশেষ স্থান জান্নাতে মদ পান করাবো।"[৫৯]

মদ্যপায়ীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন থাকা

মুসলিম মাত্রই শরাব পানের আসর বা মজলিস পরিহার করে চলার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। মদ্যপায়ীর সঙ্গে ওঠা-বসা ও মেলামেশা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সা) বলেন,

مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَاليَومِ الاخِرِ فَلاَ يَقعُد عَلٰى مَائِدَةٍ تَدَاُرَ عَلَيهَا الخَمرُ.

"আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার ব্যক্তি যেনো এমন আসরে একত্রে না বসে, যেখানে সুরা পরিবেশন করা হয়।"[৬০]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, "শরাবখোরকে সালাম দিবে না।"[৬১]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেছেন,

لَا تَعُودُوا شَرَّابَ الخَمرِ اِذَا مَرِضُوا.

"মদ্যপ রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাকে দেখতে যেও না।"[৬২]

---

৫৮. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুর আশরিবাহ, ৪২- বাব মদের অপকারিতা সম্পর্কীয় বিবরণ, হাদীস নং ৫৬৬৪ ।

৫৯. সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ২৩৭৫।

৬০. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৪৬৯২; ত্বাবারানী/কাবীর, খ. ১১, হাদীস নং ১১৪৬২।

৬১. সহীহ আল-বুখারী, সম্পাদনায়- মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলনা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, কিতাবুল ইসতিযান, ২১তম বাব, পৃ. ৫০৪।

এক হাদীসে বলা হয়েছে, ফেরেশতাগণ মদ্যপায়ীর নিকটবর্তী হয় না। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْـمَلاَئِكَةُ: الْـجُنُبُ وَالسَّكْرَانُ وَالْـمُتَضَمِّخُ بِالْـخَلُوْقِ.

"ফেরেশতারা তিন ধরনের মানুষের কাছে ঘেঁষে না : জুনুবী ব্যক্তি (যার গোসল ফরজ হয়েছে), মদ্যপায়ী এবং খালূক (কালো রং-এর খেযাব) ব্যবহারকারী ব্যক্তি।"[৬৩]

মদ্যপানকারীর নামায কবুল হয় না

নামায ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ। মদ্যপানের কারণে শুধু শারীরিক ক্ষতিই হয় না, আধ্যাত্মিক ক্ষতিও সাধিত হয়। হাদীসে এসেছে, মদ পানকারীর চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ.

"যে ব্যক্তি মদপান করে চল্লিশ ভোর (দিন) পর্যন্ত তার সালাত কবুল হয় না। অতঃপর সে তওবা করলে আল্লহ তার তওবা কবুল করবেন। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ তায়ালা চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার সালাত কবুল করবেন না। অতঃপর যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল কববেন। আবার যদি সে তা পান করে তবে চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার সালত কবুল করবেন না। কিন্তু সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। চতুর্থবার যদি সে তা পান করে তবে চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার সালাত কবুল করবেন না এবং তওবা করলেও আল্লাহ আর তা কবুল করবেন না। পরন্তু তাকে "নাহরে খাবাল" থেকে পান করাবেন। ইবন উমার (রা)-কে বলা হলো, হে আবু আবদুর রহমান! 'নাহরে খাবাল' কি? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের পুঁজের নহর।"[৬৪]

উরওয়া ইব্ন রুওয়ায়ম (র) বলেন,

أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ

---

৬২. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, বাংলা অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, অনুচ্ছেদঃ রুগ্ন পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া, আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, পৃ. ২২৬।

৬৩. সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ২৩৭৪।

৬৪. তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল আশরিবাহ, ১- বাব মা যাআ ফি শারিবেল খাম্‌র, ই.ফা., ৪ খ., হাদীস নং ১৮৬৮, পৃ. ৩৩৮।

بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

"একদা ইব্‌ন দায়লামী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)-এর খোঁজে যাত্রা করলেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবদুল্লাহ ইবন আমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শরাব পান সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের কেউ শরাব পান করলে আল্লাহ তায়ালা তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করবেন না।"[৬৫]

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا.

"যে ব্যক্তি শরাব পান করলো, অথচ নেশাগ্রস্ত হলো না, তার নামায কবুল হবে না, যতক্ষণ ঐ শরাব তার পেটে অথবা শিরায় অবস্থান করবে। যদি ঐ ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা যায় তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে।"[৬৬]

অতএব উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, মদ্যপান একটি মারাত্মক গুনাহের কাজ। মদ্যপানের দরুন মানুষের ঈমান পর্যন্ত হরণ হয়ে যায়।

সমস্ত মাদক দ্রব্যই হারাম

ইসলামী শরীয়াত সকল প্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্যকে সম্পূর্ণভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করেছে। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মাঝে এটি আজও পর্যন্ত হারাম বলে বিবেচিত।

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا فَمَا أَشْرَبُ قَالَ اشْرَبْ وَلاَ تَشْرَبْ مُسْكِرًا.

"আবু বুরদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এবং মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান। মু'আয (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন এক দেশে পাঠাচ্ছেন, যেখানে অধিকাংশ লোক শরাব পান করে থাকে। আমরা কী পান করবো? তিনি বললেন, তোমরা শরবত জাতীয় পানীয় পান করবে, কিন্তু ঐ পানীয় যাতে মাদকতা থাকে তা পান করবে না।"[৬৭]

---

৬৫. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুর আশরিবাহ, ৪৩- বাব যিক্র রিওয়ায়াতিল মুবায়্যিনাহ্ আন সালাতি শারিবিল খাম্‌র, হাদীস নং ৫৬৬৭, পৃ. ৩৩৬।

৬৬. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুর আশরিবাহ, ৪৪- বাব যিকরুল আছামিল মুতাওয়াল্লাদ আন শারবিল খাম্‌র,ই.ফা., হাদীস নং ৫৬৭১, পৃ. ৩৩৮।

৬৭. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুর আশরিবাহ, ২৩- বাব তাহরীমু কুল্লি শারাবিন আসকার, ই.ফা., হাদীস নং ৫৫৯৯, পৃ. ৩১৮।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম।"[৬৮]

মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ.

"প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য হারাম।"[৬৯]

মহানবী (সা) আরো বলেছেন,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ.

"যেসব পানীয় দ্রব্য নেশার উদ্রেক করে, তা-ই হারাম।"[৭০] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

"যা নেশা সৃষ্টি করে তা-ই মদ। আর মদ মাত্রই হারাম।"[৭১]

আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"নবী (সা) কে মধু দ্বারা প্রস্তুত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকর সকল পানীয়ই হারাম।"[৭২]

মনে রাখতে হবে, যে বস্তুটি বেশী পরিমাণে নেশা করলে নেশা আসে তার সামান্য পরিমাণও পান করা হারাম। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

"যে বস্তুর বেশী পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার কম পরিমাণও হারাম।"[৭৩]

মহানবী (সা) বলেছেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

---

৬৮. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাব ৯, ই.ফা., হা. নং ৩৩৮৭, পৃ. ২৪০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৪৬৪৪, ৯৫০৫, ১৯৫৬৪।

৬৯. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আশরিবাহ, ৯- বাব কুল্লি মুসকিরিন হারাম, ই.ফা., হাদীস নং ৩৩৮৯, পৃ. ২৪১।

৭০. *বুখারী শরীফ*, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব আল-খামর মিনাল আস্ল...., ৯ খ., ই.ফা., হাদীস নং ৫১৫৭।

৭১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ্, ৩ খ., দারুল হাদীস প্রকাশনা, হাদীস নং ৩৭৩৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৪৮৩১, ৪৬৪৫।

৭২. তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল আশরিবাহ, ২- বাব মা জাআকুল্লু মুসকিরিন হারাম , ই.ফা., ৪ খ., হা. নং ১৮৬৯, পৃ. ৩৩৮।

৭৩. তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল আশরিবাহ, ৩- বাব মা জাআ মা আসকারা কাছিরুহু ফা কলিলুহু হারাম , হাদীস নং ১৭৮৮।

"নেশা সৃষ্টিকর প্রত্যেক বস্তুই হারাম। যে বস্তুর মটকা পরিমাণ পান করলে নেশাগ্রস্ত করে এর এক আঁজলা পরিমাণও হারাম।"[৭৪]

আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লহ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

"প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকর বস্তুই হারাম। আর যে বস্তুর অধিক পানে নেশার উদ্রেক হয় তা এক অঞ্জলি পরিমাণও পান করা হারাম।"[৭৫]

অভিশপ্ত কাজ

মদ্যপান অথবা যে কোনো নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ তথা সেবন (চাই তা খেয়ে কিংবা পান করেই হোক অথবা ঘ্রাণ নেওয়া কিংবা ইঞ্জেকশান গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ, যার উপর আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সা) -এর অভিশাপ ও অভিসম্পাত রয়েছে। আনাসইব্ন মালেক (রা) বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ وَحَامِلَهَاوَالْمَحْمُولَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا وَالْمُبْتَاعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ.

"রাসূলুল্লহ (সা) দশভাবে শরাবের লা'নত করেছেন। এর উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা যার জন্য উৎপাদন করা হয়, তা বহনকারী, যার জন্য তা বহন করা হয়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তা পরিবেশনকারী এবং যার জন্য তা পরিবেশন করা হয়, এভাবে তিনি দশজনের উল্লেখ করেছেন।"[৭৬] আবূ হুরায়রা (রা) মি'রাজ রজনীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন,

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

"রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নিকট দুধ এবং শরাব উপস্থিত করা হলে তিনি দুধকেই গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল (আ) তাকে বললেন, আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি আপনাকে ফিতরাতে বা স্বভাব ধর্মের প্রতি হিদায়াত দান করেছেন। যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হতো।"[৭৭]

---

৭৪. তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল আশরিবাহ, ৩- বাব মা জাআ মা আসকারা কাছিরুহু ফা কলিলুহু হারাম ,ই.ফা., ৪ খ., হা. নং ১৮৭২, পৃ. ৩৪০।

৭৫. সুনানু *আবু দাউদ*, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব মাযাআ ফিস্সুকর, দারুল ফিক্র প্রকাশনা, , হা. নং ৩৬৮৭, পৃ. ৬৯২।

৭৬. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আশরিবাহ, ৬- বাব লুয়িনাতুল খামর্ আলা আশারাতি আওয়ুহ, ই.ফা., ৩ খ., হাদীস নং ৩৩৮১, পৃ. ২৩৮।

৭৭. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুর আশরিবাহ, বাব মানযিলা আল-খামর্, ই. ফা., ৬ খ., হাদীস নং ৫৬৬০, পৃ. ৩৩৪।

অভ্যস্ত মাদকসেবী হচ্ছে মূর্তীপূজক সমতুল্য।

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ..

"শরাবখোর ব্যক্তি (পাপের ক্ষেত্রে) মূর্তিপূজকের ন্যায়।"[৭৮]

আল্লাহ ও রাসূলের কঠোর নিষেধাজ্ঞার পরেও একজন মুসলমান মাদকাসক্ত হতে পারে না। কিন্তু যা বাস্তব তা হলো শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিমের দেশসহ বাংলাদেশ এখন মাদকাসক্তির করাল গ্রাসে নিপতিত। ধর্মানুভূতির অভাব এবং ইসলামী অনুশাসন পালন না করার কারণে আজ আমাদের সমাজে ঘটেছে মাদকাসক্তির মতো মহাবিপর্যয়। তাই ব্যক্তি জীবনে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও সমাজে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল মাদকাসক্তির করাল গ্রাস হতে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে রক্ষা করা সম্ভব।

মদের ব্যবসাও হারাম

শরাবের অনিষ্টতা ও পাপের দিক লক্ষ্য করেই ইসলাম এর ব্যবসাও হারাম করেছে। আর মদের ব্যবসা করে মানুষ যে সম্পদ আহরণ করে তাকে হারাম মাল বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, তাতে আল্লাহ বরকত দান করবেন না। আর যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে তা ব্যয় করে তবে তা কবুলও করা হবে না। মহানবী (সা) মাদক ব্যবসায়ীর ব্যাপারে বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

"আল্লাহ্র অভিশাপ পতিত হোক শরাবের উপর, তা পানকারীর উপর, যে পান করায় তার উপর, যে বিক্রি করে তার উপর, যে তা খরিদ করে তার উপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার উপর, আর যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে, সকলের উপর।"[৭৯] আইশা (রা) বলেন,

لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.

"সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে আসেন এবং তা লোকদের পড়ে শোনান। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।"[৮০]

সুরাপানের সব পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, কোন মুসলমান যেন এমন কোন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় না করে, যার সম্পর্কে জানা যাবে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা সুরা তৈয়ির করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

---

৭৮. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আশরিবাহ, ৩- বাব মুদমিনিল খামর্, ই.ফা., ৩ খ., হাদীস নং ৩৩৭৫, পৃ. ২৩৬।

৭৯. আবু দাউদ, কিতাবুল আশরিবাহ, বাব ২, হাদীস নং ৩৬৭৪।

৮০. তিরমিযী শরীফ, কিতাব ঃ মুসাকাত ও মুযারা'আত, বাব বাইয়ুল খামর্ হারাম, ই.ফা., ৪ খ., হাদীস নং ৩৯০১, পৃ. ৮৫।

مَن حَبَسَ العَنَبَ اَيَّامَ القِطَافِ حَتّٰى يَبِيعَهُ مِن يَّهُودِيٍّ اَو نَصرٰنِيٍّ اَو مِمَّن يَّتَّخِذُه خَمرًا فَقَد تَقَحَّمَ النَّارَ عَلٰى بَصِيرَةٍ.

"যে লোক আঙ্গুরের ফসল কেটে ঘোলাজাত করবে কোন ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশে যে তা থেকে সুরা তৈরি করবে, তাহলে সে জেনে-শুনেই আগুনে ঝাপ দিল।"[৮১]

কিয়ামতের পূর্বে মদের ব্যাপকতা

কিয়ামতের একটি আলামত হলো মাদকতা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে, মদ্যপায়ীরা তা পান করাকে অপরাধ মনে করবে না। শুধু তাই নয়, শেষ যমানায় মানুষ মদকে বিভিন্ন নামের ছদ্মাবরণে পান করবে বলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ .

"আমার উম্মতের কতিপয় লোক শরাবের ভিন্নতর বিশেষ নাম রেখে তা পান করবে।"[৮২]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِأَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ.

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে এমন একটি হাদিস শুনেছি যা আমি ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের বর্ণনা করবেন না। তিনি বলেন, কিয়ামতের লক্ষণসমূহের কতক হলো- অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, ইলম (দীনী ইলম) কমে যাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হতে থাকবে, মদ্যপানের হিড়িক পড়ে যাবে।"[৮৩]

মদ্যপায়ীর পার্থিব শাস্তি

মদ্যপান ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি কঠিন গুনাহ এবং ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এজন্য শরীয়াত অনুযায়ী শাস্তি দান একান্তই কর্তব্য। কিন্তু কুরআন মজীদে এর কোনো শাস্তির উল্লেখ নেই। তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে আশি দোররা। তাদের দলীল হচ্ছে-

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ .

---

৮১. *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৮২. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আশরিবাহ, ৮- বাব আল-খামর য়ূসাম্মুনাহা বিগায়রি ইসমিহা, ই.ফা., ৩ খ., হাদীস নং ৩৩৮৫, পৃ. ২৪০।

৮৩. *বুখারী শরীফ*, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব ঃ ১ম, ই.ফা., ৯ খ., হাদীস নং ৫১৭৭, পৃ. ১৭৮।

"সাওর ইব্‌ন যায়েদ আদ-দীলী (র) হতে বর্ণিত। উমর (রা) মদ্যপানের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রা) -এর নিকট পরামর্শ চাইলেন। হযরত আলী (রা) বললেন, আমার মতে বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। কেননা মানুষ মদ্য পান করে মাতাল অবস্থায় অকথ্য কথা বলবে বা কোনো গালিই দিয়ে বসবে। অতঃপর উমর (রা) মদ্য পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করলেন।"[৮৪]

কতক ফকিহর মতে, মদ্যপায়ীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হচ্ছে-রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

إِذَا سَكِرَ فَجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَجلدوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَجلدوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ

"যে মদপান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। পুনরায় মদপান করলে তাকে আবার বেত্রাঘাত কর, আবার মদপান করলে আবার বেত্রাঘাত কর, চতুর্থবারে তিনি বললেন, তাকে হত্যা কর।"[৮৫]

ইমাম তিরমিযী এই বর্ণনাটির ব্যাপারে বলেছেন, এ আইন ইসলামের প্রথম দিকে কার্যকর ছিলো। পরে তা বাতিল হয়ে যায়।[৮৬]

মদ্যপায়ীর পরকালীন শাস্তি

মানুষের কোন কাজটি ক্ষতিকর আর কোনটি উপকারী তা নির্ধারণ করা একটি গভীর গবেষণামূলক বিষয়। অনেক কাজ এমনও রয়েছে যার ক্ষতির দিকটি আপত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। হয়তো বছরের পর বছর অনুসন্ধান চালিয়েও কাজটির দূরবর্তী ক্ষতি সাধন প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা সম্ভব হয়না, এ কারণে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে মানবতার জন্য ক্ষতিকর কাজগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মানুষের ইহ-জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিধায় এগুলোর সম্পাদনা অপছন্দ করেছেন এবং নিষিদ্ধ করেছেন। আর এই গর্হিত কাজে যারা লিপ্ত হবে তাদের জন্য রয়েছে পরকালীন শাস্তি।

আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

وَأَمَرَنِى رَبِّى عَزَّوَجَلَّ بِمَحقِ المَعَازِفِ وَالمَزَامِيرِ وَالاَوثَانِ وَالصَّلِيبِ وَاَمرِ الجَاهِلِيَّةِ اِنَّ اللهَ بعَثَنِى رَحمَةَ لِّلعَالَمِين وَهَدٰى لِّلعَالَمِينَ وَحَلَفَ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ بِعِزَّتِى لَايشرِبُ عَبد مِن عبيدى جَرعَةً مِن الخَمرِ الاسقَيتَهُ مِن الصَّدِيدِ مِثلُهَا وَلَا يترِكُهَا مَخَافَتِى الاَسقَيتَه مِن حَيَاضِ القُدُسِ.

"আল্লাহ আমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত ও হিদায়াতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আর আমার মহান রব আমাকে আদেশ করেছেন সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র, প্রতিমা, ক্রুশ ও জাহিলী যুগের প্রথা ধ্বংস করার জন্য। আমার মহান রব হলফ করে বলেছেন, আমার ইজ্জতের কসম!

---

৮৪. মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), কিতাবুল আশরিবাহ, ১- বাব আল-হাদ ফিল খামর্, ই.ফা., ২য় খ., হাদীস নং ২, পৃ. ৫৫২।

৮৫. সুনানু নাসাঈ শরীফ, কিতাবুর আশরিবাহ, বাব যিক্‌র রুইয়াত ফি শারাবিল খামর্, ই. ফা., ৬ খ., হাদীস নং ৫৬৬৫, পৃ. ৩৩৬; সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ১৩৬৪।

৮৬. نيل الارطار ج ٧ ص ١٥٥

আমার যে বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে, তাকে আমি ঐ পরিমাণ পুঁজ পান করাবোই। আর যে আমার ভয়ে তা বর্জন করবে, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র হাওযসমূহের উত্তম পানীয় পান করাবো।"[৮৭] আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّسْقِيَهُ اللهُ الْـخَمْرَ فِيْ الْآخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهَا فِيْ الدُّنْيَا، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّكْسُوَهُ اللهُ الْـحَرِيْرَ فِيْ الْآخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهُ فِيْ الدُّنْيَا.

"যার মন আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আখিরাতে মদ পান করাবেন, সে যেন দুনিয়াতে মদ পান করা ছেড়ে দেয় এবং যার মনে আনন্দ অনুভূত হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আখিরাতে সিল্কের কাপড় পরাবেন সে যেন দুনিয়াতে সিল্কের কাপড় পড়া ছেড়ে দেয়।"[৮৮]

মদ্যপায়ীর পার্থিব ক্ষতিসমূহ

পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগী শুধু নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; কিন্তু মাদকে আক্রান্ত ব্যক্তি তার শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অর্থাৎ নিজেকেই পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। নিম্নে মাদকদ্রব্য গ্রহণের ক্ষতির দিকগুলো উল্লেখ করা হলো-

শারীরিক ক্ষতি

মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মদ্যপায়ীর জিহ্বা ক্রমশ ভারী হতে থাকে। এমনকি জিহ্বায় ক্যান্সারের মতো রোগও হয়। মাদকাসক্তি মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল ধ্বংস করে দেয়; অনেক সময় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও হয়। অগ্ন্যাশয় ও কিডনীতে প্রদাহের সৃষ্টি করে এবং এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। রক্তচাপ বৃদ্ধিসহ রক্তকনিকা সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে এবং অস্থিমজ্জায় সুষ্ঠুভাবে রক্তকনিকা তৈরি হয় না। ত্বকের ইলাসটিসিটি ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পেপটিক আলসার, লিভার সিরোসিস, ব্রংকাইটিস, ঠোঁটের ক্যান্সার, জরায়ুর ক্যানসার, মাড়ির ক্যান্সার, নিউমোনিয়া, জন্ডিস, কোষ্ঠকাঠিন্য, হেপাটাইটিসসহ যক্ষ্মার মতো ব্যাধিতে মদ্যপায়ী আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়; ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়; মাংসপেশীতে পচন সৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়ে যাওয়া

দীর্ঘদিন মাদক সেবনের ফলে ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট হয়ে যায়, সে হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে। বিশেষ করে কিশোর বয়সে এ ধরনের আসক্তি শুরু হলে এর পরিণতি ভয়াবহ হয়। ছাত্ররা মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তাদের লেখা-পড়ার চরম অবনতি ঘটে। মাদকাসক্তির কারণে ব্যক্তির বিকাশ (Development) ব্যাহত হয়। অন্যদিকে অত্মমর্যাদা কমে গেলে একজন মাদকসেবী যেকোনো কাজই করতে পারে।

মানসিক ক্ষতি

মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিমাণ অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। মাদকাসক্ত

---

৮৭. আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র), তাফসীরে মাযহারী, ১ম খ., ই.ফা., জুন ১৯৯৭, পৃ. ৫৯৩।

৮৮. ত্বাবারানী / আওসাত্ব, ৮ খ., হাদীস নং ৮৮৭৯।

অবস্থায় স্নায়ুবিক চাপ ও অসচেনতা বৃদ্ধি পায় এবং স্মরণশক্তির ঘাটতি সৃষ্টি হয়। নিজের মধ্যে অস্থিরতা, বিষণ্নতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা কাজ করে। হিংসা, ঘৃণা, আত্মদুঃখ, ভয়, লজ্জা, জিদ, রাগ, হতাশা, প্রতিশোধস্পৃহা, সংকোচ, স্বার্থপরতা, একাকিত্ব ইত্যাদি নেতিবাচক পরির্বতন মদ্যপায়ীদের আচরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি হতে শুরু করে স্কিজোফ্রেনিয়া নামক ভয়াবহ মানসিক রোগও হতে পারে।

পারিবারিক ক্ষতি

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, পরিবারের সকল সদস্যদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পরিবারের অন্য সদস্যদের জান-মাল, সম্পদের নিরাপত্তা এবং মান-সম্মান বিনষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করে না। কখনো মদ্যপায়ীর সংসার ভেঙ্গে যায়। ফলে অনেক শিশু এতিম হয়ে যায়। অনেক সময় মাদকাসক্তি ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এর শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। অল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

"নিশ্চয়ই শয়তান মাদকদ্রব্য ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াতে চায়।" (সূরা মাইদা : ৯১)

সামাজিক ক্ষতি

মাদকাসক্তি সমাজস্থ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, হৃদ্যতায় বিচ্ছেদ ঘটায়। এটি মানুষকে মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যাভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। বিভিন্ন প্রকার কুধারণা-কুমন্ত্রণা মদ্যপায়ীকে আবৃত করে নেয়। ফেতনা-ফাসাদ এবং বিভিন্ন পাপকার্য সংঘটিত হওয়ার পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সুরা। সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ মাদকাসক্তি। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে বাস, ট্রাক, রেল, বিমান ইত্যাদি যানবাহন চালনা করলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে জান-মালের অনেক ক্ষতি হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

মাদকদ্রব্যের অর্থনৈতিক ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মাদকাসক্তরা নিজেরা সর্বশান্ত হচ্ছে, পরিবারকেও পথে বসাচ্ছে। যদি কোনো এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়। এমনকি নেশার টাকা যোগানোর জন্য মদ্যপায়ীরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই অপকর্মের মতো কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষতি

রাজনৈতিক অঙ্গনে মাদকাসক্তির প্রভাব খুবই ন্যক্কারজনক। রাজনীতিবিদরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে একটি দেশের সার্বিক অবস্থাই পঙ্গু হয়ে যায়। দেশের মধ্যে হত্যা, প্রতিহিংসা ও আত্মসাৎ হয়ে ওঠে প্রধান মূলমন্ত্র।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য করণীয়

মাদকাসক্তরা বার বার মাদক সেবনের ফলে তাদের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলেন। এমনকি তারা তাদের নিজেদের ভালো-মন্দ বিষয়ে উপলব্দি করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই যেকোনো কাজ স্বাভাবিকভাবে সম্পাদন করতে

ব্যর্থ হন। মাদকাসক্তি চিকিৎসায় ব্যক্তির নিজ ও পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এক্ষেত্রে ঐ অবস্থা থেকে নিজেদেরকে উদ্ধারের জন্য মাদকাসক্তরা তাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় নিম্নে বর্ণিত পরামর্শগুলো গ্রহণ করতে পারেন-

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া

মাদকের চিকিৎসা একটা দীর্ঘ মেয়াদী ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা। অনেক মাদকাসক্ত মনে করেন যে, ইচ্ছা করলেই মাদক ছেড়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মাদকাসক্তদের চিকিৎসারও একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি রয়েছে। সেই চিকিৎসা প্রক্রিয়ার আওতায় রোগীকে আসতে হবে। বিষয়টা এমন না যে, ইচ্ছা করলেই কেউ মাদকাসক্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে। সুতরাং এর প্রতিকারের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ এবং মাদক পুনর্বাসন-কেন্দ্রের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হবে। কোনোক্রমেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন করা যাবে না। এছাড়া ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজিস্ট ও কাউন্সেলরদের চিকিৎসা সেবা নিয়ে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজিস্ট ও কাউন্সেলরগণ মাদকাসক্তদেরকে ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ তথা চিন্তার ক্রুটি নির্ধারণ করতে বা বুঝতে সাহায্য করেন, যৌক্তিক ও ইতিবাচক চিন্তা করতে সাহায্য করেন, সমস্যা সমাধান করতে এবং চাপের মোকাবেলা করতে শেখায়।

সামাজিক দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে সমার্থন করতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণের ফলে মাদকাসক্তদের ভিতরে যে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ তৈরী হয় তা ভাঙ্গতে সাহায্য করে। সর্বপরি ব্যক্তিক্ষেত্রে লাইফ স্টাইল-এ পরিবর্তন নিয়ে আসতে এবং পরিপূর্ণ জীবন যাপনে সাহায্য করা হয়।

ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসারী হওয়া

মদ, মদের ব্যবহার, মাদক সংশ্লিষ্ট যতো রকমের বাণী কুরআন ও সুন্নাহ্তে বিদ্যমান রয়েছে তা জানতে হবে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনই এ মরণ-ছোবল থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে পারে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসারী হতে পারলে মাদকাসক্তিসহ সকল প্রকার অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

তাকওয়া অর্জন

ইসলামী জীবনদর্শনে সকল সৎগুণের মূলে রয়েছ তাকওয়া। ব্যক্তির উন্নত চরিত্র গঠন ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাকওয়া সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। আল্লাহভীতি একটি মহৎ গুণ যা মদ্যপানের মতো গর্হিত অপরাধ থেকে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি তাকওয়ার বলে বলীয়ান সে কখনও মন্দকাজের চিন্তাও করতে পারে না। কারণ সে সর্বদাই আল্লাহ্র ভয়ে ভীত।

মোবাইল ফোন ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা

মাদকাসক্ত ব্যক্তির মোবাইল ফোন ব্যবহারে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। মাদক আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল ফোন সবচেয়ে বেশি কার্যকর। যেসব বন্ধু-বান্ধবের সংস্পর্শে ব্যক্তি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। এমনকি তাদের সাথে যোগাযোগও রাখা যাবে না এবং প্রয়োজনে ফোন নম্বরও পরিবর্তন করতে হবে। সেই সঙ্গে বেশি বেশি করে ভালো বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সান্নিধ্যে আসতে হবে।

পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী করতে হবে। মন ভালো হয়ে যায় এমন কাজ করা যেমনঃ মুভি দেখা, পরিবার-পরিজন নিয়ে দর্শণীয় স্থানে ভ্রমণ করতে হবে, মাদকাসক্তদের বাসায় কখনো একা একা না থাকা এবং নিয়মিত সুষম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা

যেসব স্থানে মাদকাসক্তরা মাদক সেবন করতো এবং নিয়মিত আড্ডা দিতো, সেইসব স্থান এড়িয়ে চলতে হবে। যে সময়টায় তিনি মাদক সেবন করতেন, সেই সময়টায় (দুপুরবেলা কিংবা বিকেলবেলা) কিন্তু তার মনে মাদক সেবনের উদ্রেক হতে পারে। তাই নেশা দ্রব্যের ক্ষতিকর গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে। মোটকথা, মাদকাসক্তদের জীবন-যাপনে আমূল ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে।

সুস্থ বিনোদনে অংশগ্রহণ

সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন সুস্থ সমাজের পরিচায়ক। এই সংস্কৃতির মধ্যে মাদকাসক্তদের নিজেদেরকে পরিচালিত করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে সুস্থ বিনোদনের চর্চা করতে হবে। ইনডোর-আউটডোর গেমস-এ তাদের নিজেদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। এছাড়া বই পড়া, নিয়মিত সংবাদপত্র পড়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, টিভি দেখা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে তাদের নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয়

মাদকাসক্তির কারণে দেশে যুব সমাজের নিজেদের জীবন শুধু বিপন্ন হয় না, এতে গোটা পরিবার বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজ সমাজে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাদক সমস্যা। যার অভিশাপ থেকে যুব সমাজ মুক্ত হতে পারছে না। আসক্ত তরুণ-তরুণীর অধিকাংশ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এ থেকে উত্তরণের জন্য আমরা নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি-

সচেতনতা বৃদ্ধি

শিশুকাল থেকেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তোলতে হবে, যাতে তারা ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ পালনে আগ্রহী হয়। সাথে সাথে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা তৈরি করতে হবে, যাতে তারা আল্লাহ পাকের প্রতিটি আদেশ পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। মাদক গ্রহণের ক্ষতিকর বিষয় সম্বন্ধে শারীরিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলো তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

নৈতিক শিক্ষা সঠিকভাবে প্রদান

পিতা-মাতা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ খুব ছোটবেলা থেকেই নৈতিক শিক্ষা সঠিকভাবে প্রদান করলে একটি শিশুর নৈতিক জ্ঞানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, কোন কাজটি করা উচিত নয়, কোন কাজগুলো সমাজের জন্য উন্নতি বয়ে নিয়ে আসবে এ বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে শিশুকে শেখাতে হবে।

পরিবারের ভূমিকা

পরিবার হলো একটি দুর্গের ন্যায়। আর পরিবারের সদস্যগণ দুর্গের সুরক্ষিত অধিবাসী। দুর্গ যেমন শত্রুর জন্য দুর্ভেদ্য, তার ভেতরে বসবাস ও জীবনযাত্রা যেমন নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সবরকমের আশঙ্কামুক্ত; পরিবারও তেমনি এর সদস্যদের নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ, অসৎ জীবন এবং অশ্লীলতার আক্রমণ থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। পরিবারে বসবাসরত ছেলে-মেয়ের পক্ষে মাতা-পিতা, ভাই-বোনদের শাসন ও নিকটাত্মীদের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতা বিরোধী কাজ করা খুব সহজ নয়।[৮৯]

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা

মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে কিশোর এবং যুবকদের সচেতন ও সতর্কতা করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করে স্কুল-কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মাদকের অপব্যবহার রোধে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভয় দেখিয়ে মাদকাসক্তি দূর করা যাবে না; বরং ভালোবাসা, শিক্ষা ও সম্মান দিয়ে মাদকাসক্তদের সমাজে ফিরিয়ে আনতে হবে।

সামাজিকভাবে রুখে দাঁড়ান

মাদকাসক্তি প্রতিরোধের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হচ্ছে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। কারণ মাদকতা মানুষের মানসিক ও নৈতিক অবস্থার চরম ক্ষতি সাধন করে, যার প্রভাব সমাজে চরমভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই সমাজপতিগণ নিজেরা মাদকমুক্ত থেকে এবং তাদের প্রভাব খাটিয়ে মাদক প্রতিরোধ করতে পারেন।

মিডিয়ার শক্তিশালী ভূমিকা

প্রচার মাধ্যমে মাদকাসক্তির কুফল আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। এইডস, ডাইরিয়া প্রতিরোধসহ অন্যান্য যেকোনো মহামারির মতো এর বিরুদ্ধেও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এ ব্যাপারেও একটি ব্যাপক সচেতনতা ও গণপ্রতিরোধের পরিবেশ গড়ে উঠে।

বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান, বিক্রয়, বিপণন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, যেমন পুলিশ, বি.জি.বি. আইন বিভাগকে আরো বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। মাদক ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের গ্রেফতার ও তাৎক্ষণিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিচারের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। হযরত উমর (রা) তার শাসনামলে মদপানের অপরাধে তার ছেলে উবায়দুল্লাকে শাস্তি প্রদান করেন।

---

৮৯. ড. মো মোশাররফ হোসাইন, *মাদকাসক্ত নারী ও শিশু ঃ ইসলামি অনুশাসনে এর প্রতিকার*, ই.ফা পত্রিকা, ৫৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ১৫৬।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاَءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ . فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.

"সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। উমর (রা) তাদের নিকট এসে বললেন, আমি অমুকের (উমর-তনয় উবায়দুল্লাহ) মুখ হতে মদের গন্ধ পেলাম। সে বলে, আমি আঙ্গুরের রস পান করেছি। আমি বললাম, যদি এতে মাদকতা থাকে তাহলে শাস্তি দিব। অতঃপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাকে পূর্ণ শাস্তি প্রদান করলেন।"[৯০]

স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা

বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা যে হতাশার সৃষ্টি করে সেই হতাশা থেকে খুব সহজ উপায়ে মুক্তি লাভের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই মাদকাসক্তির উদ্ভব হয়। তাই মাদকাসক্তির ছোবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে হলে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখাও আবশ্যক।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি নিহিত। ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে তার মধ্যে মানুষের উপকারিতা বিদ্যমান থাকতে পারে না এবং তা আহার্য ও পানীয় হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে না। অনুরূপ মাদক সেবনও ইসলামের দৃষ্টিতে একটি ঘৃণিত কাজ হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া মাদক সেবন আধুনিক বিশ্বের সভ্যসমাজের জন্য মানবতা বিরোধী এক ভয়াবহ অভিশাপ। আজ মাদকাসক্তির মরণ ছোঁবলে বিপন্ন গোটা জাতি; বিশেষ করে তরুণ সমাজকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে এর মূলোৎপাটন করতে না পারলে জাতিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। নৈতিকতাসম্পন্ন এবং মাদকাসক্তিমুক্ত একটি আদর্শ, সুস্থ-সুন্দর, সুখকর ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলতে হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণকরতে হবে এবং মদ্যপানসহ সকল ধরনের নেশাদ্রব্য ব্যবহার পরিহার করতে হবে। দেশ, জাতি ও যুবসমাজের বৃহৎ স্বার্থে সরকারকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সামাজিক প্রতিরোধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া দেশের সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক সংগঠনসমূহকেও মাদকাসক্তিমুক্ত সমাজ গঠনে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

---

৯০. মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র), কিতাবুল আশরিবাহ, ১- বাব আল-হাদ ফিল খামর,ই.ফা., ২য় খ., হাদীস নং ১, পৃ. ৫৫২।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কাব্যে রাসূল (সা)-এর প্রশংসা

ড. কামরুজ্জামান শামীম*

ভূমিকা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) ছিলেন জাহেলী ও ইসলামী যুগের একজন খ্যাতিমান কবি। ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমতে যে কজন বিশিষ্ট কবি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি নিজ গোত্র খাযরাজের কবি ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম মিল্লাতের কবি হিসেবে পরিচিত হন। মুশরিক কুরাইশ কবিগণ রাসূল (সা) ও সাহাবাদের কুৎসা ও দুর্ণাম বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন। হাস্‌সান (রা) রাসূল (সা) ও সাহাবাদের পক্ষ থেকে এর জবাব দিতেন। তিনি ইসলামের দাওয়াত ও রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কবি তীর ও তরবারির মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারেননি। তবে তিনি কাব্যশক্তি দিয়ে সর্বতো সহযোগিতা করেছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপন করে দিয়েছিলেন। রুহুল কুদুছ তথা জিবরাইল আ. কে দিয়ে তাঁর সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। মুসলিম কবিদের মধ্যে "শা'ইরু রাসূলিল্লাহ" বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবি উপাধিতে ভূষিত হওয়ার একমাত্র সৌভাগ্য তাঁরই হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

তাঁর নাম হাস্‌সান। উপনাম আবুল ওয়ালিদ, আবুল মাদরাব, আবু আব্দুর রহমান, আবুল হুসাম ইত্যাদি। তবে আবুল ওয়ালিদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[১] তাঁর উপাধি "শা'ইরু রাসূলিল্লাহ" বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবি। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনী নাজ্জার শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খাযরাজ গোত্রটি ইয়ামেন থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিল এবং আওস গোত্রের পাশে বসতি স্থাপন করেছিল।[২] তাঁর পিতার নাম সাবিত ও দাদার নাম মুনযির। কবির পিতৃপুরুষগণ স্বীয় গোত্রের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ফুরাইয়া এবং তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৩] কবি হাস্‌সান হিজরতের ৬০ বছর পূর্বে ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪] কিন্তু অপর একটি মত অনুযায়ী তিনি আনুমানিক ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] হিজরতের পর মদীনার মুসলমানগণ আনসার নামে অভিহিত হন।

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবন হাজার আল-'আসক্বালানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৮, খ. ১, পৃ. ৩২৬

২. হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, বৈরূতঃ আল-মাতবা'আতুল বুলিসিয়্যা, তা. বি., পৃ. ২৩২

৩. কার্‌ল ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, বৈরূতঃ আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতুল 'আম্মা লিল কুত্তাব, ১৯৯৩, খ. ১, পৃ. ২১০

৪. ড. ওমর ফররূখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, বৈরূতঃ দারুল ইলমি লিল মালায়ীন, ১৯৯২, খ. ১, পৃ. ৩২৫

৫. কার্‌ল ব্রুকলম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

সে হিসেবে কবিও আনসার ছিলেন। রাসূল (সা)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাতা ছিলেন বনী নাজ্জার গোত্রের। এ দিক দিয়ে কবি হাস্‌সান (রা) রাসূল (সা)-এর আত্মীয়।[৬]

হাস্‌সান (রা) মদীনায় লালিত পালিত হন এমন একটি পরিবারে যার প্রভাব-প্রতিপত্তি জাহেলী ও ইসলাম উভয় যুগেই গোটা আরবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর পিতামহ মুনযির মদীনার চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গোত্র আওস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত ইয়াওমু সুমাইরের যুদ্ধে বিচারক ছিলেন। তার ভাই আওস ইবন সাবিত তৃতীয় বায়'আতুল আকাবায় ৭০ জন আনসারী সাহাবীর সাথে শরীক ছিলেন। মদীনায় এসে রাসূল (সা) তাঁর ও উসমান (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। উবাই ইবন সাবিত নামে তাঁর আরেকজন ভাই ছিলেন।

যৌবনে তিনি খেলাধুলা, কবিতা ও গান নিয়েই মত্ত থাকতেন। প্রাক-ইসলামী যুগে মদীনায় আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই থাকতো। তাই সর্বদায় এই দু'গোত্রের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থা বিরাজ করতো। আওস গোত্রের কবি ছিলেন কায়স ইবনে খাতীম এবং খাযরাজ গোত্রের কবি ছিলেন হাস্‌সান। দু'গোত্রে যুদ্ধ বাঁধলে উভয়েই নিজ গোত্রের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। কবি কায়স যুদ্ধ ক্ষেত্রেও বীরত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু কবি হাস্‌সান এই দিক থেকে পিছিয়ে ছিলেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে নিজ গোত্রের সাহায্য করতেন। তিনি নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন। কবিতায় আওসের কুৎসা বর্ণনা করতেন এবং নিজ গোত্রের মর্যাদা ও গৌরবের বিবরণ দিতেন। এই দিক থেকে গোটা আরবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।[৭]

হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা) জীবিকা নির্বাহের উপকরণ হিসেবে কাব্যচর্চাকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর সমকালীন কবি নাবিগা ও 'আশা ধনী ব্যক্তিদের প্রশংসা করে অর্থোপার্জন করতেন। তা দেখে কবি হাস্‌সান (রা) তাদের অনুসরণে ধনী ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের প্রশংসা করে অর্থোপার্জনের মনস্থ করেন। তাই তিনি বিভিন্ন রাজ দরবারে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি জিল্লিক ও হীরার রাজ দরবারে গমন করেছেন। গাস্‌সানী রাজ দরবারের প্রতি তিনি অতিশয় দুর্বল ছিলেন। তিনি গাস্‌সান রাজ দরবারের জাফনা পরিবারের হারেস আ'রাজের (মৃ. ৫৬৯ খ্রিঃ) সন্তানদের স্তুতি বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেন। গাস্‌সানী রাজন্যবর্গ কবিকে নিয়মিত বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কবি তাদের দরবারে উপস্থিত হলে তারা কবিকে পুরস্কার ও বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করতেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও এ ধারা কিছুকাল অব্যাহত ছিল।[৮] তিনি গাস্‌সানী সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট জাবালা ইবন আল-আয়হামের স্তুতি গেয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন এবং তার কাছ থেকে প্রচুর হাদিয়া পেয়েছেন।[৯] তিনি হীরার অধিপতি নুমান বিন মুনযিরের প্রশংসায়ও কবিতা লিখেছেন এবং পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রাক ইসলামী যুগে হীরার রাজ দরবারে যে সকল কবি আপন কাব্য প্রতিভার বদৌলতে খ্যাতির আসন লাভ করেছিলেন, হাস্‌সান (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[১০]

---

৬. আবু তাহির মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, *'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩, পৃ. ১৬০-১৬১

৭. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৮. ড. ওমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

৯. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, ঢাকা: অহসান পাবলিকেশন, ২০০৩, পৃ. ৩৮

১০. জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, বৈরূতঃ দারুল হিলাল, ১৯৫৭, খ. ১, পৃ. ১০৩

রাসূল (সা) হিজরত করে মদীনায় আসলে হাস্সান (রা) মদীনাবাসীদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনাবাসীগণ সর্বস্ব দিয়ে রাসূল (সা) ও ইসলামের সাহায্য করেন। তিনিও তাদের সাথে স্বীয় কাব্য প্রতিভা দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সহযোগিতা করেন। রাসূল (সা) তাঁকে গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেছেন। মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিস রাসূল (সা)-এর জন্য উপঢৌকনস্বরূপ মেরি ও শীরী নামক দু'জন সম্ভ্রান্ত মহিলা পাঠিয়েছিলেন। মহানবী নিজে মেরীকে গ্রহণ করেন এবং শীরীকে হাস্সানের হস্তে অর্পণ করেন। শীরীর গর্ভেই তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাঁকে মদীনায় একটি প্রাসাদও দান করেছিলেন। সেটি আবু তালহা (রা) রাসূল (সা)-এর পরিবারকে ওয়াকফ করেছিলেন।[১১]

রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পরও খলীফাগণ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর যমানায় তিনি রাজনৈতিক কোন কাজে অংশগ্রহণ করেননি। ওসমান (রা)-এর আমলে তিনি তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। আলী (রা)-এর সময় তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতারোহণের পর কবি তার সান্নিধ্যে চলে যান। মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর খিলাফাতকালে ৫৪ হিজরী মোতাবেক ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১২] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর। ইবনে সা'য়াদ বলেন: হাস্সান জাহেলী যুগে ৬০ বছর এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।[১৩]

অবদান

হাস্সান ইবন সাবিত (রা)-এর কবিতার একটি দীওয়ান বা কাব্যসংকলন রয়েছে। এটি ভারত ও তিউনিসিয়া থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি ভারত, তিউনিসিয়া ও মিসর থেকে আরো কয়েক বার মুদ্রিত হয়। হোশেফনেন্ডের পরিমার্জনসহ সংকলনটি ১৯১০ সালে প্রফেসর গিব মেমোরিয়াল সিরিজ হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস ও সেন্টপিটার্সবুর্গে এটির প্রাচীন হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত রয়েছে।[১৪]

কবিতার বিষয়বস্তু

কবি হাস্সান মুখাদরাম কবি ছিলেন। অর্থাৎ জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তিনি জাহেলী যুগে অপরাপর কবিদের মতই গতানুগতিক ধারায় কবিতা রচনা করেছেন। জাহেলী যুগের কবিতার বিষয়বস্তুর মাঝে রয়েছে: প্রশংসা, ব্যক্তিগত ও গোত্রীয় নিন্দা, শোকগাঁথা, মদের বর্ণনা, বীরত্বগাঁথা, গৌরবগাঁথা, প্রণয়গীতি ইত্যাদি। ইসলামী যুগেও জাহেলী যুগের অধিকাংশ বিষয়বস্তু বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ যুগে প্রশংসা বিষয়ক কবিতা রাসূল (সা) ও ইসলাম বিষয়ক এবং নিন্দা বিষয়ক কবিতা মুশরিক কুরাইশদের নিয়ে রচিত হয়।[১৫] তাঁর কাব্যসমগ্র সাধারণত ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত: আমোদ-প্রমোদ, খেল-তামাশা,

---

১১. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩; ড. ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

১৩. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরূত: মুয়াসসাত আর-রিসালা, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৫১২

১৪. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩; জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫০

১৫. ড. ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

প্রণয়গীতি ও মদের বর্ণনা বিষয়ক কবিতা, দ্বিতীয়ত: নিজ গোত্রের প্রশংসা ও অন্য গোত্রের নিন্দা বিষয়ক কবিতা, তৃতীয়ত: জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন রাজ দরবারে রাজন্যবর্গের প্রশংসায় রচিত কবিতা, চতুর্থত: ইসলাম, মুসলমান ও রাজনীতি বিষয়ক কবিতা।[১৬] নিম্নে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হলো:

- **আমোদ-প্রমোদ ও মদ বিষয়ক কবিতা**

কবি হাস্সান ইবন সাবিত (রা) ইসলামে প্রবেশের পূর্বে আমোদ-প্রমোদ ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতেন। তিনি জাহেলী জীবনের অধিকাংশ সময় সংগীত শ্রবণ ও মদ্য পানের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করতেন। পাশাপাশি প্রণয়গাঁথা ও মদের বিবরণ বিষয়ক কবিতা রচনা করতেন।[১৭] প্রণয়গীতি রচনার ক্ষেত্রে সে সময়ের প্রথা অনুসারে প্রিয়ার রূপ-লাবণ্য ও তাকে নিয়ে সময় কাটানোর সরস বিবরণ উঠে এসেছে। তদ্রূপ মদ্য বিষয়ক কবিতায় মদের আভিজাত্য, শরাব পানের মোহাচ্ছন্নভাব, সুরা পরিবেশনের দৃশ্য ও মদের পাত্রের রকমারি বিবরণ ফুটে উঠেছে। মদের বর্ণনায় কবি বলেন:

وَلَقَدْ شَرِبْتُ الخَمْرَ فِيْ حَانُوْتِهَا صَهْبَاءَ صَافِيَةً كَطَعْمِ الْفُلْفُلِ
يَسْعَى عَلَيَّ بِكَأْسِهَا مُتَنَطِّفٌ فَيَعِلُّنِيْ مِنْهَا وَلَوْ لَمْ أَنْهَلِ[১৮]

আমি তার দোকান থেকে লাল মরিচের ভক্ষণের ন্যায় স্বচ্ছ (লাল) মদ পান করেছি।

সে আংটাধারী পেয়ালা নিয়ে এসে আমাকে সেই মদ পান করিয়েছে। যদিও আমি তা আগে পান করিনি।

- **নিজ গোত্রের প্রশংসা ও অন্যের নিন্দা বিষয়ক কবিতা**

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের প্রতিটি গোত্রের মুখপাত্র হিসেবে এক, দুই বা ততোধিক কবি থাকতেন। তারা যুদ্ধের সময় নিজ গোত্রের গৌরব ও প্রশংসার বিবরণ ও অপর গোত্রের নিন্দা ও ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা কবিতায় তুলে ধরতেন। পাশাপাশি নিজ গোত্রের লোকদেরকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন বীরত্বসূচক কবিতা রচনা করতেন। সেই রীতি অনুযায়ী হাস্সান ইবন সাবিত (রা) খাযরাজ গোত্রের মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। অন্যদিকে তাঁদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র আওসের মুখপাত্র হিসেবে পরিগণিত হন কাইস ইবন খাতিম। তারা উভয়েই নিজ গোত্রের প্রশংসা, গৌরব ও খ্যাতির বিবরণ এবং অপর গোত্রের বিদ্রূপ, নিন্দা ও ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা কবিতায় উপস্থাপনের মাধ্যমে একে অপরকে ঘায়েল করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতেন। এমনই একটি কবিতায় কবি হাস্সান (রা) কবি কাইসের জবাবে বলেন:

لَعَمْرُ أَبِيْكِ الْخَيْرِ يَا شَعْثُ مَا نَبَا عَلَيَّ لِسَانِيْ فِيْ الْخُطُوْبِ وَلَا يَدِي
لِسَانِيْ وَسَيْفِيْ صَارِمَانِ كِلَاهُمَا وَيَبْلُغُ مَا لَا يَبْلُغُ السَّيْفُ مِذْوَدِي[১৯]

তোমার কল্যাণময় পিতার জীবনের শপথ! ওহে এলোকেশী! বিপদ-আপদে আমার জিহ্বা আমার প্রতিকুল হয়নি এবং আমার হাতও বিরোধিতা করেনি।

---

১৬. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
১৮. হাস্সান ইবন সাবিত রা., আদ-দীওয়ান, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, পৃ. ১৮৫
১৯. হাস্সান ইবন সাবিত রা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

আমার জিহ্বা ও তরবারী উভয়েই তীক্ষ্ণ ও ধারালো। আমার জিহ্বা পৌঁছায় যেখানে তার তরবারী পৌঁছতে সক্ষম হয় না।

- **রাজন্যবর্গের প্রশংসা বিষয়ক কবিতা**

কবি হাস্সান (রা)-এর খরচ নির্বাহের মাধ্যম ছিল বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রশংসায় কাব্য নির্মাণ থেকে প্রাপ্ত বৃত্তি ও উপঢৌকন। বেশ ক'টি রাজ দরবার ও কজন রাজন্যবর্গের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি নিয়মিত এই সকল দরবার ও ব্যক্তির কাছে যাতায়াত করতেন ও তাদের প্রশংসায় কাব্য রচনা করে অনেক বৃত্তি ও উপঢৌকন লাভ করতেন। তিনি কবিতায় সেই সকল ব্যক্তিত্বের উচ্চ মর্যাদা, বংশ গৌরব, উত্তম গুণাবলী ও চমৎকার শিষ্টাচার কবিতায় তুলে ধরতেন। তিনি যে সকল রাজ দরবারের আনুকুল্য লাভ করেছিলেন, এদের মধ্যে গাস্সান রাজ দরবার অন্যতম।[২০]

কবি কোন এক কবিতায় তাদের প্রশংসায় বলেন:

يَغْشَوْنَ حَتَّى مَـــا تَهِرُّ كِلَابُهُمْ   لَا يَسْـــأَلُوْنَ عَنِ السَّـــوَادِ الْمُقْبِلِ
يَسْقُوْنَ مَـــنْ وَرَدَ الْبَرِيْصَ عَلَيْهِمِ   بَرَدَي يُصَفَّقُ بِالرَّحِيْقِ السَّلْسَلِ[২১]

তাদের কাছে অতিথিদের ভিড় জমে যায়, এতে তাদের কুকুরগুলো (আগন্তুকদের দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায়) ঘেউ-ঘেউ করে না। এমনকি রাতে আগমনকারী দল সম্পর্কেও কোন জিজ্ঞাসা করে না। তারা আগমনকারীদেরকে বারীস নদীর পানি স্বচ্ছ শরাবের সাথে মিশিয়ে পান করায়।

- **ইসলাম, মুসলমান ও রাজনীতি বিষয়ক কবিতা**

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের কাব্য প্রতিভাকে ইসলাম ও রাসূল (সা)-এর জন্য উৎসর্গ করেন। তখন তিনি আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের বর্ণনা, মূর্তি পূজার নিন্দা, আখিরাতে মুমিনদের শুভ পরিণাম ও মুশরিকদের শাস্তির বর্ণনা দিয়ে কাব্য রচনা করতেন। তাঁর কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রাসূল (সা) ও সাহাবাদের স্তুতি ও মুশরিক কুরাইশদের নিন্দা।

মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের প্রশংসায় রচিত কবিতার দুটি চরণ এখানে উদ্ধৃত হলো :

إِنَّ الذَّوَائِبَ مِـــنْ فِهْرٍ وَإِخْوَتِهِمْ   قَدْ بَيَنُّوْا سُنَّـــةً لِلنَّاسِ تَتَّبَعُ
يَرْضَى بِهَا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيْرَتُـــهُ   تَقْوَى الإِلَهِ، وَكُلُّ الْخَيْرِ يَصْطَنَعُ[২২]

মদীনার মুহাজির কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ভায়েরা (আনসারগণ) মিলে মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি নিয়ম-পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন।

যাদের অন্তরে খোদাভীতি আছে তাঁরা সকলে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং সব ধরনের কল্যাণধর্মী কাজ তাঁরা করেন।

---

২০. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-৩৫
২১. হাস্সান ইবন সাবিত রা. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

কাব্য প্রতিভা

কবি হাস্‌সান (রা) বাল্যকাল থেকেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভে নিজ গোত্র খাযরাজের গৌরব ও প্রশংসা এবং চির প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র আওসের নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা করে অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। নিন্দা কবিতা রচনা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। পাশাপাশি তিনি অর্থোপার্জনের পেশা হিসেবে অপরাপর জাহেলী কবিদের মতো ধনী ও রাজন্যবর্গের প্রশংসায় বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। ধনী ও রাজন্যবর্গের স্তুতি বর্ণনায় রচিত কবিতাগুলোর মাঝে অতিশয় প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশের বাহুল্যতা বিদ্যমান ছিল। সাহিত্য সমালোচকগণ রাজ দরবারের স্তুতি বিষয়ক কিছু কবিতাকে কবি হাস্‌সান (রা)-এর শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে গণ্য করেছেন।[২৩] উকাযের মেলায় কবি 'আশা ও কবি খানসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন।[২৪]

হাস্‌সান (রা) একজন প্রথম শ্রেণির কবি ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতা উচ্চ মানের ছিল। ইসলামী যুগের চেয়ে জাহেলী যুগে রচিত কবিতাগুলোর শক্তিমত্তা ছিল সবচেয়ে বেশি।[২৫]

সেই সময়ের কবিতাগুলোর রচনারীতি, ব্যঞ্জনভঙ্গি, শব্দ যোজনা ও প্রকাশভঙ্গি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কবিতায় অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার ও বাক্য বিন্যাসের পদ্ধতি ছিল বেশ জটিল। কেননা তখন যৌবনের শক্তিতে দেহমন ছিল সতেজ। কাজেই রচনায়ও তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। যৌবনের প্রারম্ভে আওসের নিন্দা বর্ণনা করে এবং আরবের কতিপয় শাসকদের প্রশংসা করে রচিত তাঁর কবিতাগুলো অতি চমৎকার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতা সাদামাঠা হয়ে দাঁড়ায় এবং কাব্যশৈলী ও রচনারীতির শক্তিমত্তা কিছুটা হ্রাস পেয়ে যায়। কারণ তিনি প্রায় বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বার্ধক্যের কারণে কাব্য প্রতিভার পূর্ব তেজস্বিতা বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু অনেকের মতে কুরআনের সাহিত্য সৌন্দর্য অনুধাবন করার পর তাঁর পক্ষে জাহেলী যুগের কাব্যশক্তি অটুট রাখা সম্ভব হয়নি।

হাস্‌সান (রা) ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তাঁর মুখে অনায়াসেই কবিতা এসে যেতো এবং তিনি তা সাবলীলভাবে ছন্দোবদ্ধ করতেন। কবি নাবিঘা বা আ'শার ন্যায় তিনি কবিতাকে সুন্দর করার জন্য কোন পরিশ্রম করতেন না। তার কতিপয় কবিতা মুযাহহাবাতের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল।[২৬] জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই তাঁর সুখ্যাতি সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁর মর্যাদা সকল কবির উপর তিন ভাবে আরোপিত হয়েছে। তিনি জাহেলী যুগে মদীনা শহরবাসীর কবি, রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় রাসূল (সা)-এর কবি এবং এরপর ইসলামী যুগে ইয়ামেনের কবিরূপে বিশিষ্ট হয়ে আছেন।[২৭]

---

২৩. ইবন কুতায়বা, *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১, পৃ. ১৩৯

২৪. আবু তাহির মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২৫. ড. ওমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

২৬. মুযাহহাবাত শব্দটি যাহাব থেকে নির্গত। জাহেলী যুগে বিখ্যাত কবিদের কিছু অনুপম কবিতা স্বর্ণের পানি দ্বারা লিখিত হতো। সেই কবিতাগুলোকে মুযাহ্‌হাবাত বলা হতো। (অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭)

২৭. খালেদ বিন আব্দুর রহমান আল-'আক্ক, *আল-আদাবুল 'আরাবী ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম*, কায়রো: দার আল-নাসর, তা. বি., পৃ. ৯

রাসূল (সা)-এর আমলে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এমনকি ইসলামের শত্রুদের মধ্যেও তাঁর চেয়ে প্রসিদ্ধ কবি আর কেউ ছিল না। তিনি মুশরিক কুরাইশদের হিজা করে যে সব কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলো তাদের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বর্শার ন্যায় আঘাত করত। তাদের দুর্ণামের কবিতাগুলো আরবে ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের অবস্থা হতো বড় করুণ।[২৮] তিনি কবিতায় কুরআন ও হাদীসের অনেক বাক্যাংশ সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন এবং ইসলামের বিষয়গুলো সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

হাস্‌সান (রা)-এর কাব্যে রাসূল (সা)-এর প্রশংসা

জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগে যারা স্তুতি-প্রশংসা বর্ণনা করে কাব্যচর্চায় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) তাদের অন্যতম।[২৯] তিনি ইসলাম গ্রহণের পর জাহেলী যুগের ন্যায় বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের স্তুতি বর্ণনার পরিবর্তে রাসূল (সা)-এর প্রশংসা, ইসলামের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের স্তুতি বর্ণনা করে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল (সা)-এর স্তুতি বর্ণনা করে কাব্য রচনার সূচনা করেন। তিনি রাসূল (সা)-এর স্তুতি বর্ণনায় যে সব কবিতা লিখেছেন, সেগুলোর ভাবধারা ও ভাষালঙ্কার ছিল উচ্চ মানের। রাসূল (সা) তাঁর কবিতা শ্রবণ করতেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করতেন।

কুরাইশদের প্রসিদ্ধ তিনজন কবি[৩০] রাসূল (সা) ও সাহাবাদের কুৎসা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন। তখন রাসূল (সা) ও মুসলমানদের পক্ষ হতে এসব কবিতার জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হাস্‌সান (রা) এবং আরো দু'জন আনসারী কবি[৩১] এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কুরাইশ কবিদের নিন্দা কবিতা যখন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অনুভূত হল।

তখন রাসূল (সা) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে তীর ও তরবারি দিয়ে সাহায্য করেছে, তাদেরকে জিহ্বা দিয়ে সাহায্য করতে কে বারণ করেছে? তখন হাস্‌সান (রা) বললেন, এ কাজের জন্য আমি প্রস্তুত।" রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, "আমিও তো কুরাইশী। তুমি তাদের নিন্দা কি করে করবে?" উত্তরে তিনি বললেন, "মথিত আটা থেকে যেভাবে চুল বের করে আনা হয়। আমি সেভাবে আপনাকে বের করে নিয়ে আসবো।" রাসূল (সা) বললেন, "তুমি তাদের নিন্দা করতে থাক। রুহুল কুদুস তোমার সঙ্গে আছেন।" তিনি কুরাইশদের প্রতি তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করতেন। ফলে তার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩২] তাঁর কবিতায় প্রকাশিত কুরাইদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও দুর্ণামের প্রভাব তখনকার আরব সমাজে ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁর এ সব কবিতা লোকমুখে সারা আরবে ছড়িয়ে পড়তো। ফলে কুরাইশদের অবস্থা হতো বড়ই সূচনীয়। তাই রাসূল (সা) হাস্‌সান (রা)-এর

---

২৮. আস-সায়্যিদ আহমদ হাশেমী, *জাওয়াহিরুল আদব*, বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুল মা'য়ারিফ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৩১

২৯. ড. ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

৩০. তারা হলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন যাবয়ারী, আবু সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আব্দুল মুত্তালিব, আমর ইবন আস। (জুরজী যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৭১)

৩১. তাঁরা হলেন। কাব ইবন মালিক রা. ও আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রা.। (জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২)

৩২. আহমদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদব আল-'আরবী*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৯, পৃ. ১১১

কবিতা শুনে উক্তি করেছিলেন, “এ কবিতা তাদের জন্য তীরের আঘাতের চাইতেও সাংঘাতিক।”[৩৩]

রাসূল (সা) হাস্‌সান (রা)-এর কবিতা শুনতেন। তাঁর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়তেন। রাসূল (সা) তাঁর কবিতা শুনে বলতেন, “আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ্! রুহুল কুদুসকে দিয়ে তাঁর সাহায্য কর।”[৩৪] তিনি আল্লাহর নবীর প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেছেন। কবিতায় রাসূল (সা)-এর চরিত্র মাধুরী, চারিত্রিক গুণাবলি ও তাঁর রিসালাতের প্রশংসা বর্ণনা করেছেন।

কবি হাস্‌সান (সা) রাসূল (সা)-এর শারীরিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক মাধুরীর প্রশংসায় বলেন :

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَـمْ تَـرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَـمْ تَلِدِ النِّسَـــاءُ
خُلِقْتَ مُبَـرَّأً مِـــنْ كُـلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَـا تَشَـاءُ[৩৫]

আমার চক্ষু আপনার চেয়ে অতি উত্তম কাউকে কখনও দেখেনি এবং আপনার চেয়ে অতি সুন্দর কাউকে মহিলারা জন্ম দেয়নি।

আপনি সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। যেন আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন যেমনটি চেয়েছেন।

নবী (সা) কে আল্লাহ তায়ালা অতি সুন্দর ও মহান চরিত্রের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি মহান আল্লাহ আল-কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ[৩৬].

“আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।”

আল-কুরআনের এই মর্ম বাণীই যেন কবি হাস্‌সান (রা)-এর উপরোক্ত পঙক্তিগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

রাসূল (সা)-এর আগমনের পূর্বে সারা আরব গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি হিদায়াতের প্রদীপ হিসেবে এই ধরায় আগমন করে জগতবাসীকে সেই আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করেন। তাঁর হিদায়াতের আলোতে মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়।

কবি নবী (সা)-এর রিসালতের প্রশংসায় বলেন :

نَبِيٌّ أَتَــانَــا بَعْدَ يَــــأْسٍ وَفَتْــــرَةٍ مِـنَ الـرُّسُلِ، وَالْأَوْثَــانِ فِـيْ الْأَرْضِ تُعْبَدُ
فَـأَمْسَى سِـرَاجًـا مُسْتَنِيْرًا وَهَـــادِيًـا يَلُـــوْحُ كَـمَـــا لَاحَ الصَّقِيْـلُ الْـمُـهَنَّدُ

৩৩. ড. শাওকী দাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, মিসর: দারুল মা'য়ারিফা, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৭৭-৭৮

৩৪. আস-সায়্যিদ আহমদ হাশেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৩৫. হাস্‌সান ইবন সাবিত রা. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩৬. আল-কুরআন, ৬৮: ৪

وَأَنْذَرَنَا نَـارًا، وَبَـشَّـرَنَـا جَـنَّـــــةً   وَعَـلَّـمَـنَـــا الْإِسْـلَامَ، فَـاللهُ نَـحْمَـــدُ
وَأَنْتَ، إِلَـــه الْـخَلْـقِ، رَبِّيْ وَخَـالَـقِي   بِذَلِـكَ مَـا عَـمَّـرْتَ فِـي النَّـاسِ أَشْهَدُ[৩৭]

নবী (সা) রাসূলদের দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন। তখন ধরাপৃষ্ঠে প্রতিমার পূজা-অর্চনা করা হতো।

তিনি আলোকিত প্রদীপ ও পথপ্রদর্শক হিসেবে উদ্ভাসিত হলেন। যেমন ধারালো তরবারি (যুদ্ধের ময়দানে) উদ্ভাসিত হয়।

তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করলেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন ও ইসলাম শিক্ষা দিলেন। ফলে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।

তুমিই সৃষ্টির স্রষ্টা, আমার পালনকর্তা ও প্রভূ হিসেবে তোমার সাক্ষ্য দিচ্ছি। তুমি আমাকে মানুষের মাঝে দীর্ঘজীবী করেছ।

ঈসা আ. এর দীর্ঘ বিরতির পর রাসূল (সা) আগমন করলেন। তখন পৃথিবীতে সর্বত্র মূর্তিপূজা ও বিভিন্ন কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি আলোকবর্তিকা হিসেবে আগমন করলেন। তিনি পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিলেন, অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করলেন এবং দিশেহারা মানব জাতিকে মহান ইসলামের দীক্ষা দিলেন। রাসূল (সা)-এর সুমহান আদর্শ কবি হাস্‌সান (রা)-এর উক্ত চরণগুলিতে ফুটে ওঠেছে।

কুরাইশরা রাসূল (সা) ও সাহাবাদের নিন্দা করেছে। হাস্‌সান (রা) তাদের নিন্দার জবাবে কবিতা লিখেছেন।

কুরাইশ নেতাদের বিদ্রূপ ও রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় কবি বলেন:

أَلَا أَبْلِــغْ أَبَـا سُفْيَـــانَ عَنِّي   مُـغَـلْـغَـلَـــة فَقَدْ بَرِحَ الْـخِفَـاءُ
بِـأَنَّ سُيُـوْفَـنَـــا تَـرَكَتْكَ عَبْدًا   وَعَبْدَ الدَّارِ سَـادَتُهَـــا الإِمَـــاءُ
هَجَوْتَ مُحَمَّدًا، وَأَجَبْتُ عَنْـــهُ   وَعِنْدَ اللهِ فِــي ذَاكَ الْـجَـــزَاءُ
أَ تَـهْجُوْ وَلَـسْتَ لَـــــهُ بِكُفْءٍ   فَشَرُّكُمَـا لِـخَيْرِكُمَـا الْـفِـدَاءُ[৩৮]

কেউ কি আমার পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দিবে যে, তার গুমর আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে।
আমাদের তরবারি তাকে করেছে পুরোপুরি দাস, তাই আজ মেয়েদের হাতে আব্দুদ দার গোত্রের নেতৃত্বভার পড়েছে।
তুমি মুহাম্মাদ (সা)-এর নিন্দা করেছ। আর আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আমার প্রতিদান রয়েছে আল্লাহ তায়ালার কাছে।
তুমি এমন একজনের কুৎসা রটনা করছ, যার সমকক্ষ তুমি নও। তোমাদের মন্দজন তোমাদের ভালজনের জন্য উৎসর্গ হোক।

৩৭. হাস্‌সান ইবন সাবিত রা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

কবি হাস্‌সান (রা) কুরাইশ কবি আবু সুফিয়ানকে কটাক্ষ করে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ বর্ণনা করেছেন। কুরাইশগণ মহানবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে এবং নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। তাদের এ কাজ চরম ধৃষ্টতা। তাঁর এই চরণগুলি শুনার পর রাসূল (সা) বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তোমার পুরস্কার জান্নাত রয়েছে, হে হাস্‌সান।"[৩৯]

বনী তামীমের প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করল। তাঁরা রাসূল (সা)-এর দরবারে নিজেদের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। তাদের আবৃত্তি শেষ হলে হাস্‌সান (রা)-কে উত্তর দিতে রাসূল (সা) আদেশ দেন। তখন হাস্‌সান (রা) দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন। কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা হল।

তিনি বলেন :

إِنَّ الذَّوَائِــبَ مِـنْ فِهْرٍ وَإِخْوَتِهِـمْ قَدْ بَيَّنُوْا سُنَّــةً لِلنَّــاسِ تُتَّبَـعُ
قَـوْمٌ إِذَا حَــارَبُـوْا ضَـرُّوْا عَدُوَّهُـمْ أَوْ حَاوَلُوْا النَّفْعَ فِيْ أَشْيَاعِهِم نَفَعُوْا
سَجِيَّـةٌ تِلْـكَ فِيْهِمْ غَيْرُ مُحْدَثَــةٍ إِنَّ الْـخَـلَائِــقَ فَاعْلَمْ شَرُّهَا الْبِدَعُ
لَا يَرْفَعُ النَّـاسُ مَـا أَوْهَتْ أَكُفُّهُـمُ عِنْدَ الدِّفَاعِ وَلَا يُوْهُوْنَ مَـا رَقَعُوْا[৪০]

ফিহ্‌র (কুরাইশদের পূর্বপুরুষ) গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিরা ও তাঁদের ভ্রাতারা (আনসাররা) মিলিতভাবে মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

তাঁরা এমন জাতি যে, যুদ্ধ করলে শত্রুদের করে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মিত্রদের উপকার করতে চাইলে উপকার করে।

এটি তাঁদের জন্মগত স্বভাব, নতুন কোন বিষয় নয়, জেনে রেখো, বিদ'আত কাজ-কর্ম খুব খারাপ।

তাঁরা যদি কোন কিছু নষ্ট করে মানুষের পক্ষে তার সংশোধন সম্ভব নয়। তদ্রূপ তাঁরা যদি কিছু সংশোধন করে অন্যেরা তা বিনষ্ট করতে পারে না।

উপরোক্ত চরণগুলোতে হাস্‌সান (রা) রাসূল (সা)-এর বংশ কুরাইশের গৌরব এবং মুহাজির ও আনসারদের আত্মত্যাগের বর্ণনা দেন। তিনি রাসূল (সা)-এর বংশের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের মহৎ গুণাবলি জোরালোভাবে তুলে ধরেন।

রাসূল (সা) সত্য নবী। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। কাফেররা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করেছে। হাস্‌সান (রা) কবিতায় সেই অপবাদের জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কাফেররা বদরের যুদ্ধে সূচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। সে দিন রাসূল (সা)-এর সত্যতা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠেত্বের বর্ণনায় কবি বলেনঃ

৩৯. ইবন আসাকীর, *তারিখু মাদীনাতি দিমাশক*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০০, খ. ১২, পৃ. ৪০৪

৪০. হাস্‌সান ইবন সাবিত রা. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

أَعْنِي الرَّسُوْلُ فَإِنَّ اللهَ فَضَّلَهُ   عَلَى الْبَرِيَّةِ بِالتَّقْوَى وَبِالْجُوْدِ
مُسْتَعْصِمِيْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْجَذِمٍ   مُسْتَحْكَمٍ مِنْ حِبَالِ اللهِ مَمْدُوْدِ
فِيْنَا الرَّسُوْلُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ   حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرُ غَيْرُ مَحْدُوْدِ[৪১]

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা)-কে সৃষ্টিকুলের মাঝে মহানুভবতা, দানশীলতা ও খোদাভীতি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

আমরা আল্লাহ তায়ালার অবিচ্ছিন্ন ও মজবুত রশি আকড়ে ধরেছি।

আমাদের মধ্যে সত্য দীন ও রাসূল (সা) বিদ্যমান রয়েছে। আমরা আমৃত্যু তাঁর অনুসরণ করব। আর বিজয় সুনিশ্চিত।

রাসূল (সা)-কে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সত্য দীন দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর পূর্ণ আনুগত্যে রয়েছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও মহান বিজয়। কাফেররা অহেতুক তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে।

কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) রাসূল (সা)-এর প্রতি সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতা রাসূল (সা), ইসলাম ও মুসলমানদের প্রশংসায় সীমাবদ্ধ ছিল। রাসূল (সা)-এর প্রতি তাঁর আত্মোৎসর্গের বিষয়টি নিম্নের চরণটিতে চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে। তিনি বলেন:

فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي   لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ[৪২]

আমার মান-মর্যাদা, সত্তা, পিতা ও দাদা সবকিছুই মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর উৎসর্গিত। আর এটাই জাহান্নামের মুক্তির পাথেয়।

হযরত হাস্‌সান (রা) এই চরণটি আবৃত্তি করার সময় রাসূল (সা) বললেন, 'হে হাস্‌সান! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে হিফাজত করেছেন।'[৪৩]

কবি রাসূল (সা) খিদমতে সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর স্তুতি বর্ণনা করে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর একটি শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তিনি এতে তাঁর তিরোধানের ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূল (সা)-এর বিয়োগে সারা সৃষ্টিজগৎ শোকাহত। তিনিও দারুণভাবে ব্যথিত। তিনি ব্যথা-বেদনার বর্ণনা তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। রাসূল (সা)-এর প্রতি শোক প্রকাশ করে কবি বলেন:

تَاللهِ مَا حَمَلَتْ أُنْثَى وَلَا وَضَعَتْ   مِثْلَ الرَّسُوْلِ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ الْهَادِي
مِنَ الَّذِيْ كَانَ فِيْنَا يُسْتَضَاءُ بِهِ   مُبَارَكَ الأَمْرِ ذَا عَدْلٍ وَإِرْشَادٍ
مُصَدِّقًا لِلنَّبِيِّيْنَ الأَلِي سَلَفُوْا   وَأَبْذَلَ النَّاسِ لِلْمَعْرُوْفِ لِلْجَادِي[৪৪]

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৪৩. 'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, *খাজানাতুল কিতাব*, কায়রো: মাকতাবাতু আল-খানজী, ১৯৯৬, খ. ৯, পৃ. ২৩৬

আল্লাহ তায়ালার শপথ! রাসূল (সা) ন্যায়পথ প্রদর্শনকারী, রহমতের নবী কোন মহিলা গর্ভধারণ করেনি এবং ভূমিষ্টও করেনি।

তিনি এমন ব্যক্তি যার দ্বারা আলোকিত হয়। তিনি আমাদের মাঝে বরকতময়, ন্যায়বান ও পথনির্দেশক ছিলেন।

তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যায়নকারী এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী ও দয়া-দাক্ষিণ্যকারী ছিলেন।

পরিশেষে কবি জান্নাতে রাসূল (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করেছেন। কবি বলেন:

مَـــعَ الْمُـصْـطَـفَـى أَرْجُـوْ بِـذَاكَ جَـــوَارُهِ   وَفِـيْ نَيْلِ ذَاكَ الْـيَـوْمِ أَسْعَــى وَأَجْهَـدُ[৪৫]

আমি মুস্তফা (সা)-এর সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশা করছি। আর সেই দিনের অপেক্ষায় পথ হেটে চলেছি।

উপসংহার

হাস্‌সান বিন সাবিত (রা) তাঁর কাব্য শক্তি দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করেছেন। কাফেরদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কঠোর জবাব দিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে কুরাশইদের হিজা বর্ণনা করে তাদের দাম্ভিকতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধরাশায়ী করে দিয়েছেন। আর তাওহীদ ও রিসালাতের প্রশাংসা বর্ণনা করে মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাসূল (সা) প্রশংসায় আরব কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক কবিতা রচনা করেছেন। ইসলামের দাওয়াত ও সাহাবাদের প্রশংসায়ও তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। রাসূল (সা) তাঁর কবিতা শুনে প্রশংসা করেছেন। রুহুল কুদুসকে দিয়ে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনিই একমাত্র রাসূল (সা)-এর কবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে চির ভাস্বর হয়ে আছেন।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৪৫. হাস্‌সান ইবন সাবিত রা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানবতাবাদ: একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মাদ আজিবার রহমান*

সারসংক্ষেপ

[আধুনিক তত্ত্ব মানবতাবাদ প্রচার করে যে, সব মানুষ সমান। ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ভূত হয়ে মানবতাবাদ বিশ্বের সব দেশে এখন সক্রিয়। মানবতাবাদ যা শিক্ষা দেয় প্রাথমিক মুসলিম রাষ্ট্রে তা কার্যকর ছিল। তবে এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই এই প্রচেষ্টা। প্রাথমিক মুসলিম রাষ্ট্রে প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর শাসনামলের মানবতাবাদকে একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। মদীনা সনদ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিক মানবতাবাদী আচরণের বহু নিদর্শন আছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-ও একজন মানবতাবাদী সাহাবী ছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তিনি মুক্তহস্তে দান করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) কর্তৃক প্যালেস্টাইন দখলের সময় খৃস্টান গীর্জার পবিত্রতা রক্ষা মানবতাবাদের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) বহু জনহিতকর কাজ করেন, যার দ্বারা সকল ধর্মের মানুষ উপকৃত হয়। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর সময় দেশ যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা বিধ্বস্ত হলেও এটা ছিল মানবতাবাদের যুগ। তিনি শত্রুদেরকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। প্রাথমিক মুসলিম রাষ্ট্রে মানবতাবাদের কার্যক্রম সকলের জন্য দিকনির্দেশনামূলক উৎস হয়ে আছে।]

সূচনা

বর্তমান বিশ্বে মানব কল্যাণের নিমিত্তে অনেক তত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন রক্ষণশীলতা, প্রগতিবাদ, নারীবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ইত্যাদি। মানবতাবাদ এগুলোর অন্যতম।

মানবতাবাদের সংজ্ঞা

মানবতাবাদ একটি আধুনিক তত্ত্ব, একটি দর্শন, একটি নীতি, একটি আদর্শ এবং একটি দৃষ্টিভঙ্গি। মানবতাবাদের মূল বক্তব্য হলো, ধর্ম-জাতি-গোষ্ঠীর সদস্যদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী সদস্য হিসেবে না দেখে তাদেরকে মানুষ হিসেবে দেখা।

মানবতাবাদ সার্বজনীন। এর বিস্তৃতি অপরিসীম। এর অধিক্ষেত্র সর্বব্যাপী। মানবতাবাদ সর্বজনবিদিত-বোদ্ধা অনুসৃতি। মানবতাবাদ শিক্ষা দেয় যে, মানুষের মানমর্যাদা আছে। সুতরাং একজন ব্যক্তির অন্য একজন ব্যক্তির নিকট থেকে মানমর্যাদা পাওয়া উচিত।

---

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নর্থবেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।

মানবতাবাদ ত্রিবিধ অর্থবিশিষ্ট। প্রথম অর্থে সব মানুষকে মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে মনুষ্য সমাজে কোন বিভাজন অনুপস্থিত। সৃষ্টিজীব হিসেবে মানুষ এক ও অভিন্ন। মানুষের অস্তিত্ব আনুভূমিক (হরাইজোন্টাল)।

দ্বিতীয় অর্থে মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করলেই যথাযথ হবে না; মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার সাথে সম্পৃক্ত থাকে সেবা প্রদান। মানবসেবা মানবতাবাদের একটি উপাদান। মানবতাবাদ ও সেবার অবস্থান পাশাপাশি, অন্তরঙ্গ। মানবতাবাদীরা সেবাদান-কারীও।

তৃতীয় প্রকারের মানবতাবাদের বিষয় হলো মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস, তাদের আচার-আচরণ, তাদের মনোভঙ্গি, তাদের চিন্তা-চেতনা, তাদের মানসিকতা ইত্যাদি। পেট্রাক, বোকাশিও, মূর ও ইরাসমাস মানব স্বভাব অধ্যয়নকারী লেখক হিসেবে পরিদৃষ্ট।

মানবতাবাদ ব্যক্তিক, গোত্রীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক হতে পারে। এক ব্যক্তি সমগ্র মানবজাতিকে একজাতি হিসেবে অভিহিত করতে পারে। একটি গোত্র এর সকল সদস্যকে মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে। একটি রাষ্ট্র সকল ধর্মের ও বর্ণের সদস্যকে মানুষ হিসেবে দেখতে পারে।

মানবতাবাদের উৎপত্তি

রেনেসাঁ যুগের প্রথমে গ্রিস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্যের বিস্ময়কর নব আবিষ্কার হতে আরম্ভ হয় মানবতাবাদী আন্দোলন। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর এসব সাহিত্য অজানা ছিল অথবা আংশিক ও যথাযথভাবে জানা ছিল না। মানবতাবাদীরা প্রাচীন সাহিত্য দ্বারা কেবল এ কারণে আকৃষ্ট হন না যে, তাঁরা লিটারারি স্টাইলের মডেল ছিল। কিন্তু এ কারণেও যে, তাঁরা মানব জীবনধারা বোঝার পথপ্রদর্শক ছিলেন।[১]

উপরোক্ত অনুভূতি মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের ধ্যান-ধারণার বিপরীত ছিল। তাঁরা এরকম শিক্ষা দিতেন যে, এই পৃথিবীর জীবনকে ঘৃণা করতে হবে। তাঁরা মানুষকে পাপচারী প্রাণী হিসেবে অভিহিত করে, যাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বর্গ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। মানবতাবাদীরা মানুষের পাপাচারী স্বভাবের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন।

মানবতাবাদ উদ্ভূত হয় ইউরোপের ইটালিতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানবতাবাদী লেখকের জন্ম হয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও কবিদের লেখনীর প্রভাবে ইউরোপে মানবতাবাদ একটি শক্ত ঘাটি গাড়ে।[২]

বাংলায় মানবতাবাদ বাঙালি মনে শক্তভাবে প্রোথিত। এখানে বিশাল কর্মকাণ্ড ও লেখনীর দ্বারা মানবতাবাদ আরো গতি পায় এবং পরিপক্কতা লাভ করে। বাংলার বহু কবি সাহিত্যিক তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মানবতাবাদকে পরিপক্কতা দান করেছেন।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসে মানবতাবাদ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন,

---

১. প্রফেসর ড. এম. ওয়াজেদ আলী, *ইউরোপের ইতিহাস* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৩-১৪।

২. তদেব।

يَٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খরব রাখেন' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)।

ইবনু ওমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'মক্কা বিজয়ের দিন একটি উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে কা'বাঘর তাওয়াফ করার সময় দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্য থেকে জাহেলি যুগের গর্বসমূহ এবং পিতৃবংশের বড়াই ও আভিজাত্যের অহংকার দূরীভূত করেছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি"।[৩]

বিষয়টি বিদায় হজ্জের ময়দানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন। হযরত আবু নাদরা (রা) প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে মিনা প্রান্তরে উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا

لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ.

"হে জনগণ! হুঁশিয়ার হও। তোমাদের প্রভু মাত্র একজন। সাবধান হও! আরবীয়ের আজমীর উপরে কোন প্রাধান্য নেই, আজমীর আরবীয়ের উপরে কোন প্রাধান্য নেই। কালোর উপরে লালের বা লালের উপরে কালোর কোন প্রাধান্য নেই, তাকওয়া ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে সেই সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহ্ভীরু"।[৪]

মহানবী (সা) মানবতাবাদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে বলেন,

اِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ

هَذَا.

'তোমাদের একের রক্ত (জীবন) ও সম্পদ তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল স্থানে) হারাম; যেভাবে এই দিনে, এই মাসে, এই শহরে হারাম'।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বর্ণনা করেছেন। যেমন-

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللهِ مَنْ لَّا يَرْحَمُ

النَّاسَ.

---

৩. আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী), পৃ. ৪০৫।

৪. আহমাদ, ৫খ., পৃ. ৪১১, হাদীস নং ২৩৮৮৫।

৫. বুখারী, ইলম, বাব ৩৭, নং ১০৫; ও মুসলিম, হজ্জ, বাব ১৯, হাদীস নং ২৯৫০/১৪৭।

"জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না"।[৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ ٥ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়"।[৭]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"।[৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

"আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সহচরদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে, যে তার সঙ্গী-সাথীর নিকট উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার পড়শির নিকট উত্তম"।[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. وَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা) -কে ভালোবাসতে চায় অথবা চায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ভালোবাসুক, সে যেন কথা বলার সময় সত্য কথা বলে, আমানত রাখা হলে তা আদায় করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করে"।[১০]

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِيْ أَهْلِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

---

৬. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৪৭; আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহকীক : আলবানী, হাদীস নং ৯৬।

৭. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৬২।

৮. মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৬৩।

৯. তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৮৭; সহীহ তারগীব, হাদীস নং ২৫৬৮, সনদ সহীহ।

১০. বায়হাকী, মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৯০, হাদীস হাসান।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন,

إِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ.

"তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন"।[১১]

দুর্বল ও সবল সকলের প্রতি ইসলামী বিধিবিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। নিম্নোক্ত উদাহরণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ أُسَامَةَ فَكَلَّمُوْا أُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ كَانُوْا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمْ الْحَدَّ تَرَكُوْهُ وَلَمْ يُقِيْمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيْعُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত (বনু মাখযুম গোত্রের) জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জানানো হল। সাহাবীগণ বললেন, উসামা ছাড়া কে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তারা উসামার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে তিনি এ ব্যাপারে রাসূল (সা) -এর সাথে কথা বলেন। তার কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, 'হে উসামা! বনী ইসরাঈলরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যকার কোন সম্ভ্রান্ত লোক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করত, তখন তারা দণ্ড কার্যকর না করে তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল কেউ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করত, তখন তার উপর দণ্ড কার্যকর করত। (অন্য বর্ণনায় আছে সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ!) যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, তাহলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম'।[১২]

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার সংরক্ষণেও ইসলামী আইন সমানভাবে যত্নবান। সিফফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা)-এর বর্ম হারিয়ে গেলে পরে তিনি তা এক খৃষ্টানের কাছে পান। তাকে নিয়ে কাযী শুরাইহ-এর নিকট বিচারের জন্য এসে বলেন, এটি আমার বর্ম। আমি এটি বিক্রিও করিনি এবং কাউকে দানও করিনি। শুরাইহ তখন ঐ খৃষ্টান লোকটিকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের বক্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত কী? লোকটি বলল, বর্মটি আমার। তবে আমীরুল মুমিনীন মিথ্যা বলেননি। একথা শুনে বিচারক আলী (রা)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে কী? আলী (রা) হেসে বললেন, না; কোন প্রমাণ নেই। তখন বিচারক ঐ বর্মটি খৃষ্টান লোকটিকে দিলেন। লোকটি তখন বর্মটি নিয়ে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটিই নবীদের বিচার। আমীরুল মুমিনীন আমাকে তাঁর অধীনস্ত বিচারকের নিকট নিয়ে

---

১১. আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪১; তিরমিযী, মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৬৯।

১২. বুখারী, হাদীস নং ৪৩০৪; মুসলিম, হাদীস নং ১৬৮৮; নাসাঈ, হাদীস নং ৪৮১১।

গেলেন, আর বিচারক তাঁরই বিরুদ্ধে রায় দিলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্র কসম! বর্মটি আপনারই। সিফফীনের দিকে যাত্রার সময় এটি আপনার উটের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। আলী (রা) বললেন, তুমি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করলে, সেহেতু এটি তোমার জন্য। এরপর খলীফা তাকে স্বীয় ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে তাঁর সাথে তাঁর গন্তব্যে নিয়ে গেলেন।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُوْدِيًّا اِخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُوْدِيِّ فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُوْدِيُّ وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِـالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَـرُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَاللهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِيْ بِـالْحَقِّ إِلَا كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক মুসলমান ও এক ইহুদী নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য হযরত ওমর (রা)-এর নিকট আসল। তিনি ইহুদীর দাবি সত্য দেখে তার পক্ষে ফায়সালা দিলেন। তখন ইহুদী বলল, আল্লাহ্র শপথ! আপনি সত্য ফায়সালা দিয়েছেন। একথা শুনে ওমর (রা) তাকে লাঠি দ্বারা খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে এটা সত্য বলে জানলে? ইহুদী উত্তর দিল, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাওরাতে পাই যে, কোন বিচারক সত্য ও সঠিক ফয়সালা করলে তার ডান ও বাম পাশে দুইজন ফেরেশতা থাকে, যারা তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করে এবং সত্যের ক্ষমতা দান করে, যতক্ষণ বিচারক সত্য নীতিতে অটল থাকে। আর যখন সে সত্য নীতি বর্জন করে তখন তারা তাকে ছেড়ে আকাশে চলে যায়।"[১৩]

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কতটুকু সোচ্চার ছিলেন। এমনিভাবে যুগে যুগে ইসলামী আইনে মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের অধিকার সমভাবে রক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً.

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি সেই সত্তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন" (সূরা নিসা, আয়াত ১)।

১৩. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র), কিতাবুল আকদিয়া, বাব ১, রিওয়ায়াত নং-২।

আরো বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا.

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও উহা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়" (সূরা আ'রাফ, আয়াত)।

মহানবী (সা) বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলী যুগের বংশগত সকল গর্ব অহংকারকে বিদূরিত করেছেন।"[১৪]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

"আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে" (সূরা রূম, আয়াত ২২)।

কিন্তু এ অপূর্ব বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে এক সুন্দর মিল। মহানবী (সা) বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

'প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুমিন সেই, যার থেকে লোকেরা তাদের রক্ত ও মাল সম্পদকে নিরাপদ মনে করে।'[১৫]

ইসলামে অমুসলিমদের সাথে সদাচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন" (সূরা মুম্‌তাহিনা, আয়াত ৮)।

অনুরূপভাবে মুসলমান সন্তানদের জন্য আবশ্যক হলো অমুসলিম পিতা-মাতার সাথেও উত্তম ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ.

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৫)।

১৪. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

১৫. তিরমিযি, নাসাঈ, মিশকতা, কিতাবুল ঈমান, প্রথম অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ৩৩, ৩৪।

মুসলমান পুরুষদের জন্য আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বী নারীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ইসলামে অনুমোদিত। আল্লাহ পাক বলেন,

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ.

"আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জিনিস হালাল করা হল, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মাহ্‌র প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়" (সূরা মায়িদা, আয়াত ৫)।

মানবাত্মা সম্মানিত। তাই তাকে সম্মান দেয়া ও হেফাজত করা অতীব জরুরি। বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রেও অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন" (সূরা মায়িদা, আয়াত ৪২)।

অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ.

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না" (বানী ইসরাইল, আয়াত ৩৩)।

ইসলামে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে মানবীয় মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বিষয়টি নৈতিক ও ব্যবহারিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত, যা হযরত মুহাম্মাদ (সা) বর্ণনা করে গেছেন। যেমন

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَىْ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اِسْتَطْعَمْتُكَ

فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ. قَالَ يَارَبِّ! كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِيْ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذَلِكَ عِنْدِيْ.

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে আসব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের প্রভু? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয়ই তার নিকট আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে খানা দিব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চেয়েছিল, আর তুমি তাকে খানা দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে, নিশ্চয়ই তা আমার নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে পানি পান করাব, যখন তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তুমি সেখানে আমাকে পেতে?'[১৬]

অত্র হাদীসটির কাব্যানুবাদ করেছেন কবি আব্দুল কাদির। তিনি তার কবিতার নাম দিয়েছেন **'মানুষের সেবা'**। কবিতাটি নিম্নরূপ :

হাশরের দিন বলিবেন খোদা, 'হে আদম-সন্তান,
তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান'।
মানুষ বলিবে, 'তুমি প্রভু করতার,
আমরা কেমনে লইব তোমার পরিচর্যার ভার?'
বলিবেন খোদা, 'দেখনি মানুষ কেঁদেছে রোগের ঘোরে,
তারি শুশ্রূষা করিলে তুমি যে সেথায় পাইতে মোরে'।
খোদা বলিবেন, 'হে আদম-সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান'।
মানুষ বলিবে, 'তুমি জগতের প্রভু,
আমরা কেমনে খাওয়াব তোমারে, সে কাজ কি হয় কভু?'

১৬. মুসলিম, কিতাবুল বিররু, বাব ১৩, নং ৬৫৫৬/৪৩; মুসনাদ আহ্মাদ ২খ., পৃ. ৪০৪, নং ৯২৩১।

বলিবে খোদা, 'ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে যদি খাওয়াইতে তারে'।
পুনরায় খোদা বলিবেন, 'শোন হে আদম-সন্তান,
পিপাসিত হয়ে গিয়েছিনু আমি করাওনি জলপান'।
মানুষ বলিবে, 'তুমি জগতের স্বামী,
তোমারে কেমনে পিয়াইব বারি, অধম বান্দা আমি?'
বলিবেন খোদা, 'তৃষ্ণার্ত তোমায় ডেকেছিল জল আশে,
তারে যদি জল দিতে তুমি, তবে পাইতে আমায় পাশে'।

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত তিনটি বিষয়েই কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্‌র নিকটে জিজ্ঞাসিত হবে। আরও স্পষ্ট যে, সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। বর্ণিত হাদীসে পীড়িত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এই তিন ব্যক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উক্ত তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উক্ত বিষয়ে শুধু তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বলেননি, নিজেও তা মেনে চলেছেন। যার বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করা যায় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক রোগাক্রান্ত বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য রোগী দেখতে যাওয়ার সাধারণ নিয়মানুসারে তিনি তাকেও বললেন, لَابَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ 'ভয় নেই! আল্লাহ চাহেতো দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে'।[১৭] অপর এক হাদীসে আছে, বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। নির্দেশ প্রদানকৃত সাতটি বিষয়ের প্রথমটিই হল রোগীর পরিচর্যা করা'।[১৮]

মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় মহানবী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সে কথার উল্লেখ করে বাংলার বহু কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা রকম কবিতা রচনা করেছেন। যেমন কবি আবুল হাসান শামসুদ্দিন (জন্ম : ১৯৩৫) তাঁর **'বিশ্বনবী'** কবিতার শেষ স্তবকে বলেন,

একতার বাণী, সাম্যের বাণী প্রথম হাঁকিলে তুমি,
তুমি শিখালেঃ মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই;
মিলনের গানে মুখরিয়া দিক জাগিয়া বিশ্বভূমি,
জানিল মানুষ : মানুষেরা ভাই ভাই।

মানবতাবাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ধনী-গরীবের বৈষম্য দূরীভূত করে সকলে এক আদমের সন্তান হিসেবে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানবতাবাদ

মানবতাবাদ শব্দটি আধুনিক কালে উদ্ভূত হলেও এর সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যকলাপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আগেও ছিল। এগুলোকে বর্তমান যুগের মানবতাবাদ বলা যেতে পারে।

১৭. বুখারী, মিশকাত, হাদীস নং ১৫২৯।
১৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ১৫২৬।

প্রায় দেশে মানবতাবাদ সম্পর্কে প্রচুর গ্রন্থ আছে। কিন্তু অনেক দেশে মানবতাবাদ থাকলেও মানবতাবাদের মত কাজকে মানবতাবাদ বলা হয় না। হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং খলিফা হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সময় (৬১০-৬৬১ খৃ) প্রচুর মানবতাবাদের নিদর্শন আছে। মানবতাবাদ ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলেও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।

মুহাম্মাদ (সা) (৬১০-৬৩২)-এর মানবতাবাদ

মুহাম্মাদ (সা) একজন মানবতাবাদী নবী ছিলেন। মানুষের দুঃখ, দুর্দশা লাঘবের জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মানবতার মুক্তির জন্য তিনি সুদ, ঘুষ, নারী নির্যাতন, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, লুটতরাজ, ডাকাতি, যেনা- ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবতাবাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। নবুওয়াত লাভের পূর্বেই যুবক মুহাম্মাদ (সা) হিলফুল ফুযুল নামক একটি সংঘ গঠনে অংশগ্রহণ করে দুর্বল ও অসহায়দের রক্ষা করার ব্যাপারে সহায়তা করেন। হাশিম ও মুত্তালিবের বংশধর এবং যোহরা ও তামীম পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'হিলফুল ফুযুল' এর নীতিমালার কর্মসূচি ছিল, 'আল্লাহ্র শপথ! মক্কা নগরীতে কারো উপর অত্যাচার হলে আমরা সবাই মিলে অত্যাচারিতকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করব, সে ব্যক্তি উঁচু শ্রেণির হোক বা নিচু শ্রেণির হোক, স্থানীয় হোক বা বিদেশী।'[১৯]

দুনিয়ার বুকে মানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নীতিমালাই ইসলাম। মহানবী (সা) তাঁর প্রতি চরম বিদ্বেষী শত্রুকেও নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়াহশী, হিন্দা, আবু সুফয়ান, সুরাকা বিন মালিক, সাফওয়ান বিন উমাইয়া প্রমুখ অপরাধীকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করেছেন। এমনকি মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন।[২০] সেই মুনাফিকের সন্তান ও নিষ্ঠাবান পুত্রের বাসনা অনুযায়ী তার কাফনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের গায়ের জামা খুলে দিয়েছিলেন।[২১]এমন অতুল্য মানবহিতৈষী ও মানবদরদী ক্ষমাশীল মানুষ পৃথিবীতে বিরল।

মুহাম্মাদ (সা)-এর স্বগোত্রীয় কুরাইশদের অমুসলমান সদস্যরা তাঁকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করলেও তিনি তাদেরকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনের অনেক ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। অর্থাৎ অন্য ধর্মের সদস্যদেরকে তিনি মানুষ হিসেবে দেখতেন। মুহাম্মাদ (সা)-এর স্ত্রী খাদীজা (রা)-এর চাচাত ভাই ওরাকা বিন নাওফেল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি ইবরানী (হিব্রু) ভাষা পড়তে ও লিখতে পারতেন। নবী কমির (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির কথা তিনিই প্রথমে তাঁকে অবহিত করেন। ঘটনার বিবরণ এ রকম যে, 'একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন জিবরাইল (আ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, 'তুমি পড়'। তিনি বললেন,

---

১৯. হিলফুল ফুজুল (حلف الفضول) যিলকদ মাসে মক্কা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাবাগৃহে কালোপাথর পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ও এই সংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (সূত্রঃ ইন্টারনেট)।

২০. সূরা তওবা, আয়াত ৮০।

২১. বুখারী, হাদীস নং ২৩২৬।

'পড়ার অভ্যাস আমার নেই'। তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়'। তিনি আবারও বললেন, 'আমার পড়ার অভ্যাস নেই'। তারপর তৃতীয় দফায় তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন-শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[২২]

তারপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নবী করিম (সা) কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাজিদা (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।' খাদিজা (রা) তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে বললেন 'আমার কি হলো?'। অতঃপর হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে বললেন, আমি খুব ভয় পাচ্ছি। তাঁর অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ করে খাদিজা (রা) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। কেননা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন, যারা সত্যের পথে থাকে তাদেরকে আপনি সাহায্য করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।'[২৩]

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে নিজ চাচাত ভাই অরাকা বিন নাওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। খাদিজা (রা) বললেন 'ভাইজান আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তিনি কি যেন সব কথাবার্তা বলছেন এবং অস্থির হয়ে পড়ছেন। অরাকা বললেন, 'ভাতিজা! বলতো তুমি কি দেখেছ? কি হয়েছে তোমার? মহানবী (সা) যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হিরাগুহায় যেভাবে যা ঘটেছিল সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন অরাকার নিকট। আনুপূর্বিক সব কিছু শ্রবণের পর বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে অরাকা বলে উঠলেন, 'ইনিই তো সেই জিবরাইল যিনি মূসা (আ)-এর নিকটেও আগমন করেছিলেন।'[২৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় আগমন করে তখন সন্ধ্যা সমাগত। খ্রিস্টানরা তাদের উপাসনা মসজিদের বাইরে গিয়ে সমাপ্ত করে আসার অনুমতি চাইলে তিনি মসজিদে নববীর অভ্যন্তরেই তাদের উপাসনা সম্পন্ন করতে বলেন। একদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র কাবা ঘরের দিকে মুখ করে মাগরিবের নামাযে ইমামতি করেন। অপরদিকে আগত খ্রিস্টানরা বিপরীতমুখী অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে দাঁড়িয়ে তাদের উপাসনা সম্পন্ন করেন। মানবতার আদর্শের মূর্তপ্রতীক মহানবী (সা)

২২. সূরা আলাক, আয়াত, ১-৫।

২৩. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহিকুল মাখতুম* (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ৯৫।

২৪. তদেব।

-এর উদারতা-উদার্যে একই মসজিদের অভ্যন্তরে একই সময়ে দুই পৃথক মতের অনুসারীরা তাদের ইবাদত আরাধনা সম্পাদন করলেন। এই হলো ইসলামের প্রকৃত দীক্ষা।[২৫]

মহানবী (সা) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সম্মান দিয়েছেন। সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মহানবী (সা) সাহাবীগণকে আদেশ করেছে। যেমন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ. فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا.

'হযরত জাবির বিন আল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মহানবী (সা) -এর পাশ দিয়ে একবার একটি শববাহী দল অতিক্রম করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবীগণ তাঁকে অবহিত করলেন যে, সেটা জনৈক ইহুদীর লাশ। তখন মহানবী (সা) বললেন, 'মৃত্যু একটি ভয়াবহ ঘটনা। সুতরাং তোমরা যখন কোন লাশ বহন করে নিয়ে যেতে দেখবে তখন উঠে দাঁড়াবে।'[২৬]

মদীনা সনদ (৬২৪ খ্রি)

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, মুসলিম দেশসমূহে পূর্ববৎ অভিন্ন সম্প্রীতি, সহাবস্থান, পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা বিদ্যমান। হিজরত পরবর্তী মহানবী (সা) ঘোষিত 'মদীনা সনদ' তার গৌরবময় উদাহরণ। সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান, পরধর্মের প্রতি সহশীলতা ও বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে মৈত্রীর প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর বহনে এ সনদ এক নজীরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মদীনায় অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমঝোতা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় জীবনের পথ প্রশস্তকরণ, মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি ও একতার বন্ধন সুদৃঢ়করণ। এ লক্ষ্যে উদার উন্মুক্ত মনমানসিকতা নিয়ে এমন সব নিয়ম নীতি ও কার্যক্রম তিনি অবলম্বন করলেন যে, ধর্মান্ধতা ও স্বার্থান্ধতা-ক্লিষ্ট সমসাময়িক সমাজে যা ছিল একটি কল্পনাতীত ব্যাপার।

হযরত মুহাম্মাদ (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে মদীনায় বসবাসকারী সকল ধর্মের সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করতে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি মদীনা সনদ যাদের সাথে স্বাক্ষর করেন তারা খ্রিস্টান ও ইহুদী ছাড়াও দশের অনেক প্রকৃতি পূজক সদস্য ছিলেন। নিম্নলিখিত গোত্রগুলোকে মদীনা রাষ্ট্রের সদস্য করা হয়।.....তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ (সা) যেমন নিজে মানবতাবাদী ছিলেন, তেমনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ 'দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই।'[২৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ 'তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার'।[২৮]

---

২৫. ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, *জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (রাজশাহী: শ্যামলবাংলা প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৭৩।

২৬. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, মাইয়েতকে গোসল করানো অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১৬৪৯।

২৭. সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬।

কুরআনের বিবরণ থেকে এটি প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন ধর্মের প্রতি কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে না। নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'যাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কেউ যদি তাদের প্রতি অন্যায় করে কিংবা তাদের বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় তবে আমি শেষ বিচারের দিন তাদের জিম্মার পক্ষে ওকালতি করব।'[২৯]

মদীনা সনদে প্রত্যেক গোষ্ঠীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মদীনা রাষ্ট্র একটি মানবতাবাদী রাষ্ট্র ছিল। সকল জনগোষ্ঠীর সমান দায়িত্ব ও অধিকার ছিল।

মদীনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত মদীনা সনদে ৪৭টি শর্ত ছিল। শর্তসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং উহারা একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে। ২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে; মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে; কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ৩. কেউ কুরাইশদের সাথে কোন প্রকার সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না, কিংবা মদীনাবাসীগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরাইশদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। ৪. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবেত প্রচেষ্টায় বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করবে। ৫. বহিঃশত্রুর আক্রমণে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ স্ব-স্ব যুদ্ধ ব্যয়ভার বহন করবে। ৬. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসাবেই গণ্য করা হবে; এর জন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দোষী করা চলবে না। ৭. মদীনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং রক্তপাত, হত্যা এবং বলাৎকার এবং অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হলো। ৮. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী বা অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে। ৯. ইহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। ১০. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে। ১১. মুহাম্মাদ (সা) -এর অনুমতি ব্যতিত মদীনাবাসীগণ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। ১২. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী এর মীমাংসা করবেন। ১৩. সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। ১৪. হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন। ১৫. এ চুক্তিভুক্ত সকলের জন্যই মদীনায় কোন প্রকার হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কিংবা রক্তপাত ঘটানো হারাম হবে।

মদীনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। সর্বপ্রথম মহানবী (সা) জনগণের মঙ্গলার্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে এটিকে মহাসনদ (Magna Carta) বলা যেতে পারে। মুইর বলেন, 'এটি হযরতের অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব

২৮. সূরা কাফিরূন, আয়াত ৬।

২৯. মুহম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী: বুকস্ প্যাভিলিয়ন, ১৯৮১), পৃ. ৪৩।

মননশীলতা; শুধু তৎকালীন যুগেই নয়, বরং সর্বযুগে ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।' এটি মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে মদীনা সনদ এক তুলনাহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘকালব্যাপী পরিচালিত বুয়াসের যুদ্ধের অবসান হয়। রক্তের ভিত্তির পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মদীনবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়।

মদীনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমানদের ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিশ্চয়তা বিধান করে। মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মদীনা রাষ্ট্রে মুসলমান ও অমুসলমান সকলের স্ব স্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় ছিল। মদীনা সনদের অন্যতম ধারা ছিল তাদের ধর্ম, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গীর্জার কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্ম পালনে বাধা প্রদান কা হবে না।'[৩০] এই শর্ত দ্বারা যে মহানুভবতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। মদীনা সনদ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সমাজ সংস্কারের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে আছে।

বদরের যুদ্ধে (৬২৪ খ্রি) অমুসলিমদের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। রাসূলল্লাহ (সা) যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'ওদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।' আবূ আযীয নামক এক যুদ্ধবন্দী বলেন, 'যখন তারা আমাকে বদর থেকে মদীনায় নিয়ে আসল, তখন আমি আনসারদের একটি গোত্রে অবস্থান করতাম। যখন তারা তাদের দুপুর ও রাতের খাবার গ্রহণ করত তখন আমাকে রুটি খেতে দিত। আর নিজেরা খেজুর খেত। আমাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসিয়তের কারণে তারা আমাদের সাথে এরূপ আচরণ করত। কেউ এক টুকরা রুটি পেলেও তা আমাকে দিয়ে দিত। আমার লজ্জা লাগত তা গ্রহণ করতে, তাই আমি তা ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তারা তা আমাকে ফিরিয়ে দিত এবং নিজেরা তা স্পর্শও করত না'। উল্লেখ্য যে, তখন মদীনায় খেজুরের চেয়ে রুটির মূল্য বেশি ছিল।[৩১] এটি ছিল অমুসলিমদের প্রতি মহানবী (সা)-এর উদারতা, মহানুভবতা। কারণ তিনি অমুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন।

বদর যুদ্ধে বন্দিদের অনেককে মহানবী (সা) মুক্তিপণ নিয়ে কিংবা মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। মুক্তিপণের পরিমাণ ছিল চার হাজার, তিন হাজার ও এক হাজার দিরহাম। মক্কাবাসীগণ লেখাপড়া জানত, পক্ষান্তরে মদীনাবাসীগণ লেখাপড়া জানত না বললেই চলে। এজন্য মহানবী (সা) ঘোষণা করলেন, যে মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হবে সে মদীনার দশজন ছেলেকে লেখাপড়া শিখাবে। যখন এ ছেলেগুলো উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখে নিবে তখন এটাই তার মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচিত হবে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) স্বীয় অমুসিলম জামাতা আসকেও বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা জয়নাব স্বামী আসের মুক্তিপণ হিসাবে কিছু মাল পাঠিয়ে ছিলেন যার মধ্যে একটি হারও ছিল। এ হারটি

৩০. মুহম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
৩১. ছফির রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

প্রকৃতপক্ষে খাদিজা (রা)-এর ছিল, যা বিয়ের সময় কন্যা জয়নবকে দিয়েছিলেন। হারটি দেখে মহানবী (সা) -এর মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। তাই তিনি সাহাবীদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন।[৩২]

একদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) আনাস বিন মালিক (রা)-এর গৃহে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে একত্র হন। সেখানে সেদিন নব্বই জন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, যার অর্ধেক সংখ্যক আনসার এবং অর্ধেক সংখ্যক মুহাজির। যে বৈঠক 'আনসার ও মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' নামে সুপ্রসিদ্ধ। মহানবী (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করলেন এই শর্তে যে, 'তারা পরস্পরের দুঃখ-বেদনার সাথী হবেন এবং মৃত্যুর পর পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে'। তবে উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পর নাযিল হওয়া সূরা আনফালের পঁচাত্তর নম্বর আয়াত দ্বারা রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়। তাতে বলা হয়, 'বংশ সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের অধিক হকদার আল্লাহ্‌র কিতাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞানী'।[৩৩] উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি রহিত হলেও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল অটুট এবং অনন্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) আব্দুর রহমান বিন আওফকে আনসার সাদ বিন রাবী-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। সাদ তাঁর মুহাজির ভাইকে বলেন, আনসারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী। আপনি আমার সম্পদে অর্ধেক গ্রহণ করুন এবং আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে আপনি পছন্দ করেন বলুন, তাকে আমি তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দতশেষে আপনি তাকে বিবাহ করবেন'। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়া করলেন 'আল্লাহ্ আপনার পরিবারে ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন'।[৩৪]

মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রি)

দীর্ঘ আট বছর (৬২২-৬৩০) বছর পর হযরত (সা) তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করেন। হিট্টি মক্কা বিজয়কে 'প্রাচীন ইতিহাসে একটি তুলনাহীন মহাবিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। সীজার, আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়নের দেশজয় নিরীহ জনসাধারণের রক্তপাতের ইতিহাস; কিন্তু হযরত নির্বিঘ্নে বিনা প্রতিবন্ধকতায় মদীনা হতে অভিযান পরিচালনা করে মক্কা বিজয় করেন। মক্কা বিজয় সমগ্র আরবদেশ বিজয়ের সমতুল্য ছিল।

মক্কা বিজয় মুহাম্মাদ (সা)-এর মহানুভবতার একটি অবিস্মরণীয় ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ তের বছর কুরাইশগণ হযরত ও তাঁর অনুসারীদের উপর নৃশংস অত্যাচার ও নির্যাতন করে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদের প্রতি কোন প্রকার প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আমীর আলী বলেন, 'বিজয়ের মুহূর্তে মহানবী (সা) অতীতের যন্ত্রণা-দুর্ভোগের কথা ভুলে গেলেন, সমস্ত আঘাত-নির্যাতন ক্ষমা করলেন এবং মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ সার্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করলেন।'

---

৩২. তদেব, পৃ. ২৭৫।

৩৩. সূরা আনফাল, আয়াত ৭৫।

৩৪. বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮০-৮১, সাহাবীগণের মর্যাদা অনুচ্ছেদ ৩০ ও হাদীস নং ২৬৩০, 'হেবা অধ্যায়' অনুচ্ছেদ ৩৫।

মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলে কুরাইশদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মহানবী (সা) বিজিত শত্রুদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করেননি এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রতিশোধ স্পৃহাও প্রদর্শন করেননি। বরং জানি দুশমনদের জন্য ঘোষণা করেছেন সাধারণ ক্ষমা।

রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদেরকে বললেন, 'হে কুরাইশগণ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে কর? তারা বলল, 'আপনি আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবেন এটাই আমাদের ধারণা। আপনি উদার ভাই ও উদার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সেই কথাই বলছি, যে কথা ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই (সূরা ইউসুফ ৯২)। যাও তোমরা সকলেই মুক্ত'।[৩৫] ইসলামে জাতি, শ্রেণি ও বর্ণবৈষম্য নেই।

মুসলিম সৈন্যবাহিনী কোন প্রকার লুটতরাজে নিয়োজিত ছিল না, কোন গৃহ লুণ্ঠিত হয়নি, কোন মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়নি, অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে প্রভাবান্বিত করা হয়নি, প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় নি। হযরতের প্রতিনিধি আত্তার বিন আসিদের তত্ত্বাবধানে কুরাইশগণই মক্কায় শাসনকার্য নির্বাহ করতে লাগলেন। এমনকি পলাতক অমুসলিম ইকরামা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। মুইর বলেন, 'যে মক্কাবাসীরা এতদিন যাবৎ মুহাম্মাদ (সা) কে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে সেই মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর মহানুভবতা সত্যই প্রশংসনীয়।' মক্কা বিজয়ে মহানবী (সা)-এর উদারতা, মহানুভবতা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি মানবতাবাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মক্কা বিজয় পরবর্তী পরিবেশ একই প্রপঞ্চ প্রমাণ করে মক্কাবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। তিনি সেটা গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মক্কার প্রশাসন বিজিত কুরাইশদের হাতে প্রত্যার্পণ করা। মক্কা বিজয় ইসলামের আন্তর্জাতিকীকরণে সহায়তা করে।

আরব ভূখণ্ডে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থেকে ধারণা করা যায় যে, শক্তি প্রয়োগের কারণে এ সকল ধর্মান্তর ঘটেনি। মুহাম্মাদ (সা) নিজেই কয়েকটি খ্রিস্টান গোত্রের সাথে সন্ধি করেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা দেন এবং তাদের পাদ্রীদের কর্তৃত্ব ও অধিকার ভোগ কররার পথে কোন প্রকার হয়রানি না করার প্রতিশ্রুতি দেন। একই রকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তার অনুসারীদের এবং দেশবাসীদের মধ্যে যারা প্রাচীন ধর্মের অনুসারী, তাদের মধ্যেও। এ বন্ধুত্বই তাদের ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। ফলে বিধর্মীদের অনেকেই নতুন সরকারের প্রতি একই রকম আনুগত্যবোধ নিয়ে মুসলমানদের সামরিক অভিযানসমূহে সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল।

এ আনুগত্যবোধ থেকেই অমুসলিমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুর পরে সমগ্র আরবব্যাপী ধর্মত্যাগীরা যে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডিন করেছিল তা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।[৩৬]

---

৩৫. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৩৬. টি.ডব্লিউ.আর্নল্ড, *দি প্রিচিং অব ইসলাম*, মো. সিরাজ মান্নান ও ইব্রাহীম ভূঁইয়া অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২), পৃ. ৬৯-৭০।

হযরত আবু বকর (রা) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি)-এর মানবতাবাদ

হযরত আবু বকর (রা) মানবতাবাদী শাসক ছিলেন। মহানবী (সা)-এর পরে মানবমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। বহুবিধ মানবিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। কর্তব্যপরায়ণতা এবং আদর্শ নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের আদর্শ। দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় তিনি উদার মনোবৃত্তি ও সরল চিত্তের এক অনুপম ব্যক্তিত্ব হিসাবে জন সাধারণ্যে সমধিক সমাদৃত ছিলেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি তাঁর প্রথম ভাষণেই উল্লেখ করেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই, আপনাদের সকলের পরামর্শ এবং সহায়তাই আমার বিশেষভাবে কাম্য। আমি ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে কাজ করলে আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন; অন্যায় পথে চললে সদুপদেশ দান করবেন। সত্যের অনুসরণ ও মিথ্যার বর্জন আপনাদের কাম্য। আমার দৃষ্টিতে ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল সকলেই সমান এবং সকলের সঙ্গেই আমি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে চাই। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুশাসন মোতাবেক কাজ করলেই আপনারা আমাকে মেনে চলবেন; অন্যথায় আমি আপনাদের আনুগত্য দাবি করতে পারব না।'[৩৭]

হযরত আবু বকর (রা)-এর উদ্বোধনী ভাষণ সমগ্র মানবতার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সামাজিক বৈষম্য দূর করে ঐক্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা করেন। মৌলানা মুহম্মাদ আলী বলেন, 'অত্যুৎকৃষ্ট এই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দই ছিল বুদ্ধিদীপ্ত এবং ইহা মুসলিম জাহানের নিকট আলোর দিশারীস্বরূপ।'

পূর্বের ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক ইসলামে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। গৃহকর্তা যেমন খুশি তাদের সাথে আচরণ করত। অনেক সময় ক্রীতদাসদের উপর চালানো হতো বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, উৎপীড়ন। এদের মধ্যে বেলাল (রা), আমর বিন ফুহায়রা (রা), হিন্দিয়া (রা), জারিয়া (রা) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মানবতার কণ্যাণে অগ্রগামী আবু বকর (রা) বহু অর্থ ব্যয়ে তাদের মুক্ত করে দিয়ে স্বাধীনভাবে চলাচলের সুযোগ করে দেন।[৩৮]

বদর যুদ্ধে বন্দি অমুসলমানদের ব্যাপারে মহানবী (সা) সাহাবীদের পরামর্শ চাইলেন। অনেকেই ধৃত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মানবতার মহান দরদী হযরত আবু বকর (রা) মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। মহানবী (সা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। মানুষের প্রতি আবু বকর (রা)-এর ভালোবাসা, মহানুভবতা, সহানুভূতি, মানবতাবাদ বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে।[৩৯]

হযরত ওমর (রা) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি)-এর মানবতাবাদ

সীমান্ত রক্ষা এবং জনসাধারণের জাল-মালের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করে হযরত ওমর (রা) সম্প্রসারণ নীতি কার্যকর করেন। মুসলমানদের অভিযান সর্বদা

---

৩৭. মওলানা মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, *আশারা মোবাশশারা* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩), পৃ. ৩১।

৩৮. মওলানা মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৩৯. মওলানা মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

আত্মরক্ষামূলক ছিল। কখনও সাম্রাজ্যবাদী নীতি হতে উদ্বুদ্ধ হয়নি। হযরত ওমর বলেন, 'আমার দেশবাসীর নিরাপত্তা বিধানকল্পে যুদ্ধাভিযান প্রয়োজন হয়ে পড়ে'।

হযরত ওমর (রা) একবার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এক বেদুঈনকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন। এরপরই নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিন্তিত হয়ে ওই বেদুঈনকে বলেন, 'যতবার তোমাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছে, তত ঘা বেত তুমি আমাকে মারো। কিন্তু ওই বেদুঈন তাতে রাজি হয় না। তখন ওমর (রা) এই স্বগতোক্তি করতে করতে বিষণ্ন চিত্তে ঘরে ঢুকে যান।[৪০] ওমর (রা) নির্দেশ প্রদান করেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূলের বিধান মতে যেসব সংখ্যালঘু ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব লাভ করবে-নাগরিকত্বের বিধানগত সমুদয় সুযোগ-সুবিধা যেন পূর্ণরূপে তাদেরকে দেয়া হয়। তাদের জান-মাল, ইজ্জত রক্ষার্থে প্রয়োজন হলে যেন যুদ্ধও করা হয়।'[৪১]

৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে জর্ডান নদীর একটি শাখা ইয়ারমুক তীরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় হুযায়ফা (রা) আহতদের মধ্যে তার চাচাত ভাইকে খুঁজতে শুরু করলেন। তার কাছে ছিল সামান্য পানি। হুযায়ফার চাচাত ভাইয়ের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তার অবস্থা ছিল আশংকাজনক। হুযায়ফা তাকে বললেন, 'তুমি কি পানি পান করবে?' সে তার কথার কোন উত্তর দিতে সক্ষম না হয়ে হাঁ-সূচক ইঙ্গিত করল। আহত ব্যক্তি হুযায়ফার নিকট থেকে পানি পান করার জন্য হাতে নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের বুকফাটা আর্তনাদ শুনে তার পূর্বে তাকে পানি পান করানোর জন্য হুযায়ফাকে ইঙ্গিত করল। হুযায়ফা তার নিকট গিয়ে বললেন, 'আপনি কি পানি পান করতে চান?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি পান করার জন্য পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পানির জন্য অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি পানি পান না করে হুযায়ফাকে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু পানি অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিও। হুযায়ফা আহত সৈন্যটির নিকটে গিয়ে দেখলেন, সে মারা গেছে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে এসে দেখলেন সেও মারা গেছে। অতঃপর চাচাত ভাইয়ের কাছে ফিরে আসলে দেখেন তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। পানির পাত্রটি তখনও হুযায়ফার হাতে। এতটুকু পানি, অথচ তা পান করার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিপাসা মেটাবার জন্য এতই পাগলপরা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেননি।[৪২]

সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আনুগত্যের প্রতি হযরত ওমর (রা) কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর এই সাংগঠনিক ক্ষমতায় ও উদারতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানদের জন্য পারসিক সেতু নির্মাণ করে সিরিয়ার খ্রিস্টানগণ মুসলিম বাহিনীকে গুপ্ত সংবাদ সরবরাহ করত। কাদেসিয়ার যুদ্ধে দায়লামের নেতৃত্বে বহু পারসিক সৈন্য মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করে। বিখ্যাত বাইজান্টাইন যোদ্ধা জর্জ ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হিট্টি বলেন, 'ইসলামের উদ্দীপনায় প্রাচ্যের পুনর্জাগরণ সুচিত হয়। সহস্র বছর

৪০. খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস*, প্রফেসর পি. কে. হিট্টির দ্য হিস্ট্রি অব দ্য এ্যারাবস্ অবলম্বনে (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ১৩৮।

৪১. মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৫।

৪২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ (কায়রো: ১৯৮৮), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮-১১।

প্রতীচ্যের আধিপত্যের পর প্রাচ্যে পুনরায় এটি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। উপরন্তু নব্য বিজেতাগণ পুরাতনদের তুলনায় সামান্য কর আদায় করত এবং বিজেতাগণ পূর্বের তুলনায় তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে এবং নির্বিঘ্নে পালন করতে পারত।'

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশের রাজধানী দামেস্ক পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানগণ বিধর্মীদের জীবন, সম্পত্তি ও গীর্জার নিরাপত্তা বিধান করে একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এবং এর পরিবর্তে তাদেরকে 'জিয্য়া' কর প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়।

৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে আমর ইবনুল আস (রা) জেরুযালেম অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ খ্রিস্টান অধিবাসীগণ মুসলিম সেনাপতির নিকট এই সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত হন যে, খলিফা ওমর (রা) স্বয়ং জেরুজালেম আগমন করে খ্রিস্টান ধর্মগুরু সাফ্রোনিয়াসের সাথে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। সেনাপতি আবু ওবায়দা অবরোধে নেতৃত্ব দান করছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের শর্ত মেনে নিয়ে খলিফার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। একজন ভৃত্য সহকারে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে হযরত ওমর (রা) জেরুজালেম আগমন করে খ্রিস্টানদের সাথে নিজ হাতে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সন্ধিশর্ত অনুযায়ী জিয্য়া কর প্রদানের শর্তে খ্রিস্টানদের জান-মাল, গীর্জা, বাসস্থানের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মজাজকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে মদীনা হতে জেরুযালেম গমন করে শহরটির হস্তান্তর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রা) যখন জেরুযালেম পৌঁছেন তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়। সৈন্যরা গীর্জার ভিতরেই নামায আদায় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) তাদেরকে গীর্জার পাদদেশে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। গীর্জায় নামায পড়ার অনুমতি না দেয়ার কারণ হলো, পরবর্তীকালে মুসলমানরা এটাকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন। কারণ খলিফার উপস্থিতিতে সেখানে নামায হয়। তিনি খ্রিস্টান গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

পারস্য বিজয়ের পর হযরত ওমর (রা) জানতে পারেন যে, জিন্দা-আবেস্তা নামে পারসিকদের একটি ধর্মগ্রন্থ ছিল। তিনি এই ধর্মগ্রন্থকে আসমানী কিতাবের মর্যাদা দেয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সমগ্র পারস্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ফলে জিন্দা-আবেস্তাকে আর আসমানী কিতাবের মর্যাদা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি অত্যন্ত মানবতাবাদী ছিলেন।

একবার ওমর (রা) কোন এক অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন্ আহলে কিতাব'? সে বলল , ইহূদী। এরপর ওমর (রা) তার ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলে সে জানাল জিয্য়া, প্রয়োজন এবং বার্ধ্যকের কারণে সে এ পথ বেছে নিয়েছে। এ কথা শ্রবণ করে ওমর (রা) তার হাত ধরে আপন গৃহে নিয়ে এসে তাকে উপস্থিতভাবে কিছু দিয়ে বায়তুল মালের দায়িত্বশীলদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেই সাথে নির্দেশ দিলেন, 'এ ব্যক্তি এবং এর মতো অন্য ব্যক্তিদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তার যৌবন কালের উপার্জনে উপকৃত হয়ে বার্ধক্যে তাকে লাঞ্ছিত করলে তার প্রতি এটা আমাদের ইনসাফ করা হবে না।' কেননা আল্লাহ বলেন, 'সাদাকা তো নিঃসন্দেহে অভাবগ্রস্ত এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের জন্য'। ফকীর বলতে মুসলমান দরিদ্র লোকদের বোঝায়। আর

এ লোকটি হচ্ছে আহলে কিতাবের নিঃস্ব ব্যক্তি'।[৪৩] তিনি তার ও তার মতো ব্যক্তিদের জিয্য়াও মাফ করে দেন এবং এ মর্মে তার গভর্ণরদের প্রতি ফরমান জারি করেন।

ওমর (রা) দামেশক সফরকালে এক স্থানে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত কয়েকজন খ্রিস্টানকে দেখতে পান। তাদেরকে সরকারি ধনভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেয়ার এবং তাদের জীবন-জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহের নির্দেশ দেন তিনি।[৪৪]

মৌলানা মুহম্মদ আলী বলেন, 'নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে, দাস প্রথা বিলোপের মত গৃহীত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হযরত ওমরের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অন্যতম ছিল।' যুদ্ধবন্দিদের দাসরূপে বিক্রয় করার প্রথা হযরত ওমর (রা) উচ্ছেদ করেন এবং সন্ধি চুক্তিতে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি প্রদানের শর্ত লিপিবদ্ধ থাকত।

খলিফার আদেশে মিসরের যুদ্ধবন্দিরা মুক্তি লাভ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মি হিসেবে তারা নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। অমুসলমানদের প্রতি খলিফা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন এবং জিয্য়া কর প্রদানের পরিবর্তে তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করতেন। খলিফা বৃদ্ধ ও দুস্থ খ্রিস্টানদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে অমুসলমানদের প্রতি রূঢ় ব্যবহারের জন্য মুসলমানদের শাস্তি প্রদানে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না।

মানবতাবোধ হযরত ওমরের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কারণে তিনি খ্রিস্টান নাগরিক জাবালাকে ভৃত্যের উপর নিষ্ঠুরতার জন্য শাস্তি প্রদান করেন। কথিত আছে, হযরত ওমরের চাবুক অপরের তলোয়ার হতেও বেশি ভয়ঙ্কর ছিল। হযরত ওমর স্বজনপ্রীতির পরিপন্থী নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফলে সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে খলিফা আমর ইবনুল আস (রা)-কে ফুসতাত মসজিদে নির্মিত মিম্বার ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল ইসলামের সাম্যবাদ নীতিতে একজন মুসলমান অপর একজনের উপরে উপবিষ্ট হতে পারে না।

হযরত উসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬)-এর মানবতাবাদ

হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। সহনশীলতা, সত্যবাদিতা, বদান্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, দুস্থ মানুষের সেবায় এগিয়ে আসা ইত্যাদি ছিল তাঁর অনুপম চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। বিপুল বিত্তশালী হয়েও তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। জনসাধারণের জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়প্রাত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর দুই কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। একে একে দুই কন্যার মৃত্যুর পর মহনবী (সা) বলেছিলেন, 'আমার যদি আরো কন্যা থাকত, তাহলে আমি ওসমানের সাথে বিবাহ দিতাম'।

ইসলামের সংকটময় যুগে নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি রক্তপাতের দ্বারা বিদ্রোহীদের দমন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর কোন দেহরক্ষী ছিল না। মদীনার মসজিদে তিনি মাকসুরা নির্মাণ করে মুসল্লীদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নামায আদায় করতে পছন্দ করেননি।

---

৪৩. ইমাম আবু ইউসুফ, পৃ. ১৩৬।

৪৪. সাইয়েদ কুতুব, বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত (ঢাকা: ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১৭৮।

তিনি মানবসেবায় বহু কাজ করেছেন। মদীনায় তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য স্বীয় ধন-সম্পত্তি মানবতায় সেবায় উৎসর্গ করেন। পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য তিনি কূপ খননের জন্য বিপুল অর্থ দান করেন। বীর রূমা নামে এই কূপটি খনন করতে ২০ হাজার দিরহাম ব্যয় হয়।

স্থান সংকুলান না হওয়ায় মহানবী (সা) মদীনার মসজিদ সম্প্রসারণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন হযরত উসমান (রা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মসজিদ সংলগ্ন স্থান ক্রয় করে এর সম্প্রসারণ করেন। স্ত্রী রোকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলের (সা) নির্দেশে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের জন্য তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কুরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে যান। কুরাইশগণ তাঁকে বন্দি করে রাখায় তিনি সন্ধি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তাঁর বিচক্ষণতার জন্য কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

হযরত আলী (রা) (৬৫৬-৬৬১)-এর মানবতাবাদ

সরলতা ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত আলী (রা)। তিনি শান্ত, পরোপকারী ছিলেন। মহানবী (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'হারুনের সঙ্গে মূসার যেমন সম্পর্ক ঠিক তোমার সাথে আমার সেই সম্পর্ক, শুধু পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই।' তাঁর এর সময়ে অমুসলমানরা রক্ষা পেয়েছিলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর শাসনামলের পূর্বে অমুসলমানরা সুবিধা বঞ্চিত ছিল বা নির্যাতিত হত। যেহেতু তাঁর সময় ছিল যুদ্ধ বিগ্রোহের সময়। সুযোগ পেলে এ সময় সন্ত্রাসীরা অমুসলমানদের নির্যাতন করতে পারত। কিন্তু সেটা ঘটেনি এই জন্য যে, হযরত আলী (রা) এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন।

তিনি সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। তার দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে সমাজে বসবাসকারী সকলের মর্যাদা সমান। কে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করল তার উপর ভিত্তি করে মানুষের সম্মান বা মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা) রচিত নিম্নের কবিতাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

اَلنَّاسُ مِنْ جِهَّةِ التَّمْثِيْلِ أَكْفَاءُ * أَبُوْهُمْ آدَمُ وَالْأُمُّ حَوَّاءُ

نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَّأَرْوَاحٌ مُشَاكَلَةٌ * وَأَعْظُمٌ خُلِقَتْ فِيْهَا وَأَعْضَاءُ

فَإِنْ يَّكُنْ لَهُمْ فِىْ أَصْلِهِمْ حَسَبٌ * يُفَاخِرُوْنَ بِهِ فَالطِّيْنُ وَالْمَاءُ

"আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের সকলের পিতা আদম ও মাতা হাওয়া। একটি প্রাণ আরেকটি প্রাণের ন্যায় এবং তাদের রূহগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রত্যেকের দেহ হাড্ডি দ্বারা তৈরী, আর তাতে রয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যদি মৌলিকভাবে তাদের মধ্যে গর্ব করার মত কিছু থাকে, তবে তা হল মাটি ও পানি'।[৪৫]

উপসংহার

হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে সমগ্র আরবে সকল ধর্মের মানুষ একত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করেছেন। কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে

৪৫. দীওয়ানে আলী, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরূত, ২০০৫, পৃ. ১৫।

বঞ্চিত করা হয়নি। অমুসলমানদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা বিনা কারণে তাদেরকে নির্যাতন করার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। কারণ শাসকরা ছিলেন মানবতাবাদী। তাদের রাষ্ট্র ছিল বহু ধর্মের লোকের সমন্বয়ে গঠিত। অমুসলমানরা সমঅধিকার ভোগ করত। তাছাড়া অনেক অমুসলমানকে রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করা হয়েছিল। এই যুগ মানবতাবাদ উচ্চ শিখরে উপনীত হয়। মানবতার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা বিশ্বজোড়া প্রেম, ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সুনিবিড় বন্ধন তৈরি হয়। বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উচিত বিশ্বভ্রাতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে মহাকল্যাণের অনুগামী হওয়া। আর এটাই ইসলাম প্রবর্তিত সত্যিকারের মানবতাবাদ। ইসলাম কোনো অঞ্চল বা জাতিবিশেষের ধর্ম নয়। ইসলাম মানব জাতির ধর্ম। তাই ইসলাম কোন অবস্থাতেই যে কোন অযুহাতে মানুষে মানুষে বিভেদকে সমর্থন করে না। প্রাথমিক যুগে ইসলামে মানবতাবাদের কার্যক্রম সকলের জন্য দিকনির্দেশনামূলক বিষয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

খলিফাতাবাদে খান জাহানের সমাধি ও শিলালিপি
(তারিখ ৮৬৩ হিজরী/১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)

অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক*

চিত্র ৩.১.: সাম্প্রতিক সংস্কারের আগে খান জাহান নির্মিত বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের একটি মনোরম ছবি, যেখানে কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপরের পেডিমেন্টটি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

বাগেরহাটের খান জাহানের স্থাপত্যিক ঐতিহ্য এবং স্থাপনাসমূহ সম্ভবত দক্ষিণ বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ। পনের শতকের মাঝামাঝি খলিফাতাবাদ (অর্থাৎ তৎকালীন সুলতানের খলীফা বা প্রতিনিধি, খান জাহানের আবাসস্থল) নামে পরিচিত এই স্থানটি মুসলিম শাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে। পার্শ্ববর্তী শহর মুহাম্মাদাবাদের ন্যায় খলিফাতাবাদও একটি টাকশাল নগর হিসাবেও বিকাশ লাভ করেছিল। মুসলিম শাসনামলের এই ক্রমাগত নগরায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অঞ্চলে জনবসতি স্থাপনের ক্রমবর্ধনের ধারা বোঝা যায়। মোটাদাগে মুসলিম শাসনামলে এই পুরো

* অতিথি অধ্যাপক, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।

এলাকা ফতেহাবাদ নামে পরিচিত ছিল। টোডরমলের প্রণয়ন করা ভূসম্পত্তির সামগ্রিক আয়ের তালিকা থেকে ধারণা করা যায় যে বাংলার নয়টি সরকারের (প্রশাসনিক বিভাগ) মধ্যে অন্যতম ছিল খলিফাতাবাদ। সুন্দরবনের বনাঞ্চল একসময় এই অঞ্চলের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

খলিফাতাবাদের সাথে সম্পর্কিত এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেন খান জাহান। দক্ষিণ বাংলার লোক-ঐতিহ্যে তিনি পীর খানজালী নামে পরিচিত। কিছু স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী, খান জাহান যুবক অবস্থায় তাঁর পিতামাতার সাথে দিল্লি থেকে গৌড়ে অভিবাসী হয়ে এসেছিলেন। তিনি নূর কুতব আল-আলমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন পীর আলী মুহাম্মদ তাহির, যিনি উচ্চ পর্যায়ের হিন্দু পরিবার থেকে মুসলমান হয়েছিলেন। সম্ভবত তৎকালীন বাংলার সুলতান খান জাহানকে সুন্দরবন সংলগ্ন দক্ষিণ বাংলার প্রশাসনের ভার অর্পণ করেন। তিনি হাবেলী কস্‌বা তথা বর্তমান বাগেরহাট শহরে স্থায়ী হয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় স্থাপত্যিক নির্মাণ হচ্ছে বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। এটি বর্তমানে ইউনেস্কো কর্তৃক 'বিশ্ব ঐতিহ্য' তালিকার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রত্নস্থান। এটি দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদের অন্যতম একটি, এবং সম্ভবত পনের শতকের গোটা মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মসজিদগুলির একটি। এই মসজিদের পূর্বদিকের প্রধান প্রবেশপথের উপরের পেডিমেন্টটি (ভবনের সম্মুখভাগে মূল দরজার উপরের দিকে ত্রিকোণাকৃতি গঠন, যা মূলত একটি প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য) একটি অনন্য নমুনা, যা এই অঞ্চলের অন্য কোন মুসলিম স্থাপত্যে বিরল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সম্প্রতি এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটির সংরক্ষণ ও সংস্কার করতে গিয়ে এই পেডিমেন্টটি এমন ভাবে সমান করে দেওয়া হয়েছে, যে তার কোন চিহ্ন আর বাকি নেই।

মহৎ ও সাধক চরিত্রের অধিকারী এবং একই সঙ্গে একজন কুশলী সেনানায়ক খান জাহান দক্ষিণ বাংলায় ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রধানত তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে, যেমন রাস্তা, পুকুর, নলকূপ, সরাইখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা। পরিতাপের কথা এই যে যুগে যুগে তাঁর স্থাপনাগুলোর অধিকাংশই নানা দুর্বৃত্ত চক্রগুলোর হাতে নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে।

বিশ শতকের প্রথম দিকেও তাঁর নির্মিত রাস্তার কিছু অবশিষ্টাংশ শনাক্ত করা যেত। এর একটি রাস্তা ছিল ভৈরব নদের তীরে; আরেকটি রাস্তা ছিল বারবাজার থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত প্রায় সত্তর মাইল দীর্ঘ। তাঁর আমলে এ অঞ্চলে ইসলাম দ্রুত বিকাশ লাভ করছিল এবং সাধারণ জনগণ এই অঞ্চলে বনাঞ্চল পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণ শুরু করেছিল। এই অঞ্চলের অনেকগুলো গ্রাম ও শহরের নামে 'কাটী' ও 'আবাদ' ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত, যেগুলোর অর্থ যথাক্রমে 'পরিষ্কার করা' ও 'বসতি গড়া'।

খান জাহান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন, তাই তিনি ছিলেন অতিশয় জনপ্রিয়। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন যে ষাটগম্বুজ মসজিদের নিকটে একটি দীঘি খননকালে (খানজালী দীঘি) কাল পাথরের তৈরি একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। খান জাহান এটি স্থানীয় হিন্দু পুরোহিত মহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারীকে প্রদান করেন, যেন তা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাঁর সহায়ক বাহিনীর সদস্যরা

যে হাতিয়ারটি সদাসর্বদা আবশ্যিকভাবে বহন করত, তা হল কোদাল এবং শাবল যা দিয়ে আত্মরক্ষার পাশাপাশি কৃষিকাজ, পূর্ত ও নির্মাণকাজও করা যেত।

খান জাহানের সমাধির চারপাশের ইসলামী শিলালিপি এবং তাঁর মনোনীত পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের তথ্য থেকে তাঁর এই অঞ্চলে ইসলামের সুদৃঢ়করণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। শিলালিপিতে *আল-'উলামা' আল-রাশিদূন* অর্থাৎ সৎপথের পথিক জ্ঞানীগণের উল্লেখ থেকে মনে হয় এই অঞ্চলে খান জাহানের ইসলাম প্রচার কর্মে একদল আলেম অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণিত উপাধি 'আল মুবগিজ লি 'ল-কুফ্ফার ওয়া 'ল-মুশরিকীন' (অবিশ্বাসী ও বহু-ঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধমত পোষণকারী) থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় যে এই অঞ্চলে একদিকে যেমন কোন কোন অমুসলিম গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়েছিল, তেমনিভাবে পীরপন্থী প্রাচীন (*সাবিকী*) ধারার ধর্মগুরুরাও তাঁকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি।

সমাধি চত্বরটি ষাট গম্বুজ মসজিদের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে দুইটি সমাধি রয়েছে। প্রথম এবং অধিকতর দৃশ্যমান সমাধিটি খান জাহানের। এটি খানজালী পুকুরের উত্তর দিকে প্রায় ৬৮ × ৬৩ মিটার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত দর্শনীয় এক সমাধি চত্বরের ভেতরে অবস্থিত। চত্বর চার দিক দিয়ে বেশ পুরু কিন্তু নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি বৃহৎ প্রবেশপথ আছে। ভেতরের সমাধিকক্ষটিতে চার ধাপবিশিষ্ট একটি উঁচু পাথরের মঞ্চ রয়েছে যার চূড়ায় আছে সমাধির প্রধান কবর। এই শবাধারের চারদিক বিভিন্ন শিলালিপির দ্বারা অলংকৃত। তবে এই অলংকৃত শবাধারটি আসলে সাধারণ্যে দৃশ্যমান একটি বাহ্যিক কাঠামো মাত্র। আসল কবর, যেখানে খান জাহানের দেহ সমাধিস্থ, তা সমাধি স্থাপত্যের ঠিক নিচে ভূগর্ভের একটি কুঠুরিতে অবস্থিত। ভূগর্ভস্থ কক্ষে অবস্থিত মূল কবরটির উপরে এবং তার চতুর্দিকে বহুবিধ শিলালিপি ছিল এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত একটি সিঁড়ির মাধ্যমে সেখানে যাওয়া যেত।

কিন্তু ১৯৬৩ সালের পর ভূগর্ভস্থ কক্ষের প্রবেশ পথটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে শিলালিপিগুলো চিরতরে অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৬৩ সালের আগে তোলা কতগুলো বিরল আলোচিত্র লেখক বহু কষ্টে উদ্ধার করতে সমর্থ হন যা বর্ত্তমানে এসব শিলালিপির একমাত্র উৎস। ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে শবাধার স্থাপনের ধারাটি বিরল হলেও এই স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু সমাধিতে দেখা যায়, যেমনঃ আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল এবং লাহোর শহরের পার্শ্ববর্তী (রাভী নদীর তীরে) শাহদ্রাহ নামক জায়গায় অবস্থিত নূর জাহানের সমাধি।

দ্বিতীয় সমাধিটি খান জাহানের সমাধি কক্ষ থেকে পশ্চিমে অবস্থিত। সমাধিটির দৈর্ঘ্য বরাবর উভয় প্রান্তে ডিম্বাকৃতির আরবী সমাধি শিলালিপি দেখা যায় যাতে 'মুহাম্মদ তাহির' নামাঙ্কিত রয়েছে। তিনি পীর আলী নামে পরিচিত ছিলেন এবং খান জাহানের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন।

আদিতে তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি খান জাহানের শিষ্য ও ঘনিষ্ঠতম সহচর হয়ে ওঠেন। স্থানীয় প্রবাদমতে তাঁর অধীনে কামদেব ও

জয়দেব নামে দু'জন ব্রাহ্মণ প্রশাসনিক কর্মচারী ছিলেন। এই দুইজন নিকটস্থ দক্ষিণ ডিহি এলাকার প্রভাবশালী রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান ছিলেন। একদা রমজান মাসে রোজার দিনে কামদেব কৌতুক ছলে মন্তব্য করে বসেন যে সেদিন মুহাম্মদ তাহির লেবু শুঁকেছিলেন বিধায় তাঁর রোজা ভেঙ্গে গেছে। তাঁর অকাট্য যুক্তিটা ছিল: "ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং"।

এই ঘটনার পর একদিন তাহির কিছু অতিথিকে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করলেন। কামদেব ও জয়দেবও অতিথিদের মধ্যে ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মুসলমান অতিথিদের জন্য গোমাংসের ও আয়োজন করা হয়েছিল। মুসলমান অতিথিদের গোমাংস পরিবেশনের সময় কামদেব ও জয়দেবেরও নাকেও নিশ্চয়ই সে গন্ধ ঢুকেছিল এবং তা তাঁরা নির্ঘাৎ শুঁকে থাকবেন, এই অজুহাতে ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁদেরকে জাতিচ্যুত করা হয়। পরে সামাজিক চাপে তাঁরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হয় কামালউদ্দিন খান ও জামালউদ্দিন খান।

তাঁদের 'খান' পদবী গ্রহণে বোঝা যায় স্থানীয় পদবী (যথা 'রায়') ত্যাগ করে 'খানে'র ন্যায় (মূলত মধ্য এশিয়া থেকে আগত) পদবী গ্রহণের মত এক ধরনের সামাজিক চল ছিল নব্যমুসলমানদের মধ্যে। তাঁদের অপর দুই ভাই রতিদেব ও শুকদেব নিষ্ঠাবান হিন্দু থাকলেও তাঁদের পরিবারের নাম হয়ে দাড়ায় পীরালি ব্রাহ্মণ।

বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে (যাঁদের পারিবারিক আদি পদবী ছিল মুশারি) এই বংশের যোগ ছিল। মজার ব্যাপার হল নীলকান্ত নামক জনৈক ঘটকের লেখা একটি পুঁথিতে এধরনের ঘটনার বিস্তারিত ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই। নীলকান্ত ঘটক লিখিত পুঁথি থেকে সতীশচন্দ্র মিত্র (*যশোর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪২০৪২২) কর্তৃক উদ্ধৃত কবিতাংশটুকু নিম্নরূপ:

পুঁথির পাঠ

'খান্ জাহান মহামান পাদশা নফর।	নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
যশোরে সনদ ল'য়ে করিল সফর।।	ফাঁকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল।।
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।	কামদেব জয়দেব করি সম্বোধন।
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।।	হাসিয়া কহিল ধূর্ত্ত তাহির তখন।।
পূর্বেতে আছিল সেও কুলীনের নাতি।	জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে।
মুসলমানী-রূপে মজে হারাইল জাতি।।	ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে।।
পীর আলি নাম ধরে পিরাল্যা গ্রামে বাস।	নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি ত চলে না।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হ'ল সর্বনাশ।।	এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা।।
সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর।	উপায় না ভাবিয়া দোঁহে প্রমাদ গণিল।
চেঙ্গুটিয়া পরগণায় চাড়িল জিগীর।।	হিতে বিপরীত দেখি মরমে মরিল।।
গুড়-বংশ অবতংস রায় রাঁয়ে ভাতি।	পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীর।
অর্থলোভে কর্মদোষে মিলিল সংহতি।।	থতমত হ'য়ে দোঁহে হইল অস্থির।।
ধনবলে হইল ভ্রম হইল উচ্চ মাথা।	দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত।
নানা জনে রটাইল নানা কুৎসা কথা।।	পীরালি হইল তারা হইল জাতিভ্রষ্ট।।
আঙ্গিনায় ব'সে আছে উজীর তাহির।	কামাল জামাল নাম হইল দোঁহার।
কত প্রজা ল'য়ে ভেট করিছে হাজির।।	ব্রাহ্মণ সমাজে প'ড়ে গেল হাহাকার।।
রোজার সে দিন পীর উপবাসী ছিল।	তখন ডাকিয়া দোঁহে আলি খাঁজাহান্ ।

হেনকালে একজন নেবু এনে দিল।।	সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান।।
গন্ধামোদে চারিদিকে ভরপুর হইল।	সেই গোলে গুড়বাসে বিধি বিড়ম্বনা।
বাহবা বাহবা বলি নাকেতে ধরিল।।	শত্রুগণে জাতিনাশে করিল কল্পনা।।
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন।	পীরালি অখ্যাতি দিল ঘ্রাণ মাত্র দোষ।
ব'সে ছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ।।	সর্ব্বদেশে রাষ্ট্র হ'ল কুগ্রহের রোষ।।
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে।	সংসর্গে পড়িল যারা তাহারাও মজিল।
ঘ্রাণেতে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে।।	গুড় পীরালি দোষ বলি ঘটকে বুঝিল।।
কথায় বিদ্রুপ ভাবি তাহির অস্থির।	কিছুকাল পরে তারা মার্জ্জিত হইল।
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোঁহের মনে কৈল স্থির।।	ঘটকের করুণায় সুঘর মিলিল।।
দিন পরে মজলিস করিল তাহির।	ধনে মানে হ'য়ে হীন কুটুম্ব স্বঘর।
জয়দেব, কামদেব হইল হাজির।।	সমাজে রহিল ঠেলা সেই বরাবর।।
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন।	পীরালি রহিল পড়ি কলাচার্য্য ঘোষে।
শত শত বক্‌রি আর গো-মাংস বন্ধন।।	রচিল পীরালি কথা নীলকাকান্ত শেষে।।'
পলান্ন লশুন গন্ধে সভা ভর পুর।	
সেই সভায় ছিল আরো ব্রাহ্মণ প্রচুর।।	

খান জাহানের সমাধির মত তাহিরের মূল কবরটিও (যেখানে শবদেহ সমাহিত করা হয়েছে) উপর তলার বাহ্যিক সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষে অবস্থিত। এই সমাধির অভ্যন্তরীণ কক্ষেও বেশ কিছু শিলালিপি রয়েছে যা আরবী ও ফার্সীতে উৎকীর্ণ। তবে এখন সেখানে প্রবেশ করা যায় না।

এই সমাধির ইসলামী শিলালিপিসমূহ তাদের অলংকরণের রীতি ও মনোরম লিপিশৈলীর দরুণ খুবই আকর্ষণীয়। তবে এগুলো নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যাবে না, কারণ এখানে সংযুক্ত বেশ কিছু শিলালিপির এখনও সন্তোষজনকভাবে পাঠোদ্ধার করা সুসম্পন্ন হয়ে ওঠে নি। নিম্নে খান জাহানের সমাধি ও তার ঠিক নিচে অবস্থিত (বর্ত্তমানে প্রবেশ পথ বন্ধ) ভূগর্ভস্থ কক্ষের মূল কবর এবং কবরের আশে পার্শ্বের কিছু শিলালিপির (তারিখ ৮৬৩ হিজরী/১৪৫৯ খ্রি:) বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল:

চিত্র ৩.ক.২: খান জাহানের সমাধির উপর তলায় দৃশ্যমান (বাহ্যিক) স্থাপত্য কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষে অবস্থিত মূল কবর, যেখানে নামার প্রবেশ পথটি (সিঁড়িটি) ১৯৬৩ সাল থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ।

চিত্র .৩.ক.৩: কবরের উপরে উৎকীর্ণ *আল-আস্‌মা আল-হুসনা* [আল্লাহর সুন্দরতম নিরানব্বই নাম], সেইসাথে সমাধির ভিত্তির উপর ফার্সী সারিসম্বলিত শিলালিপিসহ আরও নানা শিলালিপির একটি সামগ্রিক চিত্র

আদি প্রত্নস্থান: ষাট গম্বুজ মসজিদের নিকটবর্তী খান জাহানের সমাধি চত্বর, বাগেরহাট, বাংলাদেশ।

বর্তমান অবস্থান: শিলালিপিগুলি যথাস্থানে বিদ্যমান। তবে দুচারটি শিলালিপি উপর তলায় দৃশ্যমান (বাহ্যিক) সমাধিকে অলঙ্কৃত করলেও মূল লেখমালাগুলোর অধিকাংশই নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের মূল কবরের গায়ে এবং তার আশে পার্শে চতুর্দিকে উৎকীর্ণ রয়েছে, যেখানে নামার প্রবেশ পথটি (সিঁড়িটি) ১৯৬৩ সাল থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। লেখক কর্তৃক বহু কষ্টে উদ্ধার করা ১৯৬৩ সালের আগে তোলা কতগুলো বিরল আলোচিত্রই এসব শিলালিপির বর্তমানে একমাত্র উৎস।

উপকরণ ও পরিমাপ: অজানা।

রীতি, সারি সংখ্যা: বিভিন্ন ধরনের হস্তলিখন রীতি, যেমন: বিহারী (চিত্র নং ৮.৫০.খ এবং ৫০.গ-এর শিলালিপিসমূহ), *ইজাযা, নস্‌খ,* (খান জাহানের সমাধির উপরে মোটা *নাস্‌খ* অক্ষরে উৎকীর্ণ আস্‌মা আল-হুসনা, দেখুন: চিত্র ৮.৫০.চ), *রায়হানী* (চিত্র ৮.৫০.ছ-এর আল-কুরআনের সূরা ও পংক্তিসমুহ), এবং *সুল্‌স;* সারি সংখ্যা অজানা।

রাজত্বকাল: সুলতান মাহমূদ শাহ (৮৪১–৬৪ হিজরী/১৪৩৭–৬০ খ্রিঃ)।

ভাষা: আরবী ও ফার্সী।

ধরন: সমাধি শিলালিপি।

প্রকাশনা: বাবু গৌরদাস বসাক, *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল,* খণ্ড ৩৬, সংখ্যা ১ (১৮৬৭): ১২৬–৩৫; জে ওয়েস্টল্যান্ড, *এ রিপোর্ট অন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব যশোর* (১৮৭৪); *লিস্ট অব অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল,* কলকাতা, ১৮৯৬; *আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া অ্যানুয়াল রিপোর্ট,* ১৯০৩–০৪, ১৯০৬–০৭, ১৯১৭–১৮, ১৯২১–২২, ১৯২৯–৩০, ১৯৩০–৩৪; এস আহমেদ, *ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল,* ৬৪–৬৭; এ এইচ দানী, *বিব্লিওগ্রাফি অব মুসলিম ইনস্ক্রিপশনস,* ১৯–২০; জি মিশেল (সম্পা.), *দ্য ইসলামিক হেরিটেজ অব বেঙ্গল,* ইউনেস্কো (প্যারিস), ১৯৮৪; এ এফ এম আব্দুল জলীল, *খান জাহান আলী* (খুলনা, ১৯৬৬): ৯১–৯৯; প্রাগুক্ত, *সুন্দরবনের ইতিহাস* (ঢাকা: আহমদ পাবলিকেশন হাউস, ১৯৮৬); এনামুল হক, *ইসলামিক আর্ট হেরিটেজ অব বাংলাদেশ* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ১৯৮৩); ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯০), ভুক্তি 'খান জাহান', রচনা: এ কে এম ইয়াকুব আলী, ৫০৩; আব্দুল করিম, *কর্পাস অব*

ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল, ১৩৭–৪১; সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১; মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *আল-নুকূশ আল-কিতাবিয়্যা ফী বিলাদ আল-বাঙ্গাল*, ১৪৫–১৪৬; (ফার্সী অনুবাদঃ লায়লা মুসাজাদেহ, *কাতিবাহ হা* [کتیبه ها], ১৮২–১৮৪); মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *ইসলামিক ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল*, ১২৬–১৪৭; মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *বঙ্গাল মেঁ আরবী ওয়া ফার্সী কাতবাত*, ২১২–২৩১; মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *এপিগ্রাফি অ্যান্ড ইসলামিক কালচার*, ১৫৬–১৬১।

৩.৪.খ শিলালিপির পাঠঃ

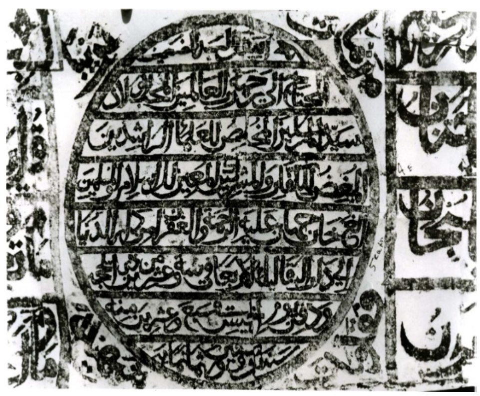

انتقل العبد الضعيف
المحتاج إلى رحمة رب العالمين
المحب لأولاد
سيد المرسلين المخلص للعلماء
الراشدين
المبغض للكفار والمشركين والمعين
للإسلام والمسلمين
الغ خان جهان عليه الرحمة
والغفران من دار الدنيا

চিত্র ৩.৪.খ : সমাধির এক পার্শ্বে উৎকীর্ণ অন্তিষ্টিক্রিয়া ফলক

অনুবাদঃ বিশ্ব প্রতিপালকের করুণার মুখাপেক্ষী, নবীদের নেতার সন্তানদের প্রতি অনুরক্ত, সত্যপথের পথিক ও জ্ঞানীদের প্রতি আন্তরিক, কাফির (অবিশ্বাসী) ও বহু-ঈশ্বরবাদীদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী, দীনহীন ভৃত্য উলুঘ খান জাহান বুধবার রাতে, ২৬ জূ'ল-হিজ্জা (২৯ অক্টোবর, ১৪৫৯ খ্রিঃ) ইহধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন অনন্ত ধামের দিকে এবং তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল বৃহস্পতিবার, একই মাসের ২৭ তারিখ, আটশ তেষট্টি (৮৬৩) হিজরী (৩০ অক্টোবর, ১৪৫৯ খ্রিঃ), তাঁর উপর দয়া ও ক্ষমা বর্ষিত হোক।

চিত্র ৩.৫.গঃ : সমাধির অন্য পার্শ্বে উৎকীর্ণ খান জাহানের দ্বিতীয় অন্তিষ্টিক্রিয়া ফলক

৩.গ. শিলালিপির পাঠ (চিত্র ৩.৬.গ)

هذه
روضة مباركة
من رياض الجنة لخان الأعظم
خان جهان عليه الرحمة والرضوان تحريرا
في ست وعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وثمانماية

অনুবাদ (শিলালিপি ৩.গ): জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে এটি একটি আশীর্বাদপ্রাপ্ত বাগান (সমাধিস্থান) যা মহান খান, খান জাহানের জন্য (তৈরি করা হয়েছিল)। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ তাঁর উপর বর্ষিত হোক। এটা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল ২৬ জূ 'ল-হিজ্জ ৮৬৩ হিজরী সনে (২৯ অক্টোবর, ১৪৫৯ খ্রি:)।

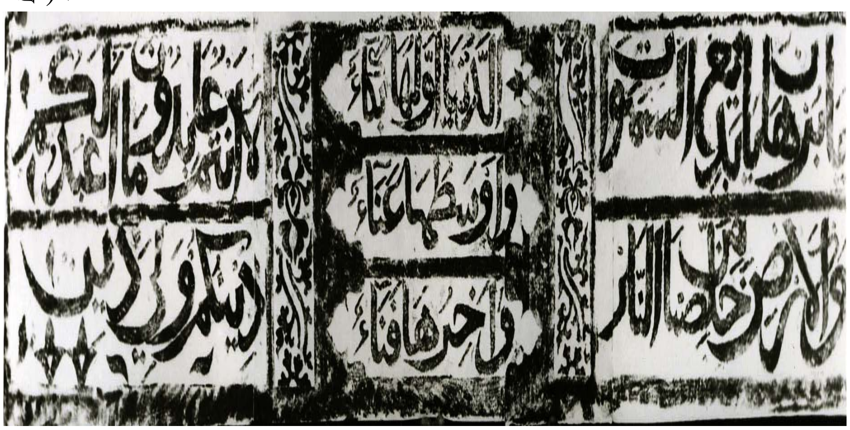

চিত্র ৩.৭.ঘ: খান জাহানের সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ অন্য একটি আরবী শিলালিপি

শিলালিপি ৩.৭ঘ-এর পাঠ (প্রার্থনা সম্বলিত ডান দিকের পটভাগ) :

অনুবাদ	সারি ১ يابرهان يا بديع السموات
পংক্তি **১.** হে উন্মোচনকারী, হে আসমান ও পংক্তি **২.** জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আমাদেরকে [নরকের] আগুন থেকে রক্ষা করুন।	সারি ২ والأرض خَلّصْنا من النار

আধ্যাত্মিক বার্তা সম্বলিত মাঝের পটভাগ:

অনুবাদ	সারি ১ الدنيا أوّلها بكاءٌ
পংক্তি **১.** দুনিয়ার জীবন শুরু হয় কান্না দিয়ে, পংক্তি **২.** এর মধ্যবর্তী অংশ ভোগান্তিময়, পংক্তি **৩.** আর এর সমাপ্তি ঘটে (আধ্যাত্মিক অর্থে) আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে।	সারি ২ وأوسطها عناءٌ সারি ৩ آخرها فناءٌ

উপরে উল্লিখিত শিলালিপিসমূহের দক্ষিণ পাশে আরবী ভাষায় আরবী শব্দ 'ইয়া' **يا** (অর্থাৎ 'হে') দ্বারা শুরু বেশ কিছু প্রার্থনা ও মোনাজাত দৃশ্যমান।

চিত্র ৮.৫০.ঙ. ১: সমাধির ডান দিকে শিলালিপিতে বিধৃত পবিত্র আল-কুরআনের ১০৯তম অধ্যায় সূরা আল-কা'ফিরুন। সমাধিটির সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে ৮.৫০.ক.১-এ।

চিত্র ৮.৫০.ঙ. ২: সমাধির ডান দিকে পবিত্র আল-কুরআনের ১০৯তম অধ্যায় সূরা আল-কা'ফিরুনের দ্বিতীয় অংশ বিধৃত রয়েছে। সামগ্রিক চিত্রটি দেখুন চিত্র ৮.৫০.ক.১-এ এবং সর্বশেষ দুই পংক্তির জন্য দেখুন চিত্র ৮.৫০.ঘ।

কুরআনের পংক্তি (১০৯:১–৫) সম্বলিত পটভাগ:

অনুবাদ **পংক্তি ১.**, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ **পংক্তি ২.** পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, **পংক্তি ৩.** বল, হে অবিশ্বাসীগণ! আমি বিশ্বাস করি না **পংক্তি ৪.** যার তোমরা উপাসনা কর; এবং তোমরা কখনোই উপাসনা করবে না, **পংক্তি ৫.** যাঁর আমরা উপাসনা করি; এবং আমি কখনোই বিশ্বাস করি না যার উপাসনা তোমরা কর। **পংক্তি ৬.** না তোমরা তাঁর উপাসনা করবে যাঁর উপাসনা আমি করি, **পংক্তি ৭.** তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আর আমার ধর্ম আমার জন্য।	**সারি ১** [و] الله سميع عليم **সারি ২** بسم الله الرحمن الرحيم **সারি ৩** قل يا أيها الكافرون لا أعبد **সারি ৪** ما تعبدون ولا أنتم عابدون **সারি ৫** ما أعبد ولا أنا عابد ماعبدتم **সারি ৬** و لا أنتم عابدون ما أعبد **সারি ৭** لكم دينكم ولي دين

শিলালিপি ৮.৫০.ঙ.১ এবং ৮.৫০.ঙ.২ এর পাঠের আলোচনা (চিত্র ৮.৫০.ঙ.১ এবং চিত্র ৮.৫০.ঙ.২, এই সমাধির অন্যান্য অংশের শিলালিপিসমূহের জন্য আরও দেখুন চিত্র ৮.৫০.ক.১):

সূরা কাফিরূন এর পাশাপাশি কুরআনের আরও অনেক পংক্তি এবং পরিপূর্ণ সূরা বা অধ্যায়, বিশেষ করে কুরআনের শেষদিকের বেশ কিছু ছোট সূরা এতে উৎকীর্ণ রয়েছে, যথা: সূরা আল-তাকাছুর, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক্ব এবং সূরা আল-নাস (দেখুন চিত্র ৫০.ক.১)। সমস্ত সমাধিজুড়ে আরবী প্রার্থনা ও আহ্বানের পাশাপাশি সমাধির চারপাশে অবস্থিত দ্বিতীয় স্তরের উচু অংশের বিভিন্ন স্থানে আমরা *আল-তা'ওউদ*, *আল-বাসমালা*,

আল-তাহলীল, আল-তাশাহ্হুদ (বিশ্বাসের সূত্র) উৎকীর্ণ দেখি। এসব শিলালিপিতে একটি হাদিসের উল্লেখ আছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

من مات غريبا، فقد مات شهيدا "যে গরীব (সাদামাটা, ঠাঁইহীন) অবস্থায় মারা গেল সে যেন শহীদ হল।"

প্রথম চারজন সৎপথের পথিক খলিফার নামও উৎকীর্ণ আছে। প্রত্যেকটি নামের পূর্বে একটি উপাধি إلهي بحرمت (হে আমার প্রতিপালক, সম্মানের সাথে) এবং নামের পরে একটি সনির্বন্ধ প্রার্থনা, رضي الله عنه (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আছে।

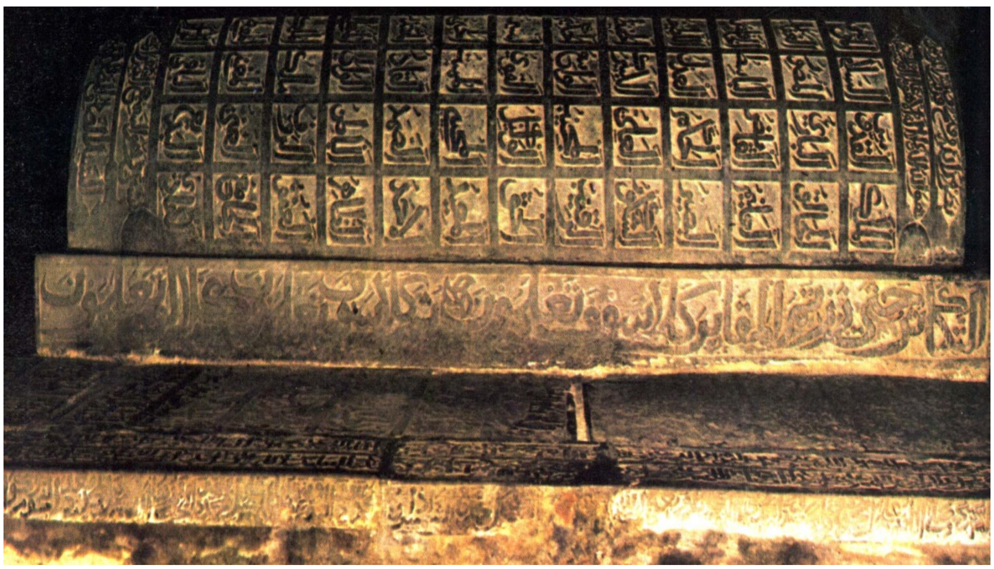

চিত্র ৮.৫০.চঃ চিত্র ৮.৫০.চঃ খান জাহানের সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম (আরও দেখুন চিত্র ৮.৫০.ক.১ এবং ৮.৫০.ক.২)

চিত্র ৮.৫০.চ. শিলালিপির আলোচনা (পুরো দৃশ্যের জন্য দেখুন, চিত্র ৮.৫০.ক.১ এবং ৮.৫০.ক.২): সমাধির উপরে আল্লাহর নিরানব্বইটি গুনবাচক সুন্দর নাম (*আল-আসমা আল-হুসনা*) উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রত্যেকটি নাম আলাদা আলাদা বর্গাকার পটভাগে লেখা হয়েছে যা সমাধির উপরের পুরো জায়গাটি অলংকৃত করেছে। সমাধির প্রতিটি কোণায় সমান্তরালভাবে দুই সারি কুরআনের বাণী রয়েছে। সমাধির উত্তর পাশে নিম্নলিখিত দুই সারি পংক্তি রয়েছেঃ

نصر من الله وفتح قريب وبشّر المؤمنين

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم القدوّس المهيمن

অনুবাদ

[এবং আপনি আপনার প্রিয় আরেকটি অনুগ্রহ লাভ করবেন যা হল] আল্লাহর পক্ষ থেকে জয়, সমাসন্ন বিজয়, আর বিশ্বাসীদের শুভ সংবাদ দিন। (৬১:১৩) তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, সার্বভৌম, বিশুদ্ধ, সর্বগুণভূষিত, বিশ্বাসদাতা। (৫৯:২৩)

সমাধির দক্ষিণ পাশে নিম্নলিখিত আরো দুই সারি পংক্তি রয়েছে:

وهو السميع العليم اللّٰهُمَّ اغفر وارحم

السيد الصادق المصدق

অনুবাদ

তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। হে প্রভু, ক্ষমা ও করুণা দাও।
প্রভু যিনি সত্যের সত্যতা যাচাই করেন।

সমাধির ভিত্তির আনুভূমিক সারিতে পবিত্র কুরআনের অধ্যায় ১০২ (সূরা আল-তাকাসূর) উদ্ধৃত আছে। আরও নিচে, অন্য আরেকটি আনুভূমিক সারিতে কুরআনের অধ্যায় ৮১ (সূরা আল-তাক্বভীর) উদ্ধৃত।

উপর তলায় দৃশ্যমান (বাহ্যিক) সমাধি (স্থাপত্য) কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষে অবস্থিত মূল কবরটি এবং তার আশে পার্শ্বে চতুর্দিকের (প্রায়) সম্পূর্ণ জায়গায় জুড়ে কোন না কোন শিলালিপি রয়েছে।

নিম্নে সেগুলোর আলোকচিত্র দেওয়া হলো :

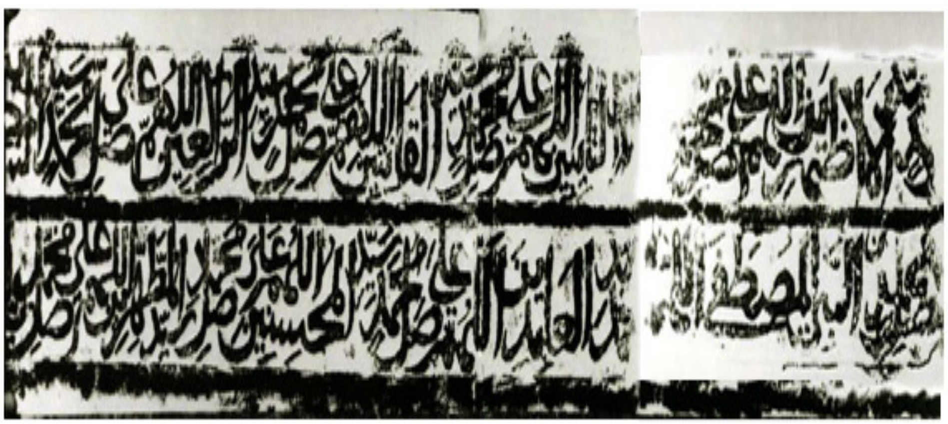

চিত্র ৮.৫০.ছ.১ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

চিত্র ৮.৫০.ছ.২ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

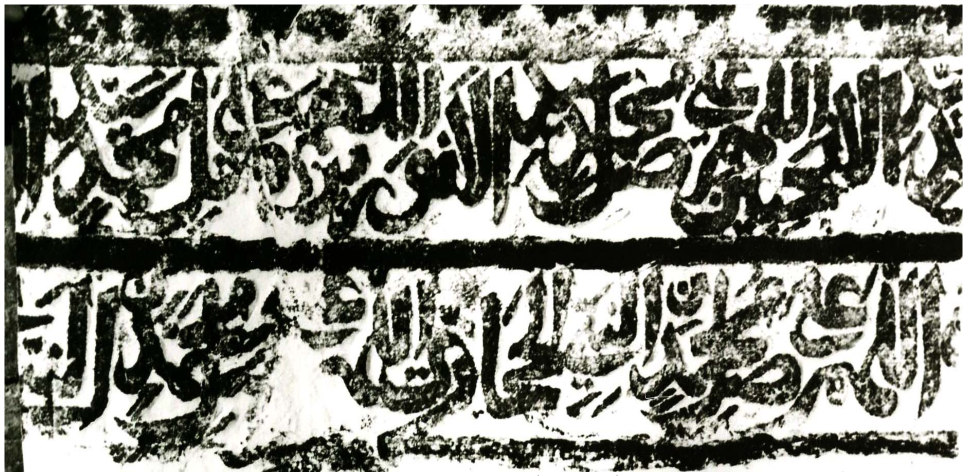

চিত্র ৮.৫০.ছ.৩ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

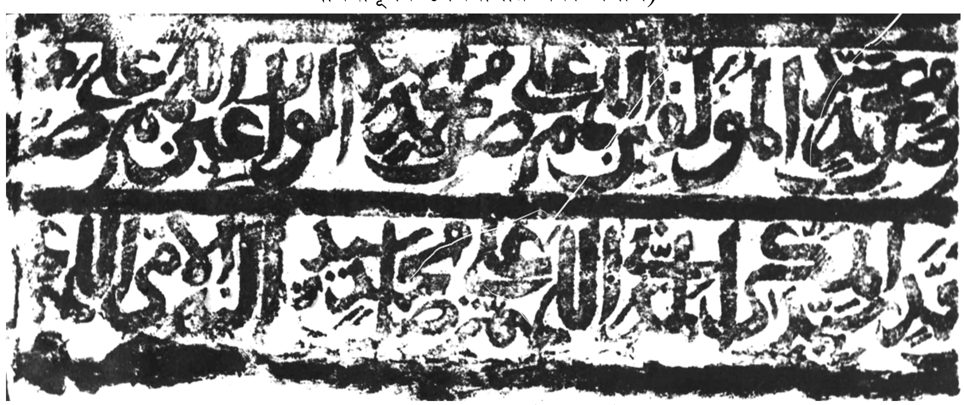

চিত্র ৮.৫০.ছ.৪ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

চিত্র ৮.৫০.ছ.৫ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

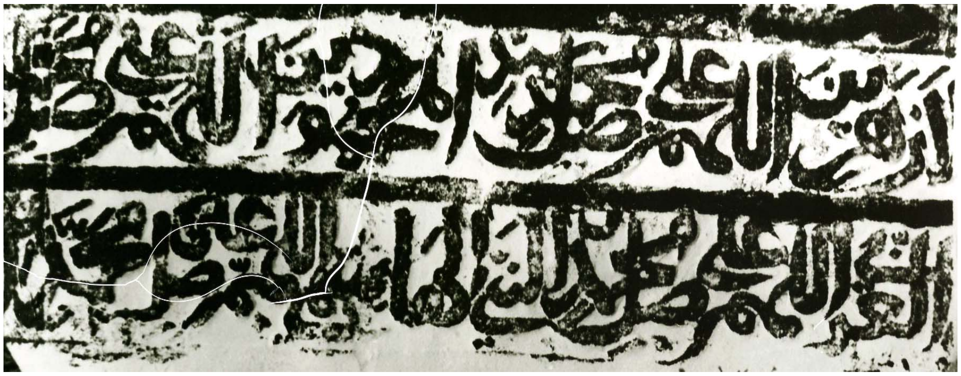

চিত্র ৮.৫০.ছ.৬ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

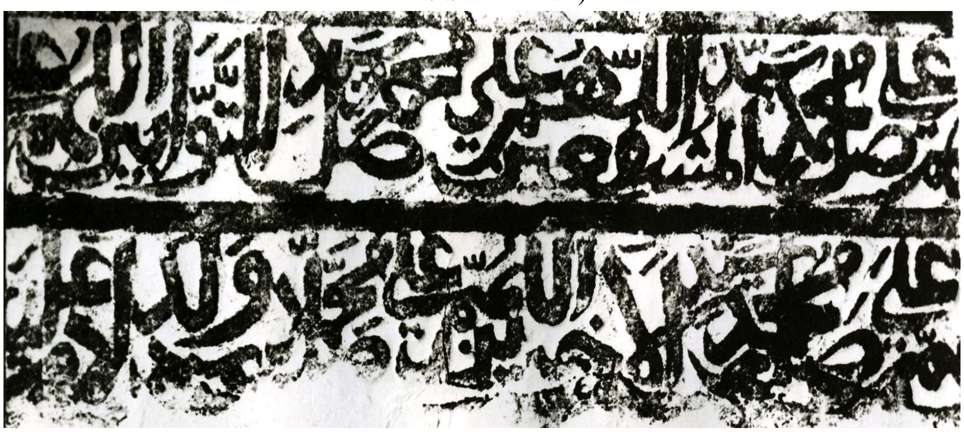

চিত্র ৮.৫০.ছ.৭ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

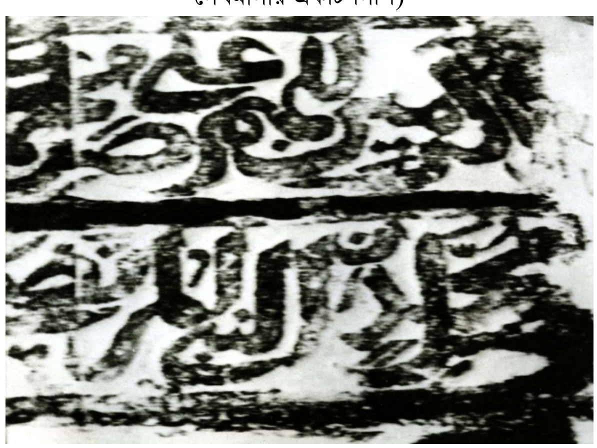

চিত্র ৮.৫০.ছ.৮ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

চিত্র ৮.৫০.ছ.৯ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

৫০.ছ. শিলালিপিসমুহের আলোচনা (চিত্র ৮.৫০.ছ): এসব শিলালিপিগুলোত মূলত ধর্মীয় প্রার্থনা ও আহ্বান রয়েছে, যাতে মহানবীর (সঃ) প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনুরাগের প্রকাশ পেয়েছে। সবগুলো শিলালিপিই আরবী শব্দগুচ্ছঃ اللهم صلّ على محمد سيّد (অনুবাদঃ হে আল্লাহ [আমাদের] নেতা মুহাম্মদের (সঃ) উপর প্রসাদ বর্ষণ করুন) শুরু হয়েছে, এবং বিভিন্ন বিশেষণ, যেমনঃ المحسنين (আল মুহসিনীন, অর্থ দয়াশীল ও উদার), এর মাধ্যমে শেষ হয়েছে। শিলালিপিগুলো মোটামুটি *ইজাযা* রীতির। সব মিলিয়ে শিলালিপিগুলো সমাধির উঁচু মঞ্চের দ্বিতীয় স্তরের চারধারে মেঝের প্রান্তে আয়তাকার চারুলিপির সারি তৈরি করেছে (সামগ্রিক দৃশ্যের জন্য দেখুন চিত্র ৮.৫০.ক.২)।

চিত্র ৮.৫০.জ.১ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

চিত্র ৮.৫০.জ.২ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

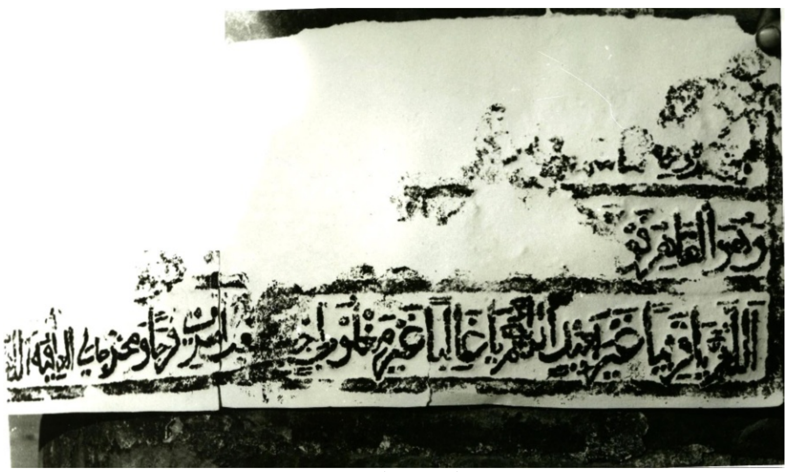

চিত্র ৮.৫০.জ.৩ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

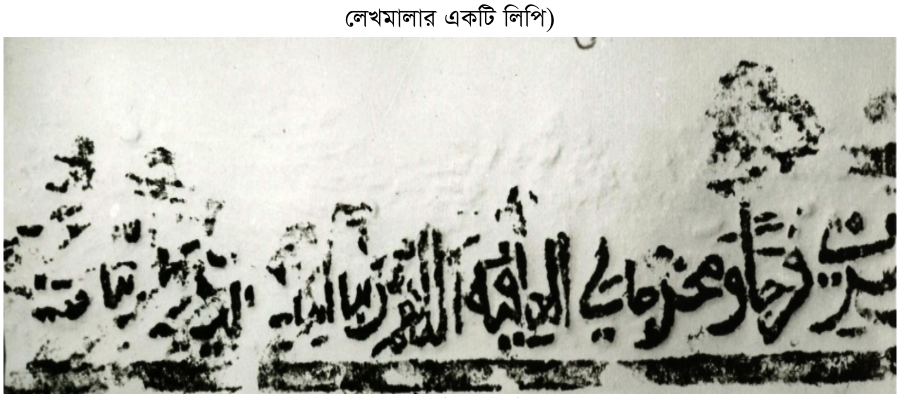

চিত্র ৮.৫০.জ.৪ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

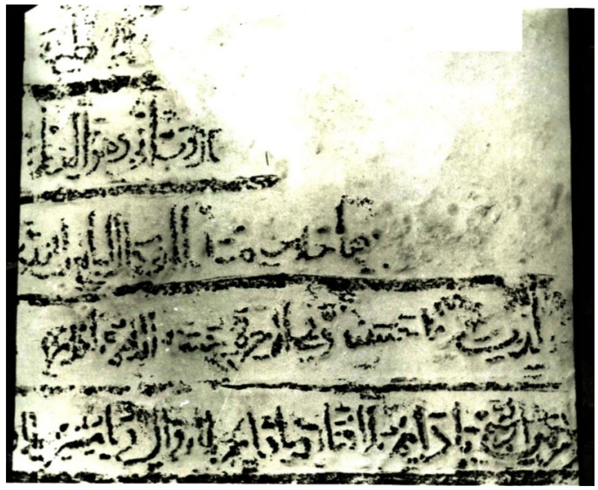

চিত্র ৮.৫০.জ.৫ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

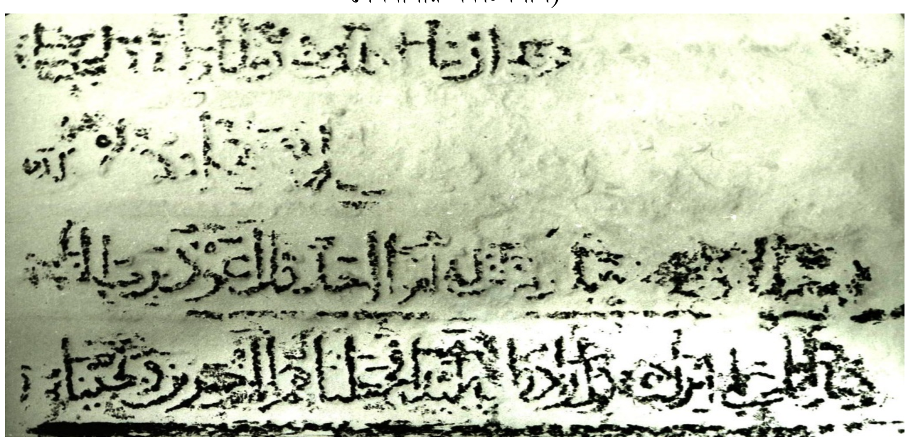

চিত্র ৮.৫০.জ.৬ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

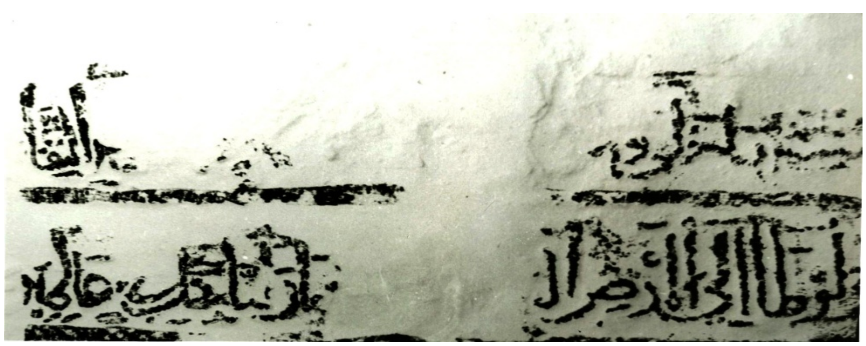

চিত্র ৮.৫০.জ.৭ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

চিত্র ৮.৫০.জ.৮ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

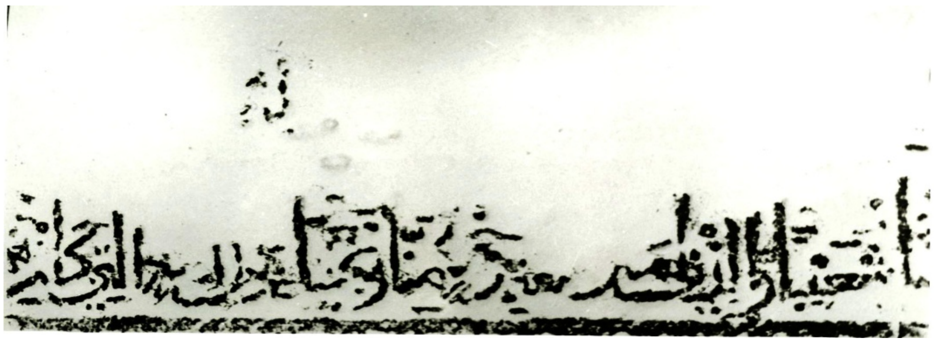

চিত্র ৮.৫০.জ.৯ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

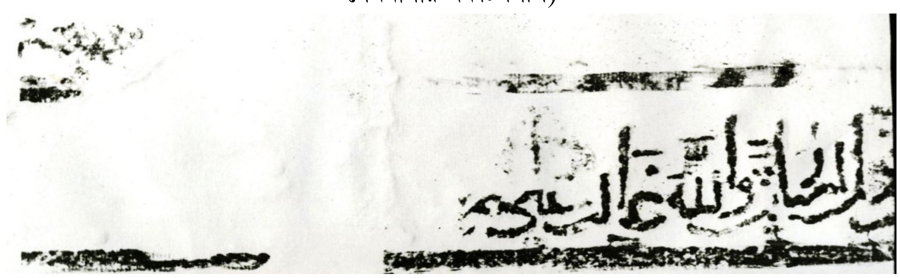

চিত্র ৮.৫০.জ.১০ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

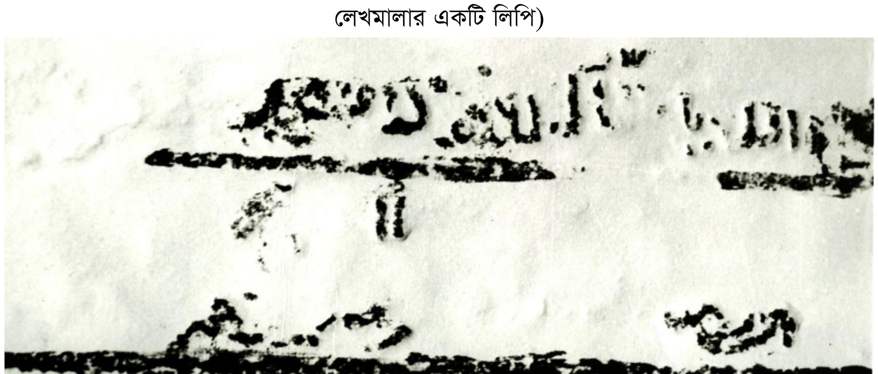

চিত্র ৮.৫০.জ.১১ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

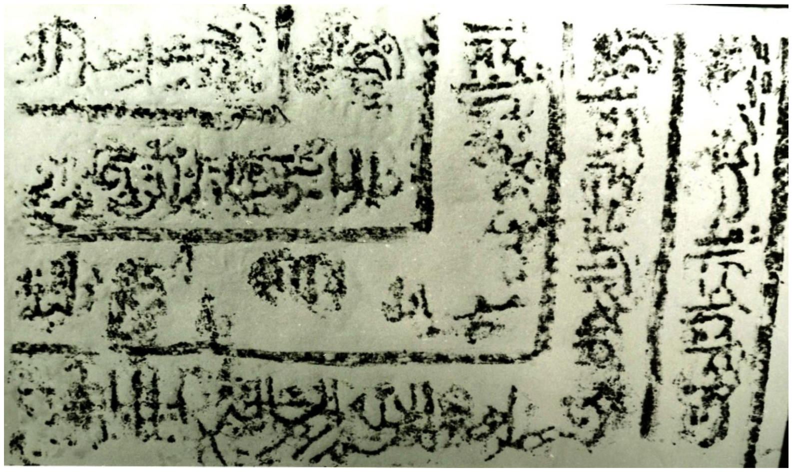

চিত্র ৮.৫০.জ.১২ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

চিত্র ৮.৫০.জ.১৩ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

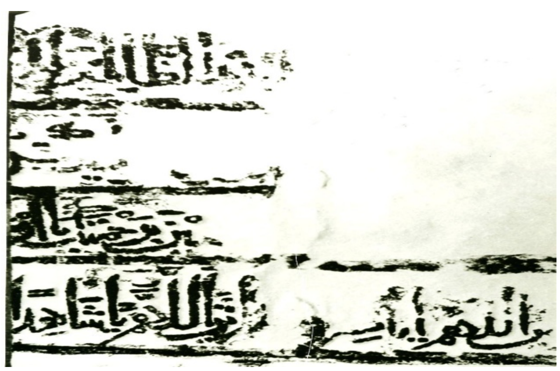

চিত্র ৮.৫০.জ.১৪ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

চিত্র ৮.৫০.জ.১৫ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

৫০.জ-এর শিলালিপিসমুহের আলোচনা (চিত্র ৮.৫০.জ.): এই ধর্মীয় বাণীগুলো প্রধানত পবিত্র কুরআনের বাণী, আধ্যাত্মিক সনির্বন্ধ প্রার্থনা এবং অন্যান্য প্রার্থনা যা উঁচু মঞ্চের দ্বিতীয় সারির চারদিকের দেয়ালের উপর উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

চিত্র ৮.৫০.ঝ: ফার্সী আধ্যাত্মিক চরণ যা উঁচু মঞ্চের প্রথম স্তরের চারধারের একধারের মেঝেতে উৎকীর্ণ

৫০.ঝ. শিলালিপির বাম পাশের উপরের প্রথম দুইটি সারি আনুভূমিক (চিত্র ৮.৫০.ঝ.):

অনবাদ হে বন্ধুগণ, স্মরণ কর হে: মৃত্যু সত্য, মৃত্যু সত্য। এই বাগানে একটি কাঁটা – মৃত্যু সত্য, মৃত্যু সত্য। নিশ্চিত জেনো, সকল প্রাণের পরিণতি হয় মৃত্যুতেই; নয় সে অন্য শত্রুর মত। মৃত্যু সত্য, মৃত্যু সত্য।	یاد اورید أي دوستان الموت حق الموتحق خارست اندر بوستان الموت حق الموت حق مرگست خصمی محکمے پے جمله جانان ذو یقین نئي همچو دیگر دشمنان الموت حق الموت حق

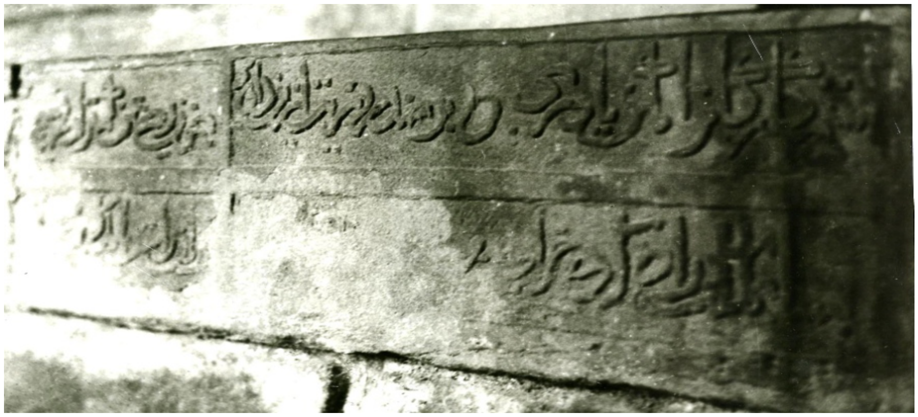

চিত্র ৮.৫০.ঞ.১ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

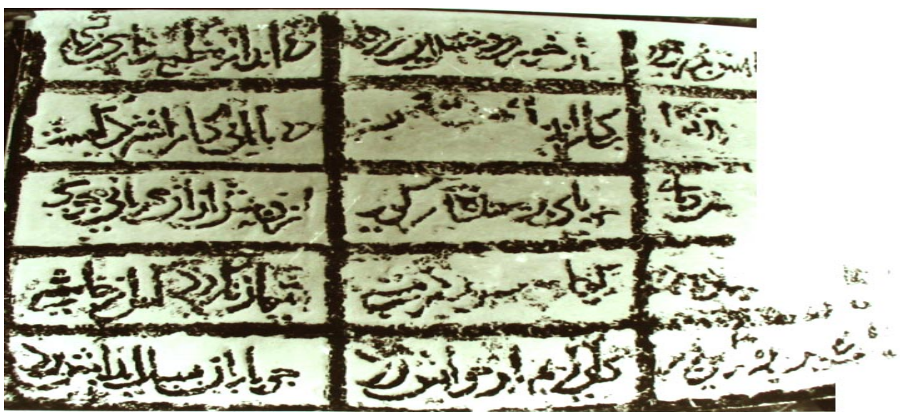

চিত্র ৮.৫০.ঞ.২ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

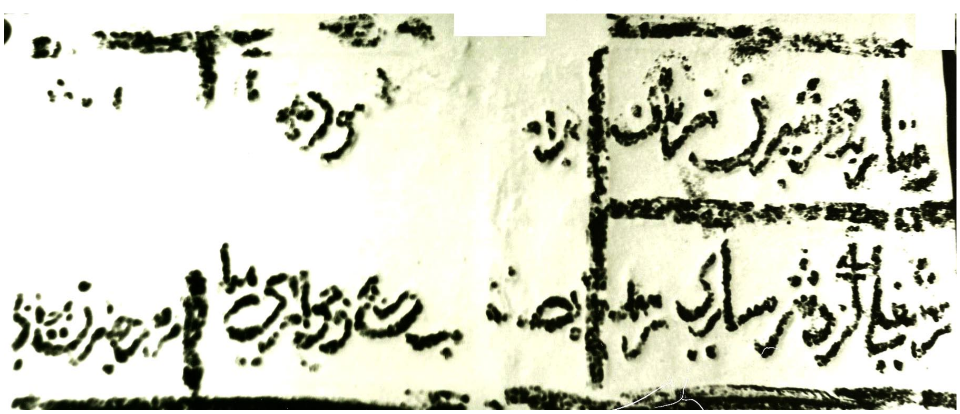

চিত্র ৮.৫০.ঞ.৩ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

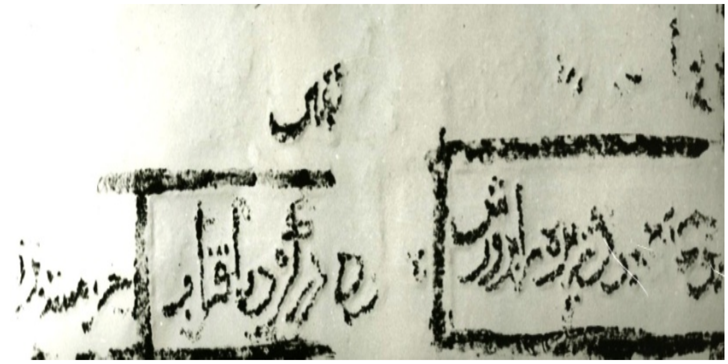

চিত্র ৮.৫০.ঞ.৪ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

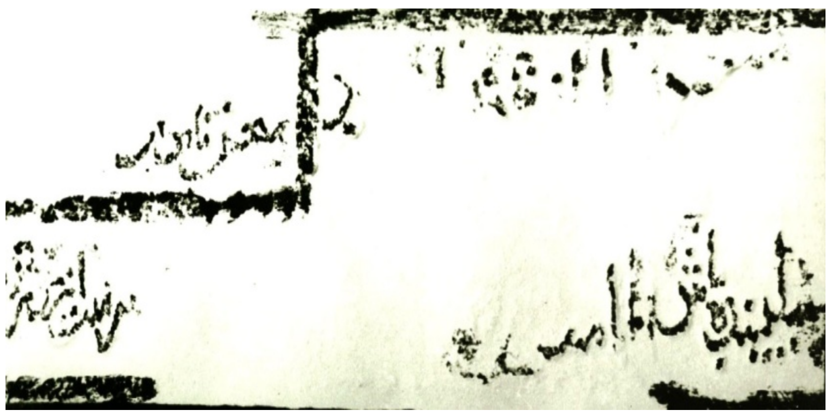

চিত্র ৮.৫০.ঞ.৫ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

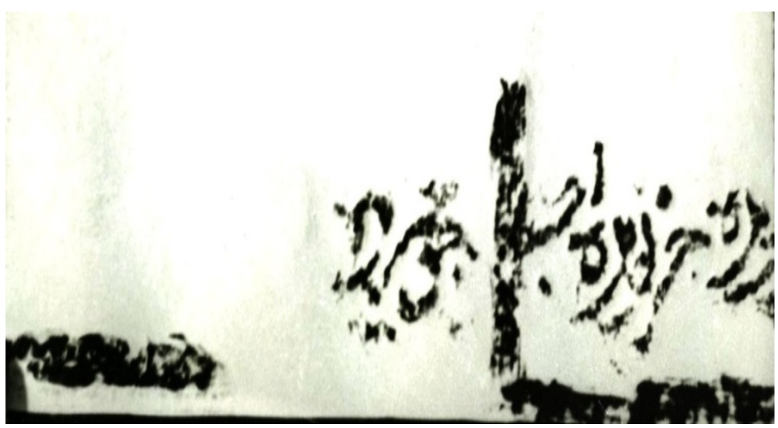

চিত্র ৮.৫০.ঞ.৬ (খান জাহানের দৃশ্যমান সমাধি কাঠামোর ঠিক নিচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের বহুবিধ প্রার্থনামূলক লেখমালার একটি লিপি)

৫০.ঞ-এর শিলালিপিসমুহের আলোচনা (চিত্র ৮.৫০.ঞ.): এগুলো মূলত ফার্সী আধ্যাত্মিক পদ্য যা উঁচু মঞ্চের প্রথম স্তরের চারধারের দেয়ালের উপর উৎকীর্ণ।

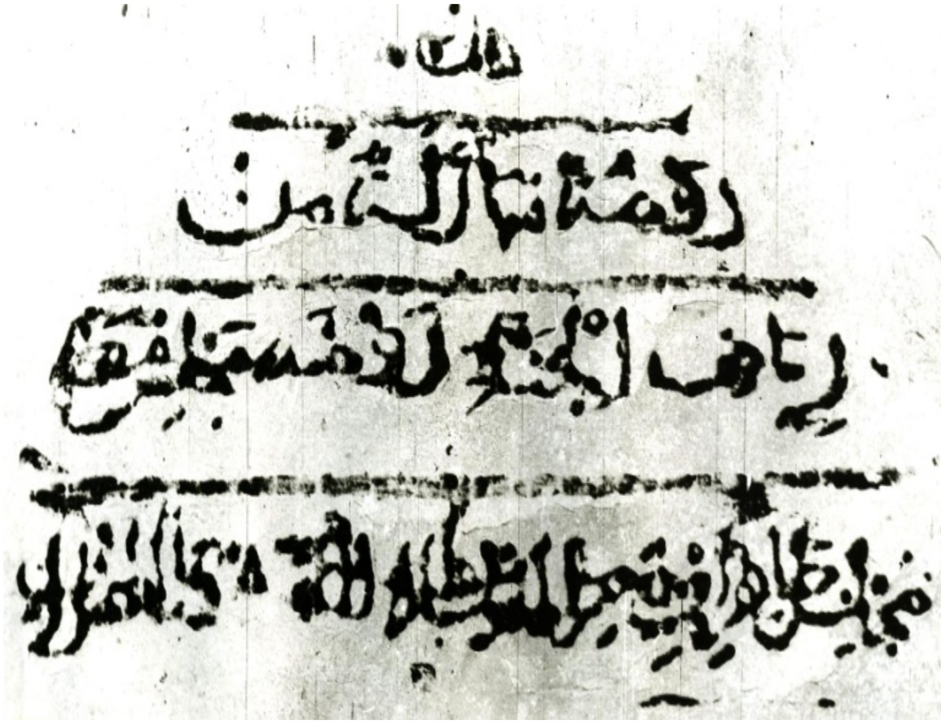

চিত্র ৮.৫০.ট.১: চিত্র ৮.৫০.ট.১: মুহাম্মদ তাহিরের সমাধির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরবী শিলালিপি।

শিলালিপি ৮.৫০.ট.১-এর পাঠ ও অনুবাদ (চিত্র ৮.৫০.ট.১)

অনুবাদ	মূল পাঠ
এই	هذه
চমৎকার বাগানটি	روضة مباركة من
জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং সম্মানিত পারিষদ	رياض الجنة روضة مجلس معظّم
মজলিস তাহিরের বিশ্রামস্থল ...।	مجلس طاهر . . .

শিলালিপি ৫০.ট ২. (চিত্রবিহীন)

এটা মুহাম্মদ তাহিরের সমাধির দ্রাঘিমাংশ বরাবর অন্যপ্রান্তে অবস্থিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত দ্বিতীয় ডিম্বাকার আরবী শিলালিপি।

هذه روضة مباركة من رياض الجنة وهذه صقبة لحبيبه إسمه محمد طاهر سنة ثلاث وستين وثمانماية

অনুবাদ: এই চমৎকার বাগানটি জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং তার নিকটবর্তী বন্ধুর জন্য যার নাম মুহাম্মদ তাহির, ৮৬৩ হিজরী সন।

চিত্র ৮.৫০.ট.২: খান জাহানের সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য মুহাম্মদ তাহিরের সমাধির শিলালিপিসমূহের দৃশ্য।

সহায়ক গ্রন্থ

১. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফি-সাধক*, (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭), ৭৮৮২।

২. এনামুল হক, *ইসলামিক আর্ট হেরিটেজ অব বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ১৯৮৩), ৪০১০১।

৩. *যশোর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০১), ১২৪, ৪২২

৪. *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*, ২য় সংস্করণ, প্রবন্ধ "সুন্দরবন"।

৫. *যশোর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০১), ১০৮, ১৬৭

৬. *যশোর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০১), ৪১৬

৭. *যশোর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০১), ৪২০৪২২

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

নামাযে আমীন নীরবে পড়া সুন্নাত ঃ একটি পর্যালোচনা

হুমায়ুন কবির*

ভূমিকা

'আমীন' (آمِين) অর্থ হে আল্লাহ আমাদের দু'আ শুনুন ও কবুল করুন! তা فَعِيلٍ এর ওজনে এবং এর আলিফকে টানাও যাবে। কেউ কেউ বলেন, তা আল্লাহ্‌র নাম। এক সাহাবির আছরে এসেছে, {آمِينَ خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} অর্থ, এটি আল্লাহ্‌র সিলমোহর। তা বান্দাহর উপর আল্লাহ্‌র সিল যার মাধ্যমে বিপদ ও মসীবত দূর করা হয়। যেমন কোনো চিঠিতে সিল মারলে তা সংরক্ষিত থাকে।[১]

সাধারণত 'আমীন' ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ে পড়বে। ইমাম আবু হানিফা যদিও আমীন না পড়ার কথা বলেছিলেন, পরে তা থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। আস্তে ক্বেরাতের নামাযে কিন্তু মুক্তাদির 'আমীন' পড়তে হবে না; কেননা তখন তারা সূরায়ে ফাতেহা শুনে না।

বর্তমানে ফরয নামাযে ইমামের পেছনে আমীন পড়া নিয়ে মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশে প্রায়ই তো নীরবে পড়ে তবে বর্তমানে কিছু লোককে বড় করে 'আমীন' বলতে দেখা যায়, যার কারণে অনেক সময় ইমাম সাহেব ও অন্যান্য মুক্তাদিরা নামাযে বিব্রত বোধ করেন।

নামাযে সূরায়ে ফাতেহা শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত তাতে কারো দ্বিমত নেই। তেমনি 'আমীন' সূরায়ে ফাতেহার অংশ নয় তাতেও কারো দ্বিমত নেই। সাধারণত 'আমীন' আস্তে পড়া বা বড় করে পড়া জায়েজ হওয়াতে কারো দ্বিমত নেই; তবে কোনটি উত্তম বা সুন্নাত?

১. হানাফী, মালেকী, ইমাম সুফয়ান সওরী, হাসান বসরী ও ইব্রাহীম নখয়ীর মাযহাব মতে আমীন নীরবে পড়া সুন্নাত।

২. শাফেয়ী, হাম্বালী, আওজায়ী, ইসহাক ও আহলে হাদিসের মাযহাব মতে বড় করে বলা উত্তম বা সুন্নাত।

আমি প্রথমে হানাফি মাযহাবের দলীলসমূহ তুলে ধরব অতঃপর শাফেয়ী প্রমুখের দলীলসমূহ জবাবসহ তুলে ধরব পরিশেষে সারগর্ভ তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

হানাফী মাযহাব প্রমুখের দলীলসমূহ

১. আমীন হলো দু'আ; কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করলেন, তখন হযরত হারুন (আ) 'আমীন' বললেন।

যেমন মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাকে এসেছে,

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. বগভী, মুহিউস সুন্নাহ হুসাইন, (মৃতঃ ৫১৬ হি.), শরহুস সুন্নাহ, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামীঃ ১৪০৩হি./১৯৮৩ খ্রি.), খ.-৩ পৃ. ৬৩।

عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا دَخَلَ أَمَّنَ هَارُونُ عَلَى دُعَائِهِ»

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মূসা ইবনে ইমরান যখন দু'আতে প্রবেশ করতেন, তখন হযরত হারুন (আ.) তার দু'আতে 'আমীন' বলতেন।"[২]

তখন মহান আল্লাহ বললেন, قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

"তোমাদের দু'জনের দু'আ কবুল করা হয়েছে।"[৩] এবং 'আতা বলেন, قَالَ عَطَاءٌ : آمِينَ دُعَاءٌ অর্থাৎ, হযরত 'আতা বলেন, 'আমীন' দু'আ।[৪]

যখন 'আমীন' দু'আ প্রমাণিত হলো, আর দু'আর সুন্নাত হলো নীরবে করা।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}

"তোমরা তোমাদের রবের নিকট দু'আ কর অত্যন্ত বিনয় ও নীরবে। তাই 'আমীন' আস্তে পড়া উত্তম হবে।"[৫]

২. ইমাম তিরমিযী শু'বা সূত্রে বর্ণনা করেন,

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

"হযরত ওয়ায়িল ইবনে আলকামাহ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، পড়তেন, তখন আমীন বলতেন এবং তা নীরবে পড়তেন।"[৬]

মুসতাদরাক হাকেমে রয়েছে, তিনি বলেছেন এ হাদিসটি শায়খানের শর্ত মোতাবেক বিশুদ্ধ। ইমাম যাহাবী তালখীছে তা স্বীকার করেছেন। কেউ কেউ শু'বার বর্ণনাকে ভুল বলে থাকেন তা সঠিক নয়; কেননা তিনি একজন আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস।[৭]

---

২. আবু বকর, আব্দুর রজ্জাক (মৃতঃ ২১১ হি.), **আল মুসান্নাফ**, (হিন্দঃ আল মজলিসুল ইলমী:১৪০৩ হি.), হাদিস নং: ২৬৫১।

৩. কুরআনে কারীম, সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৯।

৪. বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, জামে, (কায়রোঃ দারুশ শু'আব, ১৯৮৭ ইং/১৪০৭ হি.), খ.-১, পৃ. ১৯৮।

৫. কুরআনে কারীম, সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫।

৬. তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, আস সুনান, (বৈরুত : দারুল গারবুল ইসলামী, ১৯৯৮খ্রি.), হাদিস নং: ২৪৮; আবু দাউদ, সুলাইমান (মৃতঃ ২৭৫ হি.), **আস সুনান**, (বৈরুতঃ মাকতাবায়ে আসরিয়া, তা. বি.), হাদিস নং: ১১১৭; আহমদ ইবনে হাম্বাল, **আল মুসনাদ**, (মুয়াসাসাতুর রিসালা:১৯৯৯/১৪২০ হি.), হাদিস নং: ১৯০৫৯, তাবরানী, আবুল কাসেম সুলাইমান, **আল মুজামুল কবীর**, (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২২, পৃ. ৯, দারে কুতুনী, আবূল হাসান আলি ইব্‌নে ওমর (মৃতঃ ৩৮৫ হি.), সুনানু দ্বারে কুতুনী, (বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, ১৪২৪/২০০৪ খ্রি.), খ.-১, পৃ. ৩৩৪।

যেমন, ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন,

سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا، وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: عَنْ حُجْرٍ أَبِي العَنْبَسِ، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ، وَزَادَ فِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ: وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ: وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ.

"আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, সুফয়ানের হাদিস শু'বার হাদিসের তুলনায় বিশুদ্ধ বেশী। শু'বা এ হাদিসের কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন, ১. তিনি সেখানে হুজর আবিল আনবাসের কথা বলেছেন, অথচ তিনি হলেন, হুজর ইবনে আনবাস যার উপনাম আবুস সাকান ২. সেখানে তিনি আলকামা বাড়িয়েছেন অথচ তিনি সেখানে নেই ৩. তিনি সেখানে ছোট করে বলার কথা বলেছেন, অথচ তাতে বড় করে বলার কথা রয়েছে। আমি আবু যুর'আ থেকে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি তখন তিনি বললেন, সুফয়ানের হাদিস বিশুদ্ধ বেশী।"[৮]

ইমাম বুখারীর এই তিন প্রশ্নের জবাব আল্লামা নীমুবি এভাবে দিয়েছেন, তিনি যে বলেছেন, হুজরের পিতার নাম আনবাস। তার উপনাম আবুল আনবাস নয়, তার উত্তর হলো, তার পিতার নাম আনবাস সাথে সাথে তার কুনিয়াতও আবুল আনবাস এবং তার জন্য অন্য কুনিয়াতও থাকতে পারে যেমন আবুস সাকান। এদিক ইশারা করে ইবনে হিব্বান বলেন,

حجر بْن عَنْبَس أَبُو السكن الْكُوفِي وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ حُجْرُ أَبُو العنبس يروي عَن على وَوَائِل بْن حجر روى عَنهُ سَلمَة بن كهيل

"হুজর ইবনে আনবাস আবুস সাকান কূফী তাকেই হুজর আবুল আনবাসও বলা হয়। তিনি আলি (রা) ও ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেন।"[৯]

বরং সুফয়ানও আবুল আনবাস দিয়ে বর্ণনা করেছেন। যেমন আবূ দাঊদ শরীফে এসেছে,

عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: «آمِينَ»، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

"সুফয়ান তিনি সালামা থেকে তিনি হুজর আবীল আনবাস হাযরামী থেকে তিনি ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'দাল্লিন' পড়তেন তখন বড় করে 'আমীন' বলতেন।"[১০]

---

৭. বদরুদ্দীন আইনী, ওমদাতুল কারী শরহে বুখারী, (বৈরুত দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, তা. বি), খ. ৬, পৃ. ৫১।
৮. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ.-১, পৃ. ৩৩২, হাদিস নং: ১২৮৬।
৯. ইবনে হিব্বান, মুহম্মদ ইবনে হিব্বান (মৃত: ৩৫৪ হি), আস ছিকাত, (হিন্দ:দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৯৩ হি. /১৯৭৩ খ্রি.), খ-৪, পৃ. ১৭৭।

এবং শু'বা নয়; বরং মুহাম্মদ ইবনে কছির, ওকী' ও মুহারেবি তারা তিনজনই সুফয়ান থেকে ابو العنبس শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ওকী' ও মুহারেবির কথা দ্বারে কুতনীতে 'তা'মিন' অধ্যায়ে রয়েছে।

যেমন তিনি বলেন,[১১]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْمُحَارِبِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ وَهُوَ ابْنُ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ.

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, হুজর আলকামা থেকেও শুনেছেন এবং তার পিতা থেকেও শুনেছেন মুসনাদে আহমদে দু'টিই এসেছে। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ { **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** } قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

"শু'বা তিনি সালামা ইবনে কুহাইল থেকে তিনি হুজর আবিল আনবাস থেকে তিনি আলকামা থেকে তিনি ওয়ায়েল থেকে বা হুজর ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের সাথে রাসূল নামায পড়লেন যখন তিনি 'ওয়ালাদ দাল্লিন' পড়লেন তিনি বড় করে 'আমীন' বললেন এবং তার ডান হাত বাম হাতে রাখলেন এবং ডানে বামে সালাম ফিরালেন।[১২]

এবং ইমাম বুখারীর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে এর দ্বারা হাদিসটি মুজতারিব প্রমাণিত হবে তখন কোনো পক্ষ তা দিয়ে দলিল দিতে পারবে না।

এবং তিনি যে বলেছেন ছওরীর বর্ণনার প্রাধান্য হবে তাতে সকল মুহাদ্দিছীন একমত নন। কেউ কারো থেকে কম নন। সুফয়ানের যে মর্যাদা শু'বারও সেই মর্যাদা তিনি তো আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস ছিলেন; বরং চিন্তা করলে শু'বার বর্ণনার প্রাধান্যতা পাওয়া যায়; কেননা তিনি তাদলিস করতেন না। ইমাম যাহাবী তাযকেরাতুল হুফ্ফাযে তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সুফয়ান ছওরী মাঝে মধ্যে তাদলিস করতেন যাহাবী মীযান কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী বলেন,

---

১০. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৯৩২।

১১. দ্বারে কুতুনী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ১২৮২।

১২. আহমদ ইবনে হাম্বাল, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ১৮৮৫৪।

قال أبو زيد الهروي سمعت شعبة يقول: لأن أقع من السماء فأنقطع أحب إليّ من أن أدلس.

"আবু জায়েদ হারবী বলেন, আমি শু'বাকে বলতে শুনেছি তাদলিস করার চেয়ে আমি আসমান থেকে ভেঙ্গে পড়া আমার কাছে অনেক প্রিয়।[১৩] যাহাবী সুফয়ান সম্পর্কে বলেন,

سفيان بن سعيد الحجة الثبت، متفق عليه، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء، ولكن له نقد وذوق، ولا عبرة لقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين.

"সুফয়ান ইবনে সায়ীদ বিশ্বস্ত। যদিও দুর্বলদের থেকে তাদলিস করেন। কিন্তু তার সেখানে যাচাই করার যোগ্যতা আছে। যারা বলে তিনি মিথ্যুকদের থেকেও হাদিস তাদলিস করেন তা সঠিক নয়।"[১৪]

কেউ বলেন, আলকামা তার পিতা থেকে শ্রবণ সহিহ নয়; তার পিতা তার জন্মের ছয় মাস পূর্বে মারা গেছেন তা সঠিক নয়। হাত তোলা অধ্যায়ে ইমাম নাসাঈ আলকামা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করার হাদিস এনেছেন; বরং তার ছোট ভাই আব্দুল জব্বার শুনে নাই। আলকামা শুনেছেন।

তানকীহ প্রণেতা বলেন, শু'বা থেকে সুফয়ানের পক্ষেও দলীল পাওয়া যায়। যেমন মুসনাদে আহমদে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ { **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** } قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

"শু'বা তিনি সালামা ইব্ন কুহাইল থেকে তিনি হুজর আবিল আনবাস থেকে তিনি আলকামা থেকে তিনি ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের সাথে রাসূল ﷺ নামায পড়লেন যখন তিনি 'ওয়ালাদ দাল্লিন' পড়লেন তিনি বড় করে 'আমীন' বললেন এবং তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতে রাখলেন এবং ডানে বামে সালাম ফিরালেন।"[১৫]

---

১৩. যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃত:৭৪৮ হি.), **তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ**, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১৯/১৯৯৮খ্রি.), খ.-১, পৃ. ১৪৫।

১৪. যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃত:৭৪৮হি.), **মীজানুল ইতিদাল**, (বৈরুত: দারুল মারিফাত, ১৩৮২/১৯৬৩খ্রি.), খ.-২, পৃ. ১৬৯।

১৫. আহমদ ইবনে হাম্বাল, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ১৮৮৫৪।

এর জবাবে বলা যায়, এটি আবুল ওয়ালিদের *'শায'* বর্ণনা যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং এ হাদিসটি আবূল ওয়ালিদ থেকে ইব্রাহিম ইবনে মারযুখ বর্ণনা করেছেন সে শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গেছিল।

মোটামোটি কথা এ হাদিসটির সনদ সহিহ হলেও তার মতন *মুজতারিব*।

৩. ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: "لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: **وَلَا الضَّالِّينَ** فَقُولُوا: **آمِينَ**، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"

"রাসূল ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তোমরা ইমামের আগে বাড় না, সে যখন তাকবীর বলে তোমরা তাকবীর বল এবং যখন ইমাম 'ওয়ালাদ দাল্লিন' বলে তোমরা আমীন বল, আর সে যখন রুকু করে তোমরা রুকু কর এবং যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ পড়।"[১৬]

ইমাম নিমুবী (র) এ হাদীসের টিকায় বলেন, এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম সাহেব আমীন বড় করে পড়বে না, নতুবা রাসূল ﷺ বলতেন না যখন ইমাম 'ওয়ালাদ দাল্লিন' পড়বে তোমরা আমীন বল; বরং বলতেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরা তখন আমীন বল।[১৭]

৪. বুখারী শরীফে হাদিসটি এভাবে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ {**غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ الضَّالِّينَ**} فَقُولُوا آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন ইমাম সাহেব {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ الضَّالِّينَ} পড়বে, তখন তোমরা 'আমীন' বল, কেননা, যার 'আমীন' ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১৮]

৫. বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত,

---

১৬. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, **সহিহ মুসলিম**, (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, তা. বি), হাদিস নংঃ ৪১৫। ইবনে হুজাইমা, আবু বকর মুহাম্মদ, **সহিহ ইবনে হুজাইমা**, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী), হাদিস নংঃ ১৫৭৬, বগভী, প্রাগুক্ত, ৮৪৭।

১৭. নিমুবী, মুহাম্মদ ইবনে আলী (মৃতঃ১৩২২ হি), **আছারু সুনান মাআত তালিকুল হাসান**, (করাচিঃ মাকতাবতুল বুশরা, ১৪৩২হি./ ২০১১ খ্রি), পৃ.১২৩।

১৮. বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নংঃ৪৪৭৫।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলবে এবং আসমানের ফেরেশতারা আমীন বলে তখন একটার সাথে আরেকটা মিলে যায় তখন পূর্ববর্তী সকল পাপসমুহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১৯]

৬. মুসতাখরাজে আবী আওয়ানাতে হযরত আবূ মুসা আশআরী থেকে এসেছে,

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ "

"হযরত আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন ইমাম ক্বেরাত পড়বে তোমরা চুপ থাক এবং যখন 'ওয়ালাদ দাল্লিন' বলবে, তোমরা 'আমিন' বল।"[২০]

৭. আবু দাউদ শরীফে হযরত হাসান থেকে বর্ণিত,

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ

"হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, সামুরা ইবনে জুনদাব ও ইমরান ইবনে হুসাইন পরস্পর আলোচনা করেছেন, তখন সামুরা ইবনে জুনদাব বলেন, তিনি রাসূল ﷺ থেকে দু'টি নিরবতা স্মরণ রেখেছেন একটি হলো, যখন তিনি তাকবীর বলতেন। আরেকটি হলো, যখন তিনি 'ওয়ালাদ দাল্লিন' এর ক্বেরাত থেকে ফারেগ হতেন (নিরবে আমীন বলার জন্য)। সামুরা তা স্মরণ রেখেছেন। ইমরান ইবনে হুসাইন তা অস্বীকার করলেন, তখন তারা দু'জনে উবাই

১৯. বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৭৮১; মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৪১০।

২০. আবু আওয়ানা, ইয়াকুব ইসফরাইনি, মুসতাখরাজু আবী আওয়ানা, (বৈরুত: দারুল মারিফাত, ১৪১৯ হি/১৯৯৮খ্রি.), হাদিস নং: ১৬৯৮।

ইবনে কাবের নিকট তা সমাধানের জন্য পেশ করলেন, তখন তিনি তাদের উত্তরে বললেন, সামুরা সঠিক।[২১]

ইমাম তিরমিযী এ হাদিসকে হাসান বলেছেন, মোল্লা আলী কারী (র) মিরকাতে বলেছেন, ইবনে হাজার বলেন, হাদিসটি হাসান বরং সহীহ।[২২]

৮. মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরাইরা সুত্রে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ }، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যখন ইমাম সাহেব {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} বলবেন, তখন তোমরা 'আমীন' বল, কেননা; ফেরেশতারা 'আমীন' বলে এবং ইমাম সাহেবও 'আমীন' বলে। তাই যখন তোমাদের 'আমীন' ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তখন তার পূর্বের সকল পাপ মুছে দেওয়া হবে।"[২৩]

ইমাম বগভী বলেন এ হাদিস বিশুদ্ধ। আযমী বলেন হাদিসটি বিশুদ্ধ।

৮. হযরত ওমর থেকে বর্ণিত,

عن إبراهيم قال: قال عمر: "أربع يخفين عن الإمام: التعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللّٰهُمَّ ربنا ولك الحمد".

"ইব্রাহিম তিনি ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, চারটি বস্তু ইমামকে আস্তে পড়তে হয়, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ।"[২৪]

৯. হযরত ইব্রাহীম সুত্রে বর্ণিত,

---

২১. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৭৭৯; আহমদ ইবনে হাম্বাল, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ২০৫০৮; ইবনে হুজাইমা, প্রাগুক্ত, ১৫৭৮, তাবরানী, প্রাগুক্ত, হাদিস: ৬৮৭৫, দ্বারে কুতনী, প্রাগুক্ত, খ.-১, পৃ.৩৩৬, বাইহাকী, আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন, সুনানু কুবরা, ১০ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, (হিন্দ: মজলিসু দাইরাতুল মাআরিফ:১৩৪৪ হি.), হাদিস নং: ৩২০১, বগভী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১।

২২. মোল্লা আলি ক্বারী, (মৃত:১০১৪ হি), মিরকাত, ৯ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২২হি./২০০২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৮০।

২৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৭১৮৭। নাসাঈ, আবু আব্দুর রহমান, সুনানে নাসাঈ (বৈরুত: দারুল মারিফাত, ১৪২০হি), হাদিস নং: ৯২৬; দ্বারেমী, আবু মুহাম্মদ, সুনানে দ্বারেমী, ২ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি.), হাদিস নং: ১২৮২, আবু বকর আব্দুর রয্যাক, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ২৬৪৪, বগভী: প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৫৮৯।

২৪. আলাউদ্দীন (মৃত:৯৭৫ হি), কাঞ্জুল উম্মাল, (বৈরুত মুয়াসাসাতুর রেসালা, ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.), খ.-৮, পৃ.২৭৫, হাদিস নং: ২২৮৯৩।

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ: الِاسْتِعَاذَةُ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

"সুফয়ান ছওরী তিনি মনসুর থেকে তিনি ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম পাঁচটি বিষয় নিরবে পড়বেন, আউযুবিল্লাহ, সানা, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ।"[২৫]

মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাকে এসেছে,

عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ آمِينَ».

"মা'মর ও সওরী থেকে বর্ণিত, তারা মনসুর থেকে তারা ইবরাহিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'আমীন' আস্তে পড়তেন।"[২৬]

এর সনদ সহিহ। তিনি যদিও তাবেয়ী তবে তার কথা হানাফিদের নিকট দলীল। অর্থাৎ, যে সকল তাবেয়ীর ফতওয়া সাহাবীদের যুগে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তার বিপরীতে কোনো মরফু হাদিস পাওয়া না যায় তাদের কথা দলিল হতে পারে। ইবরাহীম নখয়ী ৫০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৯৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার জন্মও সাহাবাদের যুগে এবং মৃত্যুও সাহাবাদের যুগে। তাই তার কথা হুজ্জত হবে।

১০. ইমাম তাহাবী হযরত আবু ওয়ায়েল সূত্রে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّأْمِينِ"

"আবু ওয়ায়েল বলেন, হযরত ওমর ও আলী (রা) বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও আমীন বড় করে পড়তেন না।"[২৭]

তার সনদ দুর্বল। কেননা, সেখানে সাদ বক্কাল রয়েছে সে তাদলিস করে।

১১. যেহেতু অমীন সকলের নিকট সূরায়ে ফাতেহার অংশ নয়, তাই আমীন আস্তে পড়া উত্তম হবে; যাতে কেউ সূরায়ে ফাতেহার অংশ মনে না করে। যেমন, বিসমিল্লাহ আমরা আস্তে পড়ি সূরায়ে ফাতেহার অংশ না হওয়ার কারণে।

❖ শাফেয়ী, হাম্বালী, আওজায়ী, ইসহাক ও আহলে হাদিসের মাযহাব এর দলিলসমূহ ও জবাবঃ

১. ইমাম তিরমিযী হযরত সুফিয়ান সুত্রে হযরত ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন,

---

২৫. আবু বকর ইবনে আবী শায়বা, **মুসান্নাফু ইবনে আবী শায়বা**, ৭ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (রিয়াদঃ মাকতাবতুর রশীদ, ১৯০৪খ্রি.), হাদিস নং: ৮৮৪৯; আবু বকর, আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ২৫৯৭।

২৬. আবু বকর আব্দুর রযযাক, প্রাগুক্ত, হাদিস নং:২৬৩৫।

২৭. আবু জাফর তাহাবী, শরহে মা'আনিউল আছার, ১ম সংস্করণ, (বৈরুতঃ দারুশ শুআব, ১৯৯৪ খ্রি.), হাদিস নং: ১২০৮।

عن سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

"সুফয়ান তিনি ওয়ায়েল ইবনে হুজর সুত্রে বর্ণনা করেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি তিনি যখন {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، পড়তেন তখন 'আমীন' বলতেন এবং তা তিনি আওয়াজ টেনে পড়তেন।"[২৮]

ইমাম আবু জুরআ ও ইমাম বুখারী এই হাদিসকে অধিক বিশুদ্ধ বলেছেন, ইমাম তিরমিযী এই হাদিসকে হাসান বলেছেন।

হাফেয তালখিছে বলেছেন,

وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة.

সুফিয়ানের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে; কেননা তার সমর্থনে আরো দু'জন ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৯]

ফিরয়াবী বলেন,

وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْحَدِيث : رَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ وَطَوَّلَ بِهَا. وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

"বড় করে বলাটাই বিশুদ্ধ কেননা সুফিয়ানের মত 'আলা ইবনে সালেহ ও মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে কুহাইল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।"[৩০]

এর জবাব:

"আলা" বিশ্বস্ত ছিল না। আল্লামা যাহাবী মিযানে তাকে আবু হাতেমের বরাদ দিয়ে শিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। ইবনে মাদনী বলেন, তিনি অনেক সময় মুনকার হাদিস বর্ণনা করেন।

যাহাবী বলেন,

قال أبو حاتم: كوفي صالح الحديث من عتق الشيعة.

"আবু হাতেম বলেন, তিনি কূফী হাদিস বর্ণনা করে শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত।"[৩১]

---

২৮. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২৪৮; ইবনে আবী শায়বা, প্রাগুক্ত, ৩০৭৮; আহমদ ইবনে হাম্বাল, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ১৯০৪৭; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ৯৩২; নাসাঈ, প্রাগুক্ত, ৮৭৮; দ্বারে কুতুনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৪।

২৯. ইবনে হাজর আসকালানী, আবুল ফযল আহমদ (মৃতঃ ৮৫২ হি.), **তালখিছ**, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা: ১৯৮৯ খ্রি./১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৮৩।

৩০. বায়হাকী, আবু বকর, **সুনানু কুবরা**, (হায়দারাবাদঃ মাজলিসু দাউরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৪হি.), হাদিস নং: ২৫৪৬।

৩১. যাহাবী, মীজান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২২।

তবে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে কুহাইল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

محمد بن سلمة بن كهيل ضعفه ابن سعد في "الطبقات" ৩৮০/৬، والجوزجاني، ونقل الحافظ في "اللسان" عن ابن معين أنه ضعيف،

ইবনে সা'দ তাবাকাতে ও জওযানী দুর্বল বলেছেন এবং হাফেয লিসানে ইবনে মঈন থেকে বর্ণনা করেন তিনি দুর্বল। তাই তাদের বর্ণনা দিয়ে সুফয়ানের হাদিসকে প্রধান্য বলা যাবে না।

যাহাবী বলেন,

قال الجوزجاني: ذاهب واهي الحديث.

"তার মেধা কম, হাদিস ভুলে যায়।"[৩২]

এ হাদিসের জবাব:

১. হাদিসটি মুজতারিব। কেননা; এক হাদিস তার থেকে 'আমীন' তিনবারের কথা এসেছে।

আর তাবরানীতে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ : آمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

"ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল ﷺ দেখেছি তিনি নামাযে প্রবেশ করেছেন যখন তিনি সূরায়ে ফাতেহা থেকে ফারেগ হলেন তখন তিনি 'আমীন' তিনবার বলেছেন।[৩৩] আল্লামা হাইসামী মাজমাউজ জওয়ায়েদে এর সনদ বিশ্বস্ত বলেছেন। হানাফিরা তাই তিনবার বলা জায়েজ মনে করেন।

আবার আরেক বর্ণনায় এসেছে, رب اغفرلى آمين

যেমন তাবরানী ও বায়হাকীতে এসেছে,

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِيْ، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْيَحْصِبِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ} [الفاتحة: ٩] قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ آمِيْنَ»

৩২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ.-৩, পৃ. ৫৬৮।
৩৩. তাবরানী, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ২২।

"ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসূল ﷺ সূরায়ে ফাতেহা শেষে 'রাব্বি ইগফিরলি আমীন' বলতেন।"[৩৪]

এবং ওয়ায়েল থেকে সুফিয়ান এক ধরনের বর্ণনা করেছেন, আবার শু'বা ভিন্ন ধরনের। কোনোটা প্রাধান্য নয়; যেমন ইমাম বুখারী ও আবু জুর'আ মনে করেছেন। দু'টিই মানে সমান।

এ থেকে বোঝা যায় ওয়ায়েলের হাদিস যার উপর ভিত্তি করে বড় করে পড়ার উপর ফতওয়া দেওয়া হয় সে হাদিসটি মুজতারিব। এ কারণেই তো এ হাদিসকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাদের সহীহাইনে আনেননি। অথচ তাদের মাযহাব তাই ছিল।

২. একজন দু'জন শুনলে তাকে বড় করে পড়া বলা হয় না বরং তখনও তা আস্তে পড়ার সীমারেখাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেমন হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.

"হযরত আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ জোহর আসরের প্রথম দু'রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও ক্বেরাত পড়তেন মাঝে মধ্যে আমাদেরকে এক আয়াত শুনে দিতেন এবং তিনি প্রথম রাকা'আত লম্বা করতেন।"[৩৫]

এবং ফতওয়ায়ে শামীতে এসেছে,

أَدْنَى (الْمُخَافَتَةِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ) وَمَنْ بِقُرْبِهِ؛ فَلَوْ سَمِعَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ فَلَيْسَ بِجَهْرٍ، وَالْجَهْرُ أَنْ يَسْمَعَ الْكُلُّ خُلَاصَةٌ.

"নিচু স্বরে পড়ার শেষ স্তর হলো, নিজকে শুনিয়ে দেওয়া ও নিকটবর্তীকে শুনিয়ে দেওয়া তাই এখানে এক ব্যক্তি বা দু'জন শুনলে তাকে বড় করে পড়া বলা যাবে না।"[৩৬] তাই তিনি বলেন, ইমাম সাহেব যদি আস্তে নামাযে এক দুইজন শুনে মত পড়ে তখন তাকে বড় করে পড়া যাবে না, ঠিক তেমনি আমীনের ব্যাপারে। দুই একজন শুনে মতে পড়লে বড় করে পড়া বোঝা যাবে না এবং তার দিকে হাদিসেও ইঙ্গিত রয়েছে কিছু হাদিসে এসেছে 'আমীন' শুনেছি তখন আমি পেছনে ছিলাম এবং ওয়ায়েলের কিছু বর্ণনায় যে বড় করে পড়া শব্দ উল্লেখ রয়েছে

---

৩৪. তাবরানী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৭৭৮।

৩৫. বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৮৭৮।

৩৬. ইবনে আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন, রদ্দুল মুখতার, ২য় সংস্করণ, ৬ খণ্ড, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১২ হি. ১৯৯২ খ্রি.), খ.-১, পৃ. ৫৩৪।

তার জবাব হলো তা رواية بالمعنى তথা অর্থ যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। যা ভুল ছিল।

৩. তাই তা বিশুদ্ধ মানলেও ব্যাখার দাবী রাখে, আর ব্যাখ্যা হলো তা দ্বারা আলিফের আওয়াজকে টানা উদ্দেশ্য বড় করে পড়া নয় বা তা তা'লিমের জন্য করেছেন।

৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) বলেন, বড় করে 'আমীন' বলা রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। তবে তা তিনি মাঝে মধ্যে তা'লীমের জন্য করেছেন, সুন্নাত হিসাবে করেননি যেরকম হযরত ওমর (রা) ছানা মাঝে মধ্যে বড় করে পড়তেন এবং আবু হুরাইরা (রা) আউযুবিল্লাহ মাঝে মধ্যে বড় করে পড়তেন। আল্লামা জুরজানি কাশশাফের হাশিয়ায় ও মুহাম্মদ বিরকলী তার তাফসীরে তা উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ সলফের আমল নিরবে পড়ার উপর ইবনে জরীর তাবারী 'জাওহারে নকী' কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

এবং এর স্বপক্ষে এসেছে :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَكَنٍ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقَالَ: «آمِينَ» يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا.

"আবু সাকান ওয়ায়েল ইবনে হুজরকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল ﷺ কে উভয় পাশ দিয়ে দেখেছি। যখন তিনি সূরায়ে ফাতেহা শেষ করতেন আওয়াজ বড় করে আমীন বলতেন। আমি মনে করি তা আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলেছেন।"[৩৮]

জাদুল মা'আদে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

دُعَاءُ الْقُنُوتِ دُعَاءٌ وَثَنَاءٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِهَذَا الْمَحَلِّ، وَإِذَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْيَانًا لِيُعَلِّمَ الْمَأْمُومِينَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَدْ جَهَرَ عمر بِالِاسْتِفْتَاحِ لِيُعَلِّمَ الْمَأْمُومِينَ، وَجَهَرَ ابْنُ عباس بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَمِنْ هَذَا أَيْضًا جَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ.

৩৭. আনোয়ার শাহ কাশ্মরী, ফয়যুল বারী, (হিন্দঃ মাকতাবাতু মিশকাতিল ইসলামিয়া, ১৩৫২ হি.), খ.-৩, পৃ. ৬২।

৩৮. আবূ বিশর দাওলানী, আল-কুনা ওয়াল-আসমাহ, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (বৈরুতঃ দারে ইবনে হাযম, ২০০০ খ্রি.), হাদিস নংঃ ১০৯০।

"দু'আয়ে কুনুত হলো দু'আ ও প্রশংসা। ইমাম সাহেব যদি মুক্তাদিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে বড় করে পড়েন তাতে অসুবিধে নেই। হযরত ওমর (রা) কখনো মুক্তাদিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছানা বড় করে পড়তেন জানাজার নামাযে ইবনে আব্বাস সূরায়ে ফাতেহা বড় করে পড়তেন তা সুন্নাত বুঝানোর জন্য, 'আমীন' বড় করে পড়াও এতেই শামিল।[৩৯]

৪. সুফয়ানের হাদিস দ্বারা ইমাম বড় করে পড়া প্রমাণিত হয়; তাই বলে কি মোক্তাদিদেরকেও বড় করে পড়তে হবে? ইমাম তাকবির বড় করে বলেন, আমরা কি রুকু সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবির বড় করে পড়ি। মুক্তাদি নামাযে যা পড়েন সব তো আস্তে পড়েন তাই 'আমীন'ও আস্তে পড়া সুন্নাত যাতে পার্শবর্তী নামাযীরা বিব্রত বোধ না করে।

৫. এটাও বলা যেতে পারে সুফিয়ান ও শু'বা দুজনের হাদিসই সঠিক এবং দুই ঘটনা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হযরত ওয়ায়েল রাসূল ﷺ কে এক সময় বড় করে পড়তে দেখেছেন যা তিনি শিক্ষার জন্য করেছেন এবং পরে তাকে আস্তে করে পড়তে দেখেছেন।

তাই সুফয়ান ছওরির ফতওয়া হলো, আস্তে পড়াঃ

যেমন ইবনে মুনযির বর্ণনা করেন,

وقال سفيان الثوري: فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل: آمين تخفيها

"সুফয়ান ছওরী বলেন, যখন তুমি সূরায়ে ফাতেহা পড়া থেকে ফারেগ হবে তখন 'আমীন' আস্তে পড়বে।"[৪০]

২. দ্বারে কুতনী হাকেম হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ « آمِينَ ». هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন সূরায়ে ফাতেহা থেকে ফারেগ হতেন বড় আওয়াজে 'আমীন' বলতেন। এর সনদ হাসান। হাকেম বলেন, হাদিসটি বুখারী-মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহিহ। আল্লামা নীমুবী বলেন, সেখানে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা জুবাইদী ইবনে যাবরীক রয়েছে তার কোনো হাদিস সিহাহ সিত্তাতে নেই। তাকে নাসাঈ ও আবু দাউদ দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আওফ তাঈ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। তাই এ সনদকে বিশ্বস্ত বলা যাবে না।"[৪১]

---

৩৯. ইবনুল কায়্যুম, মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর, জাদুল মাআদ, (কুয়েতঃ মাকতাবাতুল মানারুল ইসলামিয়া, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি.), খ.-১, পৃ. ২৬৬।

৪০. ইবনে মুনযির, আল-আওসাত (তা. বি), খ.-৪, পৃ. ২৮৮।

৪১ নীমুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

হাকেম যদিও এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন; তবে তা সঠিক নয়, ইমাম দ্বারে কুতনী তার কিতাব 'ইলালে' তা স্বীকার করেছেন, তিনি বলেন,

وَاخْتُلِفَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ؛ فَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ. وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَحْدَهُ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ، فَأَمِّنُوا.

"জুবাইদী থেকে এ হাদিস বর্ণনায় মতানৈক্য রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে সালেম বর্ণনা করেন, তিনি যখন সূরায়ে ফাতেহা থেকে ফারেগ হতেন তখন বড় আওয়াযে 'আমীন' বলতেন। অন্যরা বর্ণনা করেন, যখন ইমাম সাহেব আমীন বলবে, তখন তোমরা 'আমীন' বল।[৪২]

তাই হাকেমের ধারণা বাতিল।

আল্লামা ইবনে তুরকুমানী বলেন,

ذكر عن الدارقطني (انه حسن اسناده) * قلت * فيه يحيى بن عثمان * قال ابن ابى حاتم تكلموا فيه وفي الكاشف للذهبي له ما ينكر فيه وشيخه اسحاق الزبيدى قال أبو داود ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة وكذبه محمدابن عوف الطائى محدث حمص.

"দ্বারে কুতনী তাকে সহিহ বলেছেন তা সঠিক নয়; কেননা সেখানে ইয়াহইয়া ইবনে ওছমান রয়েছে ইবনে আবি হাতেম বলেন, সে সমালোচিত যাহাবীর কাশেফ গ্রন্থে এসেছে তার মুনকার হাদিস রয়েছে। তার শায়খ ইসহাক জুবাইদি। আবূ দাঊদ বলেন সে বিশ্বস্ত নয়। নাসাঈ বলেন, সে বিশ্বস্ত নয় তাকে হিমসের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে আউফ তাঈ মিথ্যুক বলেছেন।[৪৩]

৩. ইবনে মাজাহতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ:" {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قَالَ: «آمِينَ» حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ.

---

৪২. দ্বারে কুতুনী, আবুল হাসান আলী, (মৃতঃ ৩৮৫ হি.), **আল ইলাল**, (রিয়াদঃ দ্বারে তায়্যিবা, ১৪০৫হি./ ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৮৫।

৪৩. ইবনে তুরকুমানী, আলাউদ্দীন (মৃতঃ ৭৫০ হি.), **আল জওহরুন নকী আলা সুনানিল বায়হাকী**, (বৈরুত দারুল ফিকর তা. বি), খ.-২, পৃ. ৫৮।

"তিনি বলেন, মানুষেরা 'আমীন' বলা ছেড়ে দিয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} পড়তেন, তখন 'আমীন' বলতেন এমনকি তা প্রথম সফের লোকেরা শুনতেন এবং মসজিদে কম্পন সৃষ্টি হত।"[৪৪]

আর এ হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মুগলতাই ইবনে মাজার শরাহতে লিখেন, এই হাদিসটি দু'কারণে দুর্বল:সেখানে বিশর ইবনে রাফে আবুল আসবাত হারেছী রয়েছে। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমদ সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন।[৪৫] সেখানে আরেকজন রাবী আবু আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রয়েছে সে *মজহুল।* আবুল হাসান ইবনে কাত্তান তার কারণে এ হাদিসকে রদ করেছেন।[৪৬]

এবং এ হাদিসটি আবু দাউদ ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, সেখানে মসজিদ কম্পনের কথা নেই। সাথে সাথে সেখানে অর্থের দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে; কেননা মসজিদ কম্পন হবে আবার শুধুমাত্র প্রথম কাতার শুনবে তা কিভাবে হতে পারে।

আলবানীও এ হাদিসকে দুর্বল বলেছেন। মুসনাদে আবী ইয়ালাও এ হাদিসকে দুর্বল বলেছেন।

৪. বুখারী শরিফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যখন ইমাম 'আমীন' বলে তখন তোমরা আমীন বলবে; কেননা যার 'আমীন' ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৪৭]

ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. অর্থ এ হাদিসটি হাসান সহিহ।[৪৮]

এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় ইমাম সাহেব আমীন বড় করে পড়বে।

---

৪৪. ইবনে মাজাহ, সুনানু ইবনে মাজাহ, ২ খণ্ড, মুহাক্কিক ফুয়াদ আবদুল বাকী, (ফায়সাল: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরবিয়্যা, তা. বি), হাদিস নং: ৮৫৩, ইবনে হুজাইমা, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৫৭১।

৪৫. ওমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫১।

৪৬. মুগলতাই, শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, ৫ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (সৌদি আরব: মাকতাবায়ে নাজ্জার, ১৯৯৯খ্রি.), খ.-১, পৃ. ১৪৪৫)।

৪৭. বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৭৮০। মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৪১০। মালেক ইবনে আনাস, মুয়াত্তা, ১ম সংস্করণ, মুহাক্কিক: মুহাম্মদ মুস্তাফা আযমী, (আবুধাবী: মুয়াসসাসাতু যায়েদ, ১৪২৫ হি./ ২০০৪ খ্রি.), খ.-২, পৃ. ১১৯।

৪৮. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৪।

জবাব: আল্লামা নিমুবী আছারুস সুনানে এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, এখানে বলা হয়েছে, যখন ইমাম 'আমীন' বলবে, তখন 'আমীন' বল এবং তার থেকে বুখারী শরীফে এসেছে যখন ইমাম 'দাল্লিন' বলবে, তখন আমীন' বল। তাই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। তাই উভয় হাদিসের সমাধান দেওয়ার জন্য বলতে হবে এখানে ইমামের 'আমীন' বলা রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে তথা যখন ইমাম সাহেব 'আমীন' বলার ইচ্ছা করে বা তা বলার সময় আসে তথা দাল্লিন শেষ হয়। যেমন কুরআনে এসেছে, اذا قمتم إلى الصلوة اى اذا اردتم إلى الصلوة অর্থ: যখন নামাযে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে তখন অযু কর।[৪৯] যাতে উভয় বর্ণনায় আর কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে এবং এটাই নেওয়া ভাল হবে যাতে ইমাম মুক্তাদির 'আমীন' একসঙ্গে হয়। কেননা, ইমাম মুক্তাদী ও ফেরেশতাদের 'আমীন' একসঙ্গে হওয়াই উত্তম। তখন এ হাদিস দ্বারা বড় করে পড়া বুঝা যাবে না।

৫. ইবনে মাজাহতে হযরত আলী (রহ.) থেকে বর্ণিত:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «وَلَا الضَّالِّينَ» قَالَ «آمِينَ».

"হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি 'দাল্লিন' বলেছেন তখন 'আমিন' বলেছেন।"[৫০]

এখানে শ্রবণ বড় করে বলার উপর বুঝায় না; কেননা তা কাছে থাকলে আস্তে পড়লেও শ্রবণ করা যায়। অন্য বর্ণনায় তার থেকে যে বড় করে পড়ার কথা রয়েছে তা আসলে রাবী অর্থগত বর্ণনা দিয়েছেন তার বুঝা মতে। তাই তো হযরত আলী (রা)-এর মাযহাব আস্তে পড়া যেমন আবী ওয়ায়েলের বর্ণনায় গেছে।

৬. দ্বারে কুতনীতে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে এসেছে,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الدَّقَّاقُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ثنا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو مَنْصُورٍ ثنا بَحْرٌ السِّقَاءُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ إِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: «آمِينَ» وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

"ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ যখন দাল্লিন বলতেন, তখন বড় আওয়াজে আমীন বলতেন।"[৫১]

এটা দিয়েও দলিল দেওয়া যাবে না; কেননা হযরত ওমরের আমল আস্তে পড়া যেমন পূর্বে তা গেছে। তাই তা থেকে মাঝে মধ্যে তা'লিমের জন্য করেছেন বলা হবে।

---

৪৯. নিমুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৫০. ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ৮৫৪।

৫১. দ্বারে কুতুনী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ১২৭২।

৭. বুখারী শরিফে তালিক সূত্রে আতা থেকে এসেছে,

قَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ لاَ تَفُتْنِي بِآمِينَ.

"'আতা বলেন, আমীন দু'আ। ইবনে জুবাইর ও তার পেছনের লোকেরা 'আমীন' বলেছেন। এমনকি মসজিদে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে এবং আবূ হুরাইরা (রা) ইমামকে ডাক দিতেন আপনি যেন 'আমীন' দিয়ে আমার আগে না বাড়েন।"[৫২]

হযরত আতা আরো বলেন,

وَأَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّيْدَلاَنِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي هَذَا الْمَسْجِدِ إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) سَمِعْتُ لَهُمْ رَجَّةً بِآمِينَ.

"হযরত 'আতা বলেন, আমি এই মসজিদে দুইশ মত সাহাবাদেরকে পেয়েছি যারা ইমামের সূরায়ে ফাতেহা শেষ হলে বড় আওয়াযে 'আমীন' বলতেন।"[৫৩]

এখানে কিছু সাহাবাদের আমলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ সাহাবাদের আমল ছিল আস্তে পড়া; তাই এটি দিয়ে দলিল দেওয়া যাবে না।

৮. ইমাম বায়হাকী উম্মে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا صَلَّتْ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: «آمِينَ» وَهِيَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ

"সে রাসূল ﷺ এর পেছনে নামায পড়েছেন, তখন সে তাকে 'আমীন' বলতে শুনেছি অথচ সে মহিলাদের কাতারে ছিল।"[৫৪] এ হাদিসে ইসমাইল ইবনে মুসলিম মক্কী রয়েছে সে দুর্বল।[৫৫]

সারকথা :

---

৫২. বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৮।
৫৩. বায়হাকী, হাদিস নং: ২৫৫৬, খ. ২, পৃ. ৫৯।
৫৪. বায়হাকী, আবু বকর, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার, ১৫তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (কায়রো: দারুল ওফা, ১৯৯১ খ্রি.), হাদিস নং: ৩১৭৮।
৫৫. যাহাবী, মিজান, প্রাগুক্ত, খ.-১, পৃ.১১৫।

روایة তথা বর্ণনার দিকে দুই মাযহাবই সমান; বরং হানাফী মাযহাবটি প্রাধান্য; কেননা, শুবা 'তাদলিস' করেন না; সুফয়ান তাদলিস করেন। আর درایة তথা অর্থের দিক দিয়ে হানাফীদের দলিল মযবুত; কেননা তা কুরআনের আয়াতের সাথে দু'আর মূলনীতিতে সামঞ্জস্য রাখে এবং হাদিসে এসেছে, জামে মা'মরে এসেছে,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «دَعْوَةٌ فِي السِّرِّ تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً فِي الْعَلَانِيَةِ»

"হাসান থেকে বর্ণিত, গোপনের দু'আ করা প্রকাশ্যে সত্তর বার দুআ করার সমান।"[৫৬]

ইবনে হিব্বানে এসেছে, এবং আমীন আউযুবিল্লাহ থেকে উত্তম নয়; কেননা অউযুবিল্লাহ পড়ার জন্য তো কুরআনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আমীন পড়ার জন্য কুরআনে নির্দেশ নেই; বরং প্রসিদ্ধ মত মতে তা আরবী শব্দও নয় তাই যখন আউযুবিল্লাহ আস্তে পড়ি 'আমীন' কেন আস্তে পড়ব না। মুক্তাদি তো কোন কিছু বড় করে পড়ে না; তাই এটাও আস্তে পড়বে এবং আস্তে পড়াটা যুক্তি ভিত্তিক এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেয়ীনদের আমল তাই ছিল।

যেমন জওহরে নকী কিতাবে এসেছে,

والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت بها إذا كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك

'সঠিক কথা হলো বড় করে পড়া ও আস্তে পড়া উভয়টা বিশুদ্ধ প্রত্যেক দলের আলিমগণ আমল করেছেন। যদিও আস্তে পড়া উত্তম; কেননা অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈন তাতেই ছিলেন।"[৫৭]

আল্লামা আনোয়ারশাহ কাশ্মীরী আরও বলেন, এমন কোন হাদিস পাওয়া যাবে না যেখানে রাসূল ﷺ আমীন বড় করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন; বরং যারা পড়েছেন প্রত্যেকে তারা নিজের রায় দ্বারা পড়েছেন। আর সুফয়ানের হাদিস বলেন বা শুবার হাদিস বলেন কোনটি রাসূলের নিয়মিত 'আমীন' বলা বুঝায় না; বরং তারা কোন এক সময় দেখেছেন বা শুনেছেন তা বর্ণনা করেছেন। কেননা ওয়ায়েল ইয়ামনী ছিলেন। তিনি সেখান থেকে মাত্র কয়েকবার মদীনায় এসেছেন। তাই আমরা উভয় প্রকার হাদিস দ্বারা উভয় প্রকার ভাবে পড়া জায়েজ মনে করি। কিন্তু লাগাতার এভাবে পড়া হাদিস দ্বারা বুঝা যায় না। তাই আমরা তা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে বলি আস্তে ও বড় করে পড়া উভয়টি জায়েজ তবে যেহেতু আমীন দু'আ এবং দু'আর মূল ও আসল হলো নীরবে করা; তাই নীরবে পড়া উত্তম ও সুন্নাত হবে।[৫৮]

---

৫৬. মা'মর, (মৃতঃ ১৫৩ হি.), জামে, (বৈরুতঃ আল মজলিসুল ইলমী, তা. বি), হাদিস নং: ১৯৬৪৫; আসবাহানী, আবু নুআইম, **হিলইয়াতুল আউলিয়া** (বৈরুত দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৯৭ খ্রি), খ. ২, পৃ.২৬১।

৫৭. ইবনে তুরকুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮।

৫৮. আনোয়ার শাহ কাশ্মরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৭।

মোটকথা : আমীন পড়ার ব্যাপারে যে সকল হাদিস বিশুদ্ধ তা আস্তে বা বড় করে পড়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়, আর যে সকল হাদিস আস্তে বা বড় করে পড়ার ব্যাপারে স্পষ্ট তা দুর্বল। সুফিয়ান ও শু'বার হাদিস দু'টি সমান বিশুদ্ধ ও মুজতারিব। এই দু' হাদিস দ্বারা কোনো একটিকে সুন্নাত প্রমাণ করা যাবে না, জায়েজ প্রমাণ করা যাবে। তবে অধিকাংশ সাহাবাদের আমল ও দু'আর সুন্নাত আস্তে পড়া হিসাবে তাও অন্যান্য যিকর ও দু'আর মত আস্তে পড়া সুন্নাত হবে। তাই এ সাধারণ বিষয় নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করা অনুত্তম হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৫৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

ধর্ম ও পুনরুত্থান ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মাদ ঈসা কাদেরী*

ভূমিকা

জন্মের পর প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।[১] মৃত্যু থেকে কোনোভাবেই কারো রক্ষা নেই।[২] কাজেই এ জন্মে তার মৃত্যু নিশ্চিত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে মৃত্যু মানেই কি জীবনের শেষ? নাকি মৃত্যুর পরও মানুষ পুনরুত্থিত হবে? পুনরুত্থান কেমন হবে? দৈহিক নাকি আত্মিক? মানুষ কি পুনরায় দেহ ধারণ করে শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হবে? নাকি মানুষের আত্মা শেষ বিচারের দিন পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে, এ নিয়েই রয়েছে বিতর্ক। আর এ বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনে। কুরআনে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর পাশাপাশি ইহলৌকিক জীবন, পরকালীন জীবন এবং পরলৌকিক জীবনে দৈহিক পুনরুত্থান নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা প্রতিভাত হয় যে, মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ধর্ম বিশ্বাস। ফলে পৃথিবীতে আর্বিভাব ঘটেছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্ট, জরথুস্ত্র, ইহুদি ও ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মের। এমন অনেক ধর্ম ও নিয়মনীতি রয়েছে যেগুলো আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ নয়। আবার কোনো কোনো ধর্ম আল্লাহ্ প্রদত্ত হলেও মানুষ তার বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের মনের মতো করে তৈরী করে নিয়েছে। ফলে কোনো একটি মতবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দৈহিক পুনরুত্থানের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি। কোনো কোনো ধর্মের দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে পুনজন্মের কথা প্রচার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ধর্মে পুনর্জন্মবাদকে বাতিল করে দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে বিভিন্ন ধর্মের বক্তব্যের আলোকেই ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি তথা আল-কুরআনের তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

এ ধর্ম শুরুতে একশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলো। কেনোনা হিন্দুরা 'একমেবাদ্বিতীয়াম'[৩] এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাস্তি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার একক অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো। তাছাড়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা তথা বহু দেবদেবীর পূজা ছিলো না।[৪] পরবর্তীতে হিন্দুরা মূর্তিপূজা তথা বহুদেবদেবীবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এ ধর্ম বহু

---

* প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা, রাবেতা মডেল কলেজ, মাইনিমুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

১ আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৮৫, ২৯ ঃ ৫৭।

২ আল-কুরআন, ৩৯ ঃ ৩০, ৫০ ঃ ১৯, ৬২ ঃ ৮, ইত্যাদি।

৩ কে, আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ৭।

৪ সুশান্ত ভট্টাচার্য, বেদ-পুরানে আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মাদ (সা), নও-মুসলিম কল্যাণ সংস্থা, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৫৮।

দেবদেবীবাদে বিশ্বাসী হলেও পরলৌকিক জীবনে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিল।[৫] এ ধর্ম মনে করে মৃত্যু মানেই দেহের মৃত্যু, আত্মা অমর। আত্মা অমর থেকে মৃত্যুর পর পূর্বজীবনের কর্ম অনুযায়ী নতুন দেহ গ্রহণ করে পূর্ব জীবনের কর্মফল ভোগ করে অথবা ব্রহ্মে গিয়ে মিলিত হয়। গীতায় বলা হয়েছে, মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিহার করে নতুন শরীর গ্রহণ করে আত্মাও তেমনি নতুন শরীর গ্রহণ করে।[৬]

একটি জোঁক যেমন তৃণের শীর্ষে গিয়ে অন্য তৃণকে আশ্রয় করে দেয় এবং নিজেকে তার উপর তুলে দেয়, আত্মাও তেমনি মৃত্যুর পর পিতৃ-পুরুষ, দেব-দেবী বা অন্য কোনো জীবনের উপযোগী দেহ গ্রহণ করে।[৭] এখানে প্লেটোর পুনর্জন্মবাদের সাথে হিন্দু পুনর্জন্মবাদের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্লেটোর মতে, আত্মা তার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী দেহ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম মতে, আত্মা ইচ্ছা করলেই যে কোনো দেহ গ্রহণ করতে পারে না। তাকে তার কর্ম অনুযায়ী দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। কাজেই দেখা যায় হিন্দু ধর্মের দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র পুনর্জন্মবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

পৃথিবীর অন্যতম একটি ধর্ম হলো বৌদ্ধ ধর্ম। এর প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। এ ধর্মের মূল গ্রন্থ হলো ত্রিপিটক।[৮] এ ধর্মমত অনুযায়ী মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমাগত যন্ত্রণাদায়ক জন্মান্তরের ধারা হতে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ। আর তা সম্ভব অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও অহিংসা পরিত্যাগকরণ।

এ ধর্ম মনে করে নির্বাণ লাভের উপায় হচ্ছে চারটি, যথা :

ক) দুঃখ ও জীবনের নিবিড় অবিচ্ছেদ্যতার উপলব্ধি;

খ) অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিহিংসামূলক অনুভূতি বর্জন;

গ) অজ্ঞতা, সন্দেহ, নির্দয়তা ও বিরক্তি পরিত্যাগ;

ঘ) সর্বজনীন পরিত্যাগ ও সর্বজনীন করুণা প্রদর্শন।[৯]

এ ধর্মকে বলা হয় নিরীশ্বরবাদী।[১০] এ ধর্ম সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও দেব-দেবীদের সম্পূর্ণ বিরোধী। বৌদ্ধ নিজেই মনে করেন যে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও দেবদেবীদের পূজা অর্চনার মাধ্যমে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মুক্তিনিহিত নৈতিকতার উন্নতি সাধনের মধ্যে।[১১] এ ধর্মও হিন্দু ধর্মের মত কর্মবাদ ও জন্মান্তর্বাদে বিশ্বাসী। এ ধর্ম মনে করে, মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে কিন্তু অতীত জীবন এবং বর্তমান জীবন মরণোত্তর জীবনকে নির্ধারণ করবে। কেনোনা অতীতে ব্যক্তি যে জীবন লাভ করেছিলো বর্তমানে যে জীবন লাভ করছে এবং ভবিষ্যতে সে যে জীবন লাভ করবে এর মধ্যে একটা

---

৫ বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬/২/১৫-১৬।

৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/৩-৪।

৭ ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫/১০/২, কৌশতকী উপনিষদ, ১/২।

৮ নূর নবী, বাংলাদেশ দর্শন, আইডিয়াল লাইব্রেরি-ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর-১৯৮৭, পৃ. ৫২।

৯ Prof. Mahmud Brelvi, Islam Its, Contemporary Faiths, Karachi, 1965. pp. 6-7.

১০ নূর নবী, আল্লাহতত্ত্ব, গ্রীণ বুক হউস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮১, পৃ. ৯০।

১১ সাইয়েদ আবদুল হাই, দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী : ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১০৮-১০৯।

নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। এ ধর্ম অনুসারে কেউ যদি একই জীবনে প্রতিনিয়ত সত্যের অনুসন্ধান করে এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তাহলে সে নিজের চেষ্টায় নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করতে পারে। আর যে নির্বাণ লাভ করতে পারে মৃত্যুর পর তার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মে দৈহিক পুনরুত্থানের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

জৈন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

জৈন ধর্মও হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় কর্ম ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এই ধর্ম মনে করে, মৃত্যুতে শুধুমাত্র দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অমর। মৃত্যুর পরও আত্মা দেহ ধারণ করে।[১২] তবে কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে মরণোত্তর জীবন আত্মা কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে দেহের আকার আকৃতি কিরূপ হবে- সবকিছুই নির্ধারণ হয় পূর্বজীবনের কর্মফল দ্বারা। যে ব্যক্তি বর্তমান জীবনে আত্মপ্রকাশ করে, পরনিন্দা করে, অন্যের গুণ লুকায় মৃত্যুর পরবর্তীতে সে নীচ ঘরে জন্মলাভ করবে। আর সে অসৎ, চরিত্রহীন, ক্রুটিপূর্ণ ও অসুস্থ দেহ নিয়ে জন্ম নেবে আর যারা অতি নিম্ন প্রকৃতির মানুষ তারা পশু, বা কীট-পতঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করবে। কাজেই পূর্ব জীবনের কর্মফল অনুযায়ীই তার পুনর্জন্ম হবে। এ ধর্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে পুনজন্মকেই স্বীকার করে নিয়েছে।

শিখ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত অন্য একটি ধর্ম হলো শিখ ধর্ম। এ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গুরু নানক। অনেকেই শিখ ধর্মকে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় বলে মনে করে থাকেন। তবে বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করলে তার কোনো সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেনোনা এ ধর্মও হিন্দু ধর্মের মতো কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। দেহের স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ধারিত একমাত্র কর্মফল দ্বারা। অতীত জীবনের কর্মফল অনুযায়ী মৃত্যুর পর আত্মা অন্য দেহ ধারণ করবে। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক নিজেই বলেছেন যে, কর্মস্থল অনুযায়ী অতীতে তিনি গাছ-পালা, পশু-পাখি এমনকি সাপ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন।[১৩] এ ধর্ম আরও প্রচার করে যে, কেউ যদি সৎকর্ম সম্পাদন করে, সৎ পথে চলে, অনাসক্ত জীবন যাপন করে তাহলে তার আর পুনর্জন্ম হবে না, সে ঈশ্বরের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। এ ধর্মে মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ ও নরকপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত থাকলেও দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হয়েছে।

ইহুদি ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

ইহুদি ধর্মে দৈহিক পুনরুত্থানকে স্বীকার করা হলেও বক্তব্যের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে হযরত মূসা (আ)-কে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীদের মধ্যে কেউ ইহুদি ছিলেন না। তবে এটা বলা যায় যে, নামের

---

১২ Nihar Ranian Roy (ed.) Sikhism and Indian Society, Indian Institute of Advanced Study, Simla, pp. 219-292

১৩ Ernst Trump (tr.), Adi Grantha, 2nd edition, Munshiram Monoharlal, delhi, 1970. p.2.

ভিত্তিতেই এ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। মূলত হযরত মূসা (আ)-এবং এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবীগণ যে ধর্ম প্রচার করেছেন তা ছিলো পুরোপুরি ইসলাম। আর এ কারণে আল্লাহ্পাক পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে অন্যান্য নবী বা রাসূল এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। কুরআনে বলা হয়েছে, "বলো আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং ঐ শিক্ষার উপর যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ শিক্ষার উপর এবং যা কিছু দেয়া হয়েছিলো মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীদের উপর তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে তার উপরও ঈমান এনেছি"।[১৪] মূলত মুসা (আ)-এর আনীত প্রকৃত তাওরাতের সাথে বর্তমান তাওরাতের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইহুদিরা তাদের মনের মতো করে নিজেদের সুবিধামত কল্পকাহিনী জুড়ে দিয়ে প্রকৃত তাওরাতের বিকৃতি ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. মরিস বুকাইলীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এসব কাহিনী তাঁর পাশাপাশি সাজিয়ে কখনো তাঁদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্যে নানা গল্প কথা টেনে এনেছে।"[১৫] ফলে প্রাচীন ও বর্তমান ইহুদিদের মধ্যে অনেক বিষয়েই মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে তাওরাত হযরত মূসা (আ)-এর আনিত দীন ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[১৬]

প্রাচীন ইহুদিরা মনে করেন, যারা পুণ্যবান শুধু তারাই জীবন ফিরে পাবে আর পাপীরা মৃত্যুর মাধ্যমে চিরতরে বিনাশ হয়ে যাবে আর এটাই তাদের শাস্তি। প্রাচীন ইহুদি ধর্মে জান্নাত ও জাহান্নামের তেমন কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরেই এ ধর্মে জান্নাত ও জাহান্নামের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। এ ধারণা খ্রিস্ট ধর্মের জন্মের অনেক পরে উদ্ভূদ।[১৭] তবে বর্তমান ইহুদি ধর্মে জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা সুস্পষ্ট। তাদের মতে শেষ বিচারের দিনে সবার সশরীরের পুনরুত্থান ঘটবে এবং পাপ-পুণ্যের বিচার করে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। যেহেতু (ঈশ্বর) পরম করুণাময়; তাই তিনি ধীরে ধীরে সবাইকে ক্ষমা করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

খ্রিস্ট ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মই পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৮]

তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একজন প্রেরিত রাসূল এবং তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের কিতাবের সত্যতার নিদর্শনরূপে।[১৯]

প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত প্রকৃত ইঞ্জিলের সাথে বর্তমান ইঞ্জিলের রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বর্তমান ইঞ্জিলে খ্রিস্টানরা তাদের নিজেদের

---

১৪ আল-কুরআন, ২ ঃ ১৩৬-১৩৭।

১৫ মরিস বুকাইলি, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, রূপান্তর ঃ আখতার-উল-আলম, রংপুর পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকাঃ তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৯, পৃ. ৩১।

১৬ সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী, সীরাতে সরওয়াবে আলম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

১৭ Arthur Hertzberg (ed). Judaism, Geroge Braziller New York, 1962, p.207.

১৮ নূর নবী, আল্লাহ্তত্ত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

১৯ আল-কুরআন, ৩ ঃ ৫০।

ইচ্ছেমত সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে তৈরী করে নিয়েছে। এ ধর্ম পারলৌকিক জীবনে দৈহিক পুনরুত্থানের ধারণায় বিশ্বাসী। এ ধর্মমত অনুসারে শেষ বিচারের দিনে মানুষের দৈহিক পুনরুত্থান ঘটবে এবং বিচার হবে।

পাপ-পুণ্যের হিসাবের পর কেউ যাবে জান্নাতে আর কেউ যাবে জাহান্নামে। তবে তারা মনে করেন, চূড়ান্তভাবে জগতের ধ্বংসের পূর্বে যিশুখ্রিস্টের পুনরায় আর্বিভাব ঘটবে এবং সব ইহুদিই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে।

খ্রিস্ট ধর্ম দু'প্রকারের বিচারের ধারণায় বিশ্বাসী। যথা : (ক) একটি হলো বিশেষ বিচার (খ) এবং অন্যটি হলো সার্বিক বিচার। বিশেষ বিচার হলো মৃত্যুর পরে আর সার্বিক বিচার হলো দৈহিক পুনরুত্থানের পর শেষ বিচারের দিনে। পুণ্যবানেরা জান্নাতে সুখ ভোগ করবে আর পাপীরা শাস্তিভোগ করবে। তবে যারা পাপী হওয়া সত্ত্বেও অনুতপ্ত হবে তারা প্রথমে সংশোধনাগারে যাবে, পরে জান্নাতের সুখ ভোগ করবে।

যরথুস্ত্রবাদের দৃষ্টিভঙ্গি

এটি হলো পারস্যের একটি প্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের প্রবর্তক হলো যরথুস্ত্র (আবির্ভাব ৮০০-৬০০ খ্রি. পুঃ মধ্যে)[২০]-এ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হলো আবেস্তা। তবে এই মূল গ্রন্থ এখন আর মূল ভাষায় বিদ্যমান নেই[২১]। এই ধর্মের অনুসারীরা স্রষ্টার অস্তিত্বকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছে, একটি হলো কল্যাণের দেবতা, অন্যটি হলো অকল্যাণের দেবতা। কল্যাণের দেবতাকে বলা হয় আহোরা মাজদা (Ahura Mazda) এবং অকল্যাণের দেবতাকে বলা হয় আহারিমন (Ahriman)।[২২] তারা বিশ্বাস করতো যে, উভয় দেবতার মধ্যে দিবানিশি সংঘর্ষ চলছে এবং এ সংঘর্ষে আহোরা মাজদাই জয়লাভ করছে। তাই তারা আহোরা মাজদার পূজা করতো। এই ধর্ম পারলৌকিক জীবনে দৈহিক পুনরুত্থানের ধারণায় বিশ্বাসী। এ ধর্ম মনে করে যে, মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে, কিন্তু আত্মা অমর। পরকালে দেহধারী আত্মারই পুনরুত্থান ঘটবে। মৃত্যুর পর কী ঘটবে তার সবকিছু নির্ভর করে পার্থিব জীবনে মানুষের কর্মফলের উপর। কর্মফল অনুযায়ী প্রত্যেককেই তার প্রতিদান প্রদান করা হবে। পুণ্যবানেরা পুরষ্কার স্বরূপ জান্নাতের অধিবাসী হবে আর পাপীরা শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম লাভ করবে। জান্নাত বা জাহান্নামে যাবার পূর্বে প্রত্যেককেই একটি পুল পার হতে হবে, যার নাম এর অনুসারীরা দিয়েছে চিনভাত পুল (Chinvat Bridge)। পুণ্যবানেরা এ পুল অনায়াসেই পার হয়ে যাবে, আর পাপীরা এ পুল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়ে নীচে পড়ে সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে। আর যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে তাদের কিছুদিন সংশোধণাগারে রাখা হবে। তারপর আহোরা মাজদা জাহান্নাম থেকে সমস্ত আত্মাদের বের করে পবিত্র করে পুণ্যবানদের সাথে জান্নাতে প্রেরণ করবে; যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে।

---

২০ ড. রশিদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য সোপান, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, নতুন সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪।

২১ সাইয়েদ আবদুল হাই, দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯।

২২ আ. ফ. ম. সাইফুর রহমান ভূইয়া, ইমাম আল-গাযালির তাহফাতুল ফালাসিফা গ্রন্থে আল্লাহ্‌র ধারণা সম্পর্কে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, এম ফিল থিসিস, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর, বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃ. ১৭।

ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো ইসলাম। আর এ ধর্মের প্রবর্তক হলেন মহান আল্লাহ্ তায়ালা। আল্লাহ্পাক যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সেই সময়ের সেই স্থানের প্রেক্ষিতে ইসলামের বিধি-বিধানকে ক্রমান্বয়ে নাযিল করে তা সম্পূর্ণ করেছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে।[২৩] কাজেই এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আল-কুরআনে দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে যে ধারণা পেশ করা হয়েছে তাই ইসলামি ধারণা।

ইসলামি আক্বিদার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসকে ইসলাম ধর্মের মূল বা অত্যাবশ্যকীয় নীতি বলেই অভিহিত করা চলে। ইসলাম ধর্মে পুনরুত্থান বলতে পুনর্জন্ম আত্মিক পুনরুত্থানকে বুঝায় না। পুনরুত্থান বলতে দেহধারী আত্মার পুনরুত্থানকে বুঝায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহের পুনরায় উত্থান। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ তার পূর্বের দেহ নিয়েই উত্থিত হবে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, "যখন পুনরায় সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তখন তারা নিজ নিজ কবর হতে উঠে তাদের প্রতিপালনের দিকে দৌড়াবে।[২৪] আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনরুজ্জীবন করবেন। তারপর তারই দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে'।[২৫] কোনো কোনো ধর্মে পুনরুত্থান বলতে বুঝায় পুনর্জন্মকে। যেমন হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও শিখ ধর্ম। কাজেই এটা দেখা যায় যে, ভারতে উদ্ভূত ধর্মগুলো জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। আর সেমেটিক ধর্ম (ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম) বিশ্বাস করে দৈহিক পুনরুত্থানে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম অনুসারে আত্মার অমর থেকে মৃত্যুর পর পূর্ব জীবনের কর্ম অনুসারে দেহ গ্রহণ করে পূর্ব জীবনের কর্মফল ভোগ করবে। ইসলাম ধর্ম অনুসারে আত্মা অমর। পূর্বের দেহে পুনরুত্থিত হয়ে বিচারের পর সশরীরে জান্নাত বা জাহান্নামে যেয়ে সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে। কাজেই ইসলাম ধর্মে পুনর্জন্মের কোনো ধারণা নেই। ইসলাম ধর্ম অনুসারে পার্থিব কর্মের ফলভোগ করতে হবে। তবে সেজন্য তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় না। পার্থিব কর্মের ফল ভোগ করার জন্য তাকে পুনরুত্থিত হতে হবে। এ পুনরুত্থান সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, পুনরুত্থান হবে সাধারণ এবং সবার জন্যই।[২৬] আর এ পুনরুত্থান মানুষের কর্মের কারণে ঘটে না, যেমন পুণর্জন্ম ঘটে মানুষের কর্মের কারণে। পুনরুত্থান ঘটে আল্লাহ্র ইচ্ছায়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুসারে হাশরের মাঠে বা একত্রিত হওয়ার মাঠে সকল মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ্ বর্তমান নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে পরিবর্তন করে পুনরুত্থিত হওয়ার মাঠে পরিণত করবেন[২৭] "পুনরুত্থানের দিনে সকল মানুষ আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"[২৮]

---

২৩ আল-কুরআন, ২ ঃ ৩৮;৫ ঃ ৩।

২৪ আল-কুরআন, ৩৬ ঃ ৫১।

২৫ আল-কুরআন, ৬ ঃ ৩৬।

২৬ S.M.Hasan, Muslim Creed and Culture, Dhaka; Ideal Pubilications, 1962, p. 114.

২৭ আল কুরআন, ১৪ ঃ ৪৮।

২৮ আল-কুরআন, ২ ঃ ১৫৬।

পার্থিব জীবনে মানুষ যে দেহের অধিকারী ছিলো সে দেহ নিয়েই সে উত্থিত হবে। মৃত্যুর পর তার দেহ ধ্বংস হয়ে যায়। দেহ পঁচে মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ মাটি থেকে আল্লাহ্ মানুষকে উত্থিত করবেন।[২৯]

কাজেই ইসলাম ধর্মে পুরুত্থান বলতে পুনর্জন্মকে বুঝায় না। ইসলাম ধর্মে দৈহিক পুনরুত্থান বলতে মৃত ব্যক্তির পুনরায় স্বদেশ ধারণ করা বুঝায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কর্তৃক শেষ বিচারের দিনে (কিয়ামতের দিন) পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদানের জন্য দেহধারী আত্মার পুনরুত্থানকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, একমাত্র ইসলাম ধর্মেই দৈহিক পুনরুত্থানকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, একমাত্র ইসলাম ধর্মই দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করেছে। ইসলাম ধর্ম আল্লাহ্ কর্তৃক পুনরুত্থান সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছে তা সত্যিই অতুলনীয়। কাজেই এটা যথার্থ যে, একমাত্র ইসলাম ধর্মেই দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত অথচ গ্রহণযোগ্য আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Kadar Nath Tiwari-এর বক্তব্যটি সত্যিই প্রাণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, দৈহিক পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলাম ধর্ম হলো এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[৩০]

গ্রিক প্রভাবিত ফালাসিফা সম্প্রদায়ের মুসলিম দার্শনিকদের যুক্তির অসারতা :

ফালাসিফা সম্প্রদায়ের মুসলিম দার্শনিকেরা পারলৌকিক জীবনের ধারণায় বিশ্বাস করেন। এ জীবনের হিসাব নিকাশের ধারণায় তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন। এ পারলৌকিক জীবনে যে পুনরুত্থান হবে এ সম্পর্কে ফালাসিফা সম্প্রদায়ের মুসলিম দার্শনিক ও অন্য মুসলিম দার্শনিকেরা একমত পোষণ করেন যে, পুনরুত্থান হবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, পুনরুত্থান কেমন হবে? দৈহিক না আত্মিক এ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো[৩১] "এরিস্টটল"[৩২] দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে এক্ষেত্রে ফালাসিফা সম্প্রদায়ে মুসলিম দার্শনিকেরা গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই (বিশেষত আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে-সিনা) পারলৌকিক জীবনে দৈহিক পুনরুত্থানকে স্বীকার করেন না। এমন কি ইবনে রুশদও দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা মনে করেন, পুনরুত্থান হবে ঠিকই কিন্তু তা হবে আত্মিক, দৈহিকভাবে নয়।

দার্শনিকেরা বলেন, একমাত্র আত্মাই অমর, দেহ ধ্বংসশীল। কাজেই দেহের কোনো পুনরুত্থান হবে না। বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শুধুমাত্র মানুষের আত্মাই হাজির হবে, দেহ নয়, এমন কি পুনরুত্থান দিবসে মানুষের আত্মা নতুন করে দেহ ধারণ করে পুনরুত্থিত হবে না। ঐ দিবসে শুধু মানুষের আত্মাই ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি

---

২৯ আল কুরআন, ২০ ঃ ৫৫।

৩০ Kedar nath tiwari, Comparative Religion, Motilal Banarasidass, Delhi, 1992, p.208.

৩১ Plato, Republic, translation in English by B. Jowett, Oxford University Press, 1931. Book x, ch.20. pp.619-620.

৩২ Aristotle, Metaphysics, trans, H.G.Apostle, Bloomington: Indiana University Press, 1966-407b.

ভোগ করবে। ইমাম আল-গাযালি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাহফাতুল ফালাসিফার ২০তম সমস্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দার্শনিকদের মত সবিস্তারে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৩৩] শুধু তাই নয় তিনি দৈহিক পুনরুত্থান স্বীকার না করার জন্য দার্শনিকদের কাফের বলে ঘোষণা করেন।[৩৪] গাযালি বলেন, So he who would brand the innovators among the Muslims with infidelity can do the some in the case of the philosophers.[৩৫] "তিনি দেখান যে, পরকালে দেহধারী আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে অর্থাৎ দৈহিকভাবেই পরিপূর্ণ মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে। ইমাম গাযালির ন্যায় ফখরুদ্দিন রাযি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ মনে করেন যে, পরকালে দেহধারী আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে। পূর্বের দেহে আত্মাকে সংস্থাপিত করেই মৃত ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করা হবে।

তাঁদের মত ইসলামী দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত। ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী একটি বিচার দিবস[৩৬]-(কেয়ামত) অনুষ্ঠিত হবে। সেই বিচার দিবসে সকল মানুষ দৈহিকভাবে পুনরুত্থিত হবে। অর্থাৎ ঐ দিন মানুষ তার পূর্বের দেহ নিয়েই পুনরায় জীবিত হবে।

দৈহিক পুনরুত্থানের আবশ্যকীয়তা

মুসলমানেরা প্রধানত দুই ধরনের জীবনের কথা বিশ্বাস করেন; আর তার একটি হলো ইহলৌকিক জীবন বা পার্থিব জীবন আর অন্যটি হলো পারলৌকিক জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন তা হলো ইহলৌকিক জীবন বা পার্থিব জীবন। মৃত্যুর পর যে জীবন তা হলো পারলৌকিক জীবন বা মরণোত্তর জীবন। তবে পার্থিব জীবন হলো ক্ষণস্থায়ী আর মরণোত্তর জীবন হলো চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন হচ্ছে কর্মক্ষেত্র আর মরণোত্তর জীবন হলো কর্মফল ভোগের ক্ষেত্র। পরলৌকিক জীবনে প্রত্যেককেই তার কর্মফল প্রদানের জন্য দৈহিকভাবে পুনরুত্থান ঘটানো হবে। ইহলৌকিক জীবনের কর্মফল অনুযায়ী প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য প্রদান করা হবে। আর এই প্রাপ্য প্রদানের জন্য পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান হতে হবে।

সাধারণত এটা দেখা যায় যে, একজন মানব শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার মধ্য দিয়েই ইহলৌকিক জীবনের সূচনা করে আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম অনুসারে দেখা যায় যে, মানব জীবন হলো অত্যন্ত দীর্ঘ একটা পথ পরিক্রমা। তাকে বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। শুধুমাত্র ভূমিষ্ঠ হবার মধ্য দিয়েই যে একজন মানুষের অস্তিত্বের সূত্রপাত হয় তা নয় বরং এর অনেক পূর্বেই অস্তিত্বের সূত্রপাত্র হয়।

ভূমিষ্ঠের মধ্য দিয়ে একটা স্তরে উপনীত হয় মাত্র। আল্লাহ্পাক সকল আত্মাকে একই সময়ে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে কোনো মানুষকে প্রেরণের পূর্বে এ সকল আত্মার নিকট থেকে তাঁর প্রভুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আত্মাগুলোকে লক্ষ্য করে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,

৩৩ Al-Ghazali, Tahaful al-Falasifah, translation in English by S. A. Kamali, Pakistan Philosophical Cangress, Lahore, 1963, p. 229-248.

৩৪ Ibid, p. 249

৩৫ Ibid, p. 249

৩৬ আল-কুরআন, ১ ঃ ৩, ২ ঃ ১১৩, ২১২, ৫ ঃ ৩৬, ৬ ঃ ১২, ৭ ঃ ১৭২, ১৬ ঃ ২৭, ১৯ ঃ ৯৫, ২১ ঃ ১, ৩০ঃ১২, ৩৯ ঃ ১৫, ২৬, ৬০, ৬৯ ঃ ১৩-১৫ ইত্যাদি।

Am I Not your Load[৩৭] তারা উত্তর দিয়েছিলেন, "Yes"[৩৮] অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলেছিলো, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রভু। সকল আত্মাই আলমে আরওয়াহ্ বা রূহের জগতে অবস্থান করে। এ সকল আত্মা আল্লাহ্পাক পর্যায়ক্রমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণে প্রেরণ করেন।"[৩৯] পরে ভূমিষ্ঠ হবার মধ্য দিয়ে এ পার্থিব জীবন লাভ করে। এরপর সে তার মৃত্যুতে এ দৈহিক বা পার্থিব জীবনের অবসান ঘটিয়ে নতুন অন্য একটি স্তরে উপনীত হয়। আর এভাবে তার অবস্থান পরিবর্তন হয়।

ইসলাম ধর্ম অনুসারে মানুষের বয়োঃপ্রাপ্তির পর কৃত প্রতিটি সৎকর্মের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। আর অসৎ কর্মের জন্য দেওয়া হবে শাস্তি। মানুষকে তার সারা জীবনের আয়-ব্যয়ের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দিতে হবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মকাণ্ডের। মৃত্যুর পরে কবরে মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে নৈতিক অনৈতিক কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। জান্নাত বা জাহান্নামে সে তার কর্ম অনুযায়ী সুখ বা শাস্তি ভোগ করবে। কর্মফল ভোগ করার জন্য তাকে আর কখনো ইহজগতের বা পার্থিব জীবনের মোকাবেলা করতে হবে না। সুতরাং ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ইহলৌকিক জীবনের কর্মফল ভোগ করার জন্য দৈহিক পুনরুত্থান হবে।

ইসলামি মতে মানুষের ইহলৌকিক জীবন হলো একটা পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই তার জীবন অতিবাহিত করে। আর এই পরীক্ষার ফল পাওয়া যাবে পরলৌকিক জীবনে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) বলেন, "আদ্দুনয়া মাজরা'আতুল আখিরা"[৪০] অর্থাৎ পার্থিব পরজীবনের শস্যক্ষেত্র। মানুষ এখানে যে রকম কাজ করবে, পরকালে সে রকম ফল ভোগ করবে। পার্থিব জীবনে মানুষ আল্লাহ্ পাকের আদেশ নিষেধ মেনে চললে পরলৌকিক জীবনে চিরশান্তি লাভ করবে, আর পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে অমান্য করলে পরলৌকিক জীবনে চরম শাস্তি ভোগ করবে। হাদীসে আছে "ইন্নাদ্দুনয়া খুলিকাত লাকুম, ওয়া আনতুম খুলিকতুম লিল আখিরাহ।"[৪১] অর্থাৎ পৃথিবী তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পরকালের জন্য। কাজেই প্রতিটি মানুষের উচিত পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরজীবনকে স্বার্থক করে তোলা।

মহান আল্লাহ বলেন কুরআনে, "আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পার্থিব জীবনের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি, যাতে মানবকুলকে পরীক্ষা করতে পারি যেনো তাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে।"[৪২] কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে কাউকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনো লক্ষ করো না। তোমার প্রতিপালকের দেয়া উপকরণ আরো ভাল, আরো

---

৩৭ Al-Ghazali, The Alchemy of Happiness, trans, From Hindustani by Claud Field, Sh. Muhammad shraf, Lahoer, October 1983, p.26.

৩৮ Ibid. p. 26.

৩৯ আল-কুরআন, ৭ ঃ ১৭২, ৩২ ঃ ৯।

৪০ আ.খ.ম. ইউনুস, 'আল-কুরআনে পার্থিব জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য ইসলামি ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৬৫-৭৬।

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭৬।

৪২ আল-কুরআন, ১৮ ঃ ৭, ৬৭ ঃ ২।

স্থায়ী"।[৪৩] কুরআনে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেন, "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদের জন্য পরীক্ষা।"[৪৪] কাজেই দেখা যায় যে, মানুষের ইহজীবনের কর্মকাণ্ডের প্রতিদান প্রদান করার জন্য বা ইহজগতের পরীক্ষার ফল ভোগ করার জন্য পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান আবশ্যক। কেনোনা কুরআনে উক্ত আছে, "মানুষকে তার কাজের জন্য পরীক্ষা করা হবে, তারপর তাকে পুরো প্রতিদান করা হবে।"[৪৫] আর এই প্রতিদান প্রদানের জন্য পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান ঘটাবেন মহান রাব্বুল আলামিন"।[৪৬]

মৌলিক মূল্যবোধের যথার্থতার জন্য

মৃত্যুর পর পরবর্তী কোনো জীবন আছে কিনা বা থেকে থাকলে সেটি কেমন হবে, পরকালে মৃত মানুষের পুনরুত্থান হবে কি না, এ সকল প্রশ্ন আমাদের ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতার সীমা বহির্ভূত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। আর তাই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে এ সকল প্রশ্নের কোনো ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, এ বিশ্বব্যবস্থা একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। অনেকে মনে করেন ধ্বংস ও মৃত্যু হলো পরিবর্তন ও বিকশিত হবার অন্য নাম। মানুষের জীবন শুরু হয় বস্তুগত উপকরণ দিয়ে। তারপর সে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জন ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ধাপে ধাপে বিকশিত হতে থাকে। অন্যদিকে ভাববাদী দর্শন, আস্তিক দর্শন ও ধর্মের শিক্ষা হলো জীবনের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর অনেকটা অবিনশ্বর ও মহাজাগতিক তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যবোধই হলো মানুষের স্বকীয়তা ও সঞ্জীবনী শক্তি। আর তাই মানুষ জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান করে, সুন্দর ও শুভের সূচনা করে, অশুভ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। এ জন্যই সত্য-সুন্দর শুভ প্রভৃতি মূল্যমান ও মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনকে অর্থবহ করে তোলার চেষ্টা করে।

তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এ ধারণা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ যদি মূল্যবোধগুলোর দেহতিরিক্ত স্থায়ী কোনো তাৎপর্য না-ই থাকত তাহলে মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে রুখে দাঁড়াতেন না, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দুঃসাধ্য সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করতো না। মূল্যবোধগুলোর তাৎপর্য রয়েছে বলেই মানুষ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অগণিত সেনার মাঝে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যের দুঃখে মানুষ দুঃখ পায়, অন্যের সুখে মানুষ সুখী হয়। নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্যকে ক্ষমা করতে হয়।

সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জীবনের মূল্যবান ও মূল্যবোধগুলোর একটি স্থায়ী তাৎপর্য রয়েছে। আর এই স্থায়ী তাৎপর্যের জন্য মৃত্যুর পর পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল্যবোধ কখনো মূল্যহীন হতে পারে না। পরকাল ও দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে ডঃ আমিনুল ইসলামের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। মন্তব্যটি হলো- "বর্তমানে দেহের হুবহু পুনরুজ্জীবন এবং আত্মার সঙ্গে দেহের পুনর্মিলনের মাধ্যমে

---

৪৩ আল-কুরআন, ২০ ঃ ১৩১।

৪৪ আল-কুরআন, ৬৪ ঃ ১৫।

৪৫ আল-কুরআন, ৫৩ ঃ ৪০-৪১।

৪৬ আল-কুরআন, ৫৩ ঃ ৪৮।

পরলোকে আমরা যদি আমাদের নিজেদের খুঁজে না-ও পাই, তবে হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ দেহ-মনের পুনরুজ্জীবন সম্ভব না হলেও বর্তমান জীবনে অর্জিত নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ মরণের সঙ্গে বিনাশ হয়ে যেতে পারে না। দেহ ও আত্মার পুনরুত্থান বা মূর্ত অস্তিত্ব ছাড়াও নিছক স্মৃতির আকারেও এক ধরনের অমরত্ব আমরা আশা করতে পারি।"[৪৭] কাজেই মৌলিক মূল্যবোধগুলোর জন্য হলেও পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান সংঘটিত হবে।

নৈতিকতাকে সমুন্নত রাখার জন্য

মানব মনের একটা নৈতিক দাবী ভালো কাজের জন্য ভালো ফল আর মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল। মানব মনের দাবি হচ্ছে, এমন একটা চিরস্থায়ী জীবন থাকতে হবে, সেখানে মানুষ তার কর্তৃকর্মের ফল ভোগ করতে পারবে, অর্থাৎ যেখানে ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি করার একটা দীর্ঘ সময় থাকবে। মানুষের মনের এই দাবী পূরণের জন্য হলেও আল্লাহ্পাক পরকালে কেয়ামত ঘটাবেন, কারণ তিনি ন্যায় বিচারক। পরকালে বিচারের দাবি হলো মানুষের একটা নৈতিক দাবী। আর তাই মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের স্বার্থেই পরকাল হবে।

পরকালের সুখ–দুঃখ, ভালো-মন্দের বিচার মানুষের নৈতিক জীবনের একটা চালিকাশক্তি। আর এই নৈতিকতাকে সমুন্নত রাখার জন্যও পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান সংঘটিত হবে। কারণ ইহজগতে যে দেহধারী আত্মা ভালো কাজ করেছে পরকালে তাকে পুরস্কার, আর যে দেহধারী আত্মা মন্দ কাজ করেছে পরকালে তাকেই শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় নৈতিকতায় বিঘ্ন ঘটবে। আর এ কারণে নৈতিক দৃষ্টিতেও এটা স্বীকার করে নিতে হয় যে, পরকালে সেই দেহধারী আত্মারই পুনরুত্থান ঘটবে।

আল-কুরআনে দৈহিক পুনরুত্থান

আল-কুরআনে পরকালে দেহধারী আত্মার পুনরুত্থানের কথাই জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবৃতি রয়েছে।

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "মানুষের মৃত্যুর পর বিচারের জন্য পুনরায় দেহ ধারণ করে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হতে হবে।"[৪৮] কুরআন আরও বলা হয়েছে, আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে (আমলনামায়) সংরক্ষিত রেখেছি"[৪৯] কুরআনে বলা হয়েছে "কেমন করে তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।"[৫০] এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম ম্যাককেইন-এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

৪৭ ইসলাম, ডঃ আমিনুল, দার্শনিক সমস্যা, নিউ এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩০।

৪৮ আল-কুরআন, ১৭ ঃ ১৪।

৪৯ আল-কুরআন, ৩৬ ঃ ১২ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, বঙ্গানুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, সউদী আরব, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরি।

৫০ আল-কুরআন, ২ ঃ ২৮ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)

"এই সেই পুনরুত্থান ও বিচারের দিন যা চূড়ান্ত, যা থেকে মুক্তি নেই- যেদিন সম্পর্কে কুরআনে আপোষহীন দৈহিক পুনরুত্থানের মূর্ত বর্ণনা রয়েছে।"[৫১] কুরআনে আরও বলা হয়েছে, তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা পুনরুত্থিত হবে।"[৫২] আল্লাহ্ যখন মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদেরকে ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।"[৫৩]

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা দৈহিকভাবে পরকালে মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন। এই পুনরুত্থান থেকে কেহই রক্ষা পাবে না। আল্লাহ্পাক প্রথমবার যেমন করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি করেই তিনি সেই পূর্বের মানুষটিকে পুনরায় তৈরি করবেন। আর এটা আল্লাহ্র কাছে মোটেও অসম্ভব নয়। কেনোনা যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেন তিনি আবারও তা সৃষ্টি করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর এটা তাঁর পক্ষে অতি সহজ। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-"আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।"[৫৪] কুরআনে আর বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র রহমতের ফল দেখে নাও, কীভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর পুনর্বার সৃষ্টি করবেন (উঠাবেন) আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম"।[৫৫]

কেহ কেহ শুধুমাত্র আত্মার পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। কিন্তু পরকালে শুধু আত্মিক পুনরুত্থান নয় বরং দেহধারী আত্মার পুনরুত্থান হবে। পরকালে দেহে সে আত্মার প্রতিস্থাপন করা হবে এটি পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকেও স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা এ প্রসঙ্গে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে– "যখন দেহে আবার আত্মা যোগ করা হবে।"[৫৬]-এ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝায় যে, সেই পূর্বের দেহে পূর্বের আত্মাকেই প্রতিস্থাপন করা হবে। কুরআন ঘোষণা করে, তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহা দিবসে যে দিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে।"[৫৭]

যারা দৈহিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বিতণ্ডাকারী বলে অভিহিত করেছেন। দৈহিক পুনরুত্থান নিয়ে মানুষের মধ্যে যতই বিভ্রান্তি থাকুক না কেন ইসলামে কিন্তু এ বিষয়টিকে বিনা তর্কেই স্বীকার করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইসলামি মতে, আল্লাহ্ মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বৃক্ষ থেকে মানুষের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই পৃথিবী এবং তার সবকিছু নিজ ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং সর্ব বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি পচে গলে যাওয়া দেহকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করে তাতেই প্রাণ দেবেন। কেননা যিনি প্রথম সৃষ্টি

---

৫১ William Mclane, Al-Ghazali's Book of Fear and hope, Leiden, E.j. brill, 1962, P. 16.

৫২ আল-কুরআন, ৩০ ঃ ১৯। (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)

৫৩ আল-কুরআন, ৩০ ঃ ২৫ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)।

৫৪ আল-কুরআন, ৫০ ঃ ১৫ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)।

৫৫ আল-কুরআন, ৩০ ঃ ৫০, ২৯ ঃ ২০ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)।

৫৬ আল-কুরআন, ৮১ ঃ ৭ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)।

৫৭ আল-কুরআন, ৮৩ ঃ ৪-৬ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)।

করেছেন তিনি নিজ ক্ষমতায় আবারও তা সৃষ্টি করবেন এটাই স্বাভাবিক। কাজেই আল্লাহ্পাক পরকালে দেহধারী আত্মারই পুনরুত্থান ঘটাবেন। আর সবাইকে সেই আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে।[৫৮]

যারা দৈহিক পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী তাদের জন্য আল্লাহ্পাক পবিত্র কুরআনে চরম শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। কুরআনে আরও বলা হয়েছে "আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শেকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা।"[৫৯]

দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে 'আলমে বরযাখ'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। মৃত্যুর পর আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও কর্মফল ভোগের জন্য তাকে আলমে বরযাখে[৬০] সেই দেহের সাথে মিলিত হতে হবে। আলমে বরযাখ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে অন্তবর্তী জগৎ। এ প্রসঙ্গে ইকবাল বলেন, এতে (কুরআন) 'বরযাখ' বলে একটি অবস্থার উল্লেখ রয়েছে যা সম্ভবত মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যকার একটি সাময়িক ব্যাপার।[৬১] কোনো ব্যক্তি পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে কিংবা যে কোনো ভাবেই মৃত্যুবরণ করুন না কেন, কিংবা যে কোনো স্থানে যে কোনোভাবেই তার কবর দেওয়া হউক না কেন, কিংবা মৃত দেহ যেখানই ফেলে রাখা হউক না কেন সকল আত্মাই আলমে বরযাখে অবস্থান করবে। এই আ'লমে বরযাখে আত্মাকে দেহের সাথে একত্র করে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিফলন দেওয়া হবে।

দৈহিক পুনরুত্থান প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের শিঙ্গায় ফুঁকের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে, পুনরুত্থানের দূত ইস্রাফিল (আ) শিঙ্গায় ফুঁক দেবার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার স্বর্গীয় আদেশের অপেক্ষায় বসে আছেন।"[৬২] শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হলে আসমান যমিনে যা কিছু আছে সবই অচেতন হয়ে পড়বে। জীবিতগণ মরে যাবে, আর মৃতগণের রূহ চৈতন্যহীন অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ্পাক যাদের হুঁশ বা চেতনা পূর্ণ অবস্থায় রাখার ইচ্ছা করবেন শুধুমাত্র তারাই নত থাকবে। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। সর্বশেষ মৃত্যুর দূত ইস্রাফিল (আ) নিজেও মারা যাবেন। এরপর তাৎক্ষণিকভাবেই সবাই জীবিত হয়ে চেতন অবস্থায় দাঁড়াবে।[৬৩] এ প্রসঙ্গে ইবনে আরাবির বক্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। আরাবির মতে, শিঙ্গায় তিনটি ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এ ফুৎকারে আকাশ ও পৃথিবীর ভাঙ্গন শুরু হবে এবং সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়

৫৮ আল-কুরআন, ২ ঃ ২৮ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)।

৫৯ আল-কুরআন, ৭৮ ঃ ৪, ৬৪ ঃ ১০ (অনুবাদ, মুহাম্মাদ শফী, পূর্বোক্ত)।

৬০ মাওলানা মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ, মওলানা মুহিউদ্দিন খান সউদী আরব, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৯২২।

৬১ ডক্টর মুহাম্মাদ ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনগর্ঠন, অনুবাদ ও সম্পাদক ঃ অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় প্রকাশ, জুন-১৯৮৭, পৃ. ১৫৪।

৬২ ৬২। R. A. Nicholson, The Mathnavi of Jalal uddin Rumi, Vols, 111 and IV, adam pub & Dist Delhi, 1996. p. 91

৬৩ মওলানা আজিজুল হক, (অনুদিত), বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, হামিদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা-১৯৬৯, পৃ. ৭৭।

ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এ ফুৎকারে অন্যান্য সবকিছুর সাথে মানুষ মারা যাবে এবং বিশ্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে মৃত মানুষের জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।”[৬৪] এ প্রসঙ্গে মসনবী থেকে মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। শেষ দিনে সূর্য নিকটে নেমে আসবে এবং এর অগ্নিদগ্ধ কীরণ অবিশ্বাসীদের মাথার উপর প্রচণ্ডভাবে তাপ দিবে এবং যারা মোনাফেক বা ভণ্ড তপসীসহ সবাই বিচারের অপেক্ষায় থাকবে।[৬৫]

অন্যদিকে, পবিত্র কুরআনে শেষ বিচারের দিনকে একটি বিভীষিকাময় ও স্বরণীয় দিন বলে অভিহিত করা হয়েছে। সে দিন আল্লাহ্ তায়ালা দুশমন ও পাপীদের হিসাব নিকাশের জন্য হাশরের মাঠের দিকে হেঁকে এনে সকলকে একত্রিত করবেন। পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে কুরআনের আরও বাণী উল্লেখ করা যেতে পারে : ‘প্রত্যেকটি আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে’ তোমাকে তোমার পুরোটাই দেওয়া হবে, তোমার যা প্রাপ্য-মজুরী সেই পুনরুত্থানের দিনে।[৬৬] তাছাড়া পুনরুত্থান সম্পর্কে আল-কুরআনে রয়েছে বিভিন্ন শব্দের বহুল ব্যবহার, যেমন-

(১) The Day of Coming forth (Al-Quran), (২) Of Meeting (Al-talaf), (৩) Of Judgement (al-fath), (৪) Of Lastday (al-akhirah), (৫) Of Decision (al-fasal), (৬) Of Requital (al-Din), (৭) Of Abiding (al khulud), (৮) Of Regret (al-hasrat), (৯) Of Great Calamity (al-tammah), (১০) Of Great fruth (al-haqqah),[৬৭]

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দাবলী ও আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামে পরকালে দেহধারী আত্মার পুনরুত্থান তথা দৈহিক পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মুসলমান মাত্রই এটা মেনে নেওয়া যথার্থ যে, পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান সংঘটিত হবে এবং দেহসহ আত্মার বিচার হবে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আল-কুরআনে দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্পাক কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ঘটনার উপমা দিয়ে বিভিন্ন কিছুর প্রমাণ দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ মানতে নির্দেশ দিয়েছেন। দৈহিক পুনরুত্থান কীভাবে সংঘটিত হবে, আল্লাহ্ পাকের অসীম ক্ষমতায় যে-তা সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলমান মাত্রই মানা আবশ্যক যে, পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান সংঘটিত হবেই। আর এই বিশ্বাস মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি করে, সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আত্মপোলব্ধিতে সহায়তা করে পরকালের মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে। কেননা, মৃত্যু মানেই মানব জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। মৃত্যু মানেই হলো ইহকাল ত্যাগ করে পরকালে গমন করা এবং পরকালে দৈহিকভাবে পুনরুত্থিত হয়ে অনন্তকাল ধরে ইহকালের কর্মফল ভোগ করা।

---

৬৪ মাওলানা মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯২।

৬৫ Nicholson, RA op cit 88

৬৬ Altaf Gauhar, Translation from the quran, Islamic Foundation, Dhaka Bangladesh, 1983, p. 107.

৬৭ S.M Hasan op, cit, p.113.